নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর সঞ্চার

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
পৌষ, ১৩৬৭

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

ছেপেছেন
সরোজকুমার চক্রবর্তী
শ্রীবিষ্ণু প্রেস
২৩এ, ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

এতে আছে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

টেনিদার গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

পটলডাঙার চার মূর্তির লীডার টেনিদাকে চেনে না এমন কিশোর বাংলা দেশে নেই বললেই চলে। সেই টেনিদাকে কেন্দ্র করে লেখা প্রায় সমস্ত গল্পগুলো এই গ্রন্থে প্রকাশিত হল।

হৈ-হুল্লোড়ে ভরা এই বই ছোটরা লুফে নেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—প্রকাশক

খট্টাঙ্গ ও পলান্ন

ওপরের নামটা যে একটু বিদঘুটে তাতে আর সন্দেহ কী! খট্টাঙ্গ শুনলেই দস্তুরমতো খটকা লাগে, আর পলান্ন মানে জিজ্ঞেস করলে বিপন্ন হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

অবশ্য যারা গোমড়ামুখো ভাল ছেলে, পটাপট পরীক্ষায় পাশ করে যায়, তারা হয়তো চট করে বলে বসবে, ইঃ—এর আর শক্তটা কী! খট্টাঙ্গ মানে হচ্ছে খাটের অংশ আর পলান্ন মানে হচ্ছে পোলাও। এ না জানে কে!

অনেকেই যে জানে না তার প্রমাণ আমি—আর আমার মতো সেইসব ছাত্র, যারা কম্‌সে কম তিন তিনবার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু ওই শক্ত কথাদুটোর মানে আমাকে জানতে হয়েছিল আমাদের পটলডাঙার টেনিদার পাল্লায় পড়ে। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আচ্ছা গল্পটা তাহলে বলি।

খাটের সঙ্গে পোলাওয়ের সম্পর্ক কী? কিছুই না। টেনিদা খাট কিনল আর আমি পোলাও খেলাম। আহা সে কী পোলাও! এই যুদ্ধের বাজারে তোমরা যারা র‍্যাশনের চাল খাচ্ছ আর কড়মড় করে কাঁকর চিবুচ্ছ, তারা সে পোলাওয়ের কল্পনাও করতে পারবে না। জয়নগরের খাসা গোপালভোগ চাল, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্—

কিন্তু বর্ণনা এই পর্যন্ত থাক। তোমরা দৃষ্টি দিলে অমন রাজভোগ আমার পেটে সইবে না। তার চাইতে গল্পটাই বলা যাক

টেনিদাকে তোমরা চেনো না। ছ-হাত লম্বা, খাড়া নাক, চওড়া চোয়াল। বেশ দশাসই জোয়ান, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ভদ্রলোকের গালে একটা গালপাট্টা থাকলে আরো বেশি মানাত। জাঁদরেল খেলোয়াড়—গড়ের মাঠে তিন তিনটে গোরার হাঁটু ভেঙে দিয়ে রেকর্ড করেছেন। গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় ষাঁড় ডাকছে।

এমন একটা ভয়ানক লোক যে আরো ভয়ানক বদ্‌রাগী হবে এ তো জানা কথা।

আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে—বছরে ছ-মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগি আর বাটি বাটি সাবু খাই। দু-পা দৌড়তে গেলে পেটের পিলে খটখট করে। সুতরাং টেনিদাকে দস্তুরমতো ভয় করে চলি—শতহস্ত দূরে তো রাখিই। ওই বোম্বাই হাতের একখানা জুৎসই চাঁটি খেলেই তো খাটিয়া চড়ে নিমতলা যাত্রা করতে হবে!

কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কে?

সবে দ্বারিকের দোকান থেকে গোটা-কয়েক লেডিকেনি খেয়ে রাস্তায় নেমেছি—হঠাৎ পেছন থেকে বাজখাঁই গলাঃ ওরে প্যালা!

সে কী গলা! আমার পিলে-টিলে একসঙ্গে আঁতকে উঠল। পেটের ভেতরে লেডিকেনিগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। তাকিয়ে দেখি—আর কে? মূর্তিমান স্বয়ং।

—কী করছিস এখানে?

সত্যি কথা বলতে সাহস হল না—বললেই খেতে চাইবে। আর যদি খাওয়াতে চাই তাহলে ওই রাক্ষুসে পেট কি আমার পাঁচ-পাঁচটা টাকা না খসিয়ে ছেড়ে দেবে! আর খাওয়াতে না চাইলে—ওরে বাবা!

কাঁচুমাচু করে বলে ফেললাম, এই—কেত্তন শুনছিলাম।

—কেত্তন শুনছিলে? ইয়ার্কি পেয়েছ? এই বেলা তিনটের সময় শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী কেত্তন শুনছিলে? আমি দেখি নি চাঁদ, এক্ষুনি দ্বারিকের দোকান থেকে মুখ চাটতে চাটতে বেরিয়ে এলে?

এই সর্বনাশ—ধরে ফেলেছে তো! গেছি এবারে! দুর্গানাম জপতে শুরু করে দিয়েছি ততক্ষণে, কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম কে জানে, ফাঁড়াটা কেটে গেল! না চটে টেনিদা গোটা ত্রিশেক দাঁতের ঝলক দেখিয়ে দিলে আমাকে। মানে—হাসল।

—ভয় নেই—আমাকে খাওয়াতে হবে না। শ্যামলালের ঘাড় ভেঙে দেলখোশে আজ বেশ মেরে দিয়েছি। পেটে আর জায়গা নেই।

আহা বেচারা শ্যামলাল! আমার সহানুভূতি হল। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়েছে আজকে। দধীচির মতো আত্মদান করে আমার প্রাণ,—মানে, পকেট বাঁচিয়েছে।

টেনিদা বললে, এখন আমার সঙ্গে চল্ দেখি!

সভয়ে বললাম, কোথায়?

—চোরাবাজারে। খাট কিনব একখানা—শুনেছি শস্তায় পাওয়া যায়।

—কিন্তু আমার যে কাজ—

—রেখে দে তোর কাজ! আমার খাট কেনা হচ্ছে না, তোর আবার কাজ কিসের রে? ভারি যে কাজের লোক হয়ে উঠেছিস—অ্যাঁ?—কথাটার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো একটা রদ্দা আমার পিঠে এসে পড়ল।

বাঃ—কী চমৎকার যুক্তি! টেনিদার খাট কেনা না হলে

আমার কোনো আর কাজ থাকতে নেই ! কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে ? সূচনাতেই যে রদ্দা পিঠে পড়েছে, তাতেই হাড়-পাঁজরাগুলো ঝনঝন করে উঠেছে আমার। আর একটি কথা বললেই সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়।

—চল্ চল্।

না চলে উপায় কী। প্রাণের চেয়ে দামী জিনিস সংসারে আর কী আছে ?

চলতে চলতে টেনিদা বললে, তোকে একদিন পোলাও খাওয়াতে হবে। আমাদের জয়নগরের খাসা গোপালভোগ চাল —একবার খেলে জীবনে আর ভুলতে পারবি না।

কথাটা আজ পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি। কাজ আদায় করে নেবার মতলব থাকলেই টেনিদা প্রতিশ্রুতি দেয় আমাকে গোপালভোগ চালের পোলাও খাওয়াবে। কিন্তু কাজটা মিটে গেলেই কথাটা আর টেনিদার মনে থাকে না। গোপালভোগ চালের পোলাও এ পর্যন্ত স্বপ্নেই দেখে আসছি—রসনায় তার রস পাবার সুযোগ ঘটল না।

বললাম, সে তো আজ পাঁচশো বার খাওয়ালে টেনিদা !

টেনিদা লজ্জা পেলে বোধহয়। বললে, না, না—এবারে দেখিস। মুশকিল কী জানিস—কয়লা পাওয়া যায় না—এ পাওয়া যায় না—সে পাওয়া যায় না !

পোলাও রাঁধতে কয়লা পাওয়া যায় না ! গোপালভোগ চাল কী ব্যাপার জানি না, তা সেদ্ধ করতে ক-মণ কয়লা লাগে তাও জানি না। কিন্তু কয়লার অভাবে পোলাও রান্না বন্ধ আছে এমন কথা কে শুনেছে ? আমাদের বাসাতেও তো পোলাও মাঝে মাঝে হয়, কই র‍্যাশনের কয়লার জন্যে তাতে তো

অসুবিধা হয় না! হাইকোর্ট দেখানো আর কাকে বলে! ওর চাইতে সোজা বলে দাও না বাপু—খাওয়াব না! এমনভাবে মিথ্যে মিথ্যে আশা দিয়ে রাখার দরকার কী?

টেনিদা বললে, ভালো একটা খাট যদি কিনে দিতে পারিস, তাহলে তোর কপালে পলান্ন নাচছে এ বলে দিলাম।

—পলান্ন!

—হ্যাঁ—মানে পোলাও! তোদের বুক্‌ড়ি চালের পোলাওকে কি আর পলান্ন বলে নাকি! হয় গোপালভোগ চাল, তবে না—হুঁঃ!

হায় গোপালভোগ! আমি নিশ্বাস ছাড়লাম।

তারপর খাট কেনার পর্ব।

টেনিদা বললে, এমন একটা খাট চাই যা দেখে পাড়ার লোক স্তম্ভিত হয়ে যাবে! বলবে, হ্যাঁ—একটা জিনিস বটে! বাংলা নড়বড়ে খাট নয়—একেবারে খাঁটি সংস্কৃত খট্টা—যার পায়াকে বলে খট্টাঙ্গ। শুনলেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চমকে উঠবে।

কিন্তু এমন একটা খট্টাঙ্গ-ওলা খট্টা কিনতে গিয়েই বিপত্তি!

একেবারে বাঁশবনে ডোমকানা! গায়ে গায়ে অজস্র ফার্নিচারের দোকান। টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলনা, আয়না, পালঙ্কের একেবারে সমারোহ। কোন্ দোকানে যাই?

চারদিক থেকে সে কী সম্বর্ধনার ঘটা! যেন এরা এতক্ষণ ধরে আমাদেরই প্রতীক্ষায় দস্তুরমতো তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে ছিল।

—এই যে স্যার—আসুন—আসুন—

—কী লইবেন স্যার, লইবেন কী? আয়েন, আয়েন, একবার দেইখ্যাই যান্—

—একবার দেখুন না স্যার—যা চান ! চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, বাক্স, ডেস্কো, টিপয়, আলনা, আয়না, র‍্যাক, ওয়েস্ট-পেপার বাস্‌কেট, লেটার বক্স—

লোকটা যেভাবে মুখে ফেনা তুলে বলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল পর্যন্ত বলে তবে থামবে।

টেনিদা বললে, দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালাতনে পড়লাম !

উপদেশ দিয়ে বললাম, চট্‌পট্‌ যেখানে হয় ঢুকে পড়ো, নইলে এর পরে হাত-পা ধরে টানতে শুরু করে দেবে !

তার বড় বাকিও ছিল না। অতএব দু-জনে একেবারে সোজা দমদম বুলেটের মতো সেঁধিয়ে গেলাম—সামনে যে দোকানটা ছিল তারই ভেতরে।

—কী চান দাদা, কী চাই ?

—একখানা ভালো খাট।

—মানে পালং ? দেখুন না, এই তো কত রয়েছে। যেটা পছন্দ হয়। ওরে ন্যাপলা, বাবুদের জন্যে চা আন, সিগারেট নিয়ে আয়—

—মাপ করবেন, চা-সিগারেট দরকার নেই। এক পেয়ালা চা খাওয়ালে খাটের দরে তার পাঁচগুণ আদায় করে নেবেন তো ? আমরা পটলডাঙার ছেলে মশাই, ওসব চালাকি বুঝতে পারি। বাঙাল পান নি—হুঁ !

দোকানদার বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, না খান তো না খাবেন মশাই—ব্যবসার বদনাম করবেন না।

—না, করবেন না ! ভারি ব্যবসা—চোরাবাজার মানেই তো

চুরির আখড়া। চা সিগরেট খাইয়ে আরো ভালো করে পকেট মারবার মতলব!

মিশকালো দোকানদার চটে বেগুনী হয়ে গেল: ইঃ, ভারি আমার ব্রাহ্মণ-ভোজনের বামুন রে! ওঁকে চা না খাওয়ালে আমার আর একাদশীর পারণ হবে না! যান যান মশাই—অমন খদ্দের ঢের দেখেছি!

—আমিও তোমার মতো ঢের দোকানদার দেখেছি—যাও—যাও—

এইরে—মারামারি বাধায় বুঝি! প্রাণ উড়ে গেল আমার। টেনিদাকে টেনে দোকান থেকে বার করে নিয়ে এলাম।

টেনিদা বাইরে বেরিয়ে বললে, ব্যাটা চোর!

বললাম, নিঃসন্দেহে। কিন্তু এখানে আর দাঁড়িও না, চলো অন্য দোকান দেখি।

অনেক অভ্যর্থনা এড়িয়ে আর অনেকটা এগিয়ে আর একখানা দোকানে ঢোকা গেল। দোকানদার একগাল হেসে বললে, আসুন—আসুন—পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করুন! এ তো আপনাদেরই দোকান!

—আমাদের দোকান হলে কি আর আপনি এখানে বসে থাকতেন মশাই? কোন্ কালে বার করে দিতাম, তারপর যা ইচ্ছে হয় বিনি পয়সায় বাড়িতে নিয়ে যেতাম।

এ দোকানদারের মেজাজ ভালো—চটল না। একমুখ পান নিয়ে বাধিত হাসি হাসবার চেষ্টা করলে: হেঁঃ—হুঁঃ—হেঁঃ। মশাই রসিক লোক! তা নেবেন কী?

—একখানা ভালো খাট।

—এই দেখুন না। একখানা প্লেন, এখানাতে কাজ করা।

এটা বোম্বাই প্যাটার্ন, এটা লণ্ডন প্যাটার্ন, এটা ডি-লুক্স প্যাটার্ন, এটা মানে-না-মানা প্যাটার্ন—

—থামুন, থামুন! থাকি মশাই পটলডাঙা স্ট্রীটে—অত দিল্লী-বোম্বাই-কামচাটকা প্যাটার্ন দিয়ে আমার কী হবে! এই এখানার দাম কত?

—ওখানা? তা ওর দাম খুবই শস্তা। মাত্র সাড়ে তিনশো।

সা—ড়ে তিনশো?—টেনিদার চোখ কপালে উঠল।

—হ্যাঁ—সাড়ে তিনশো। এক ভদ্দরলোক পাঁচশো টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি পরশু—তাঁকে দিই নি।

—কেন দেন নি?

—আমার এসব রয়্যাল খাট মশাই—যাকে তাকে বিক্রী করব? তাতে খাটের অমর্যাদা হয় যে! আপনাকে দেখেই চিনেছি—বনিয়াদী লোক। তাই মাত্র সাড়ে তিনশোয় ছেড়ে দিচ্ছি—আপনি খাটের যত্ন-আত্তি করবেন।

আহা—লোকটার কী অন্তর্দৃষ্টি! ঠিক খদ্দের চিনেছে তো! আমার শ্রদ্ধা বোধ হল। কিন্তু টেনিদা বশীভূত হবার পাত্র নয়।

—যান—যান মশাই, এই খাটের দাম সাড়ে তিনশো টাকা হয় কখনো? চালাকি পেয়েছেন? কী ঘোড়ার ডিম কাঠ আছে এতে?

বলতে বলতেই খাটের পায়া ধরে এক টান—আর সঙ্গে সঙ্গেই মড়্-মড়্-মড়াৎ! মানে খাটের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি।

—হায়—হায়—হায়—

দোকানদার হাহাকার করে উঠল: আমার পাঁচশো টাকা দামের জিনিস মশাই, দিলেন সাবাড় করে? টাকা ফেলুন এখন!

—টাকা! টাকা একেবারে গাছ থেকে পাকা আমের মতো

টুপটুপ করে পড়ে, তাই না? খাট তো নয়—দেশলাইয়ের বাক্স, তার আবার দাম!

দোকানদার এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। খপ করে টেনিদার ঘাড় চেপে ধরেছেঃ টাকা ফেলুন—নইলে পুলিশ ডাকব!

বেচারা দোকানদার—টেনিদাকে চেনে না। সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসুর এক প্যাঁচে তিনহাত দূরে ছিটকে চলে গেল। পড়ল একটা টেবিলের ওপর—সেখান থেকে নিচের একরাশ ফুলদানীর গায়ে। ঝন-ঝন করে দু-তিনটে ফুলদানীর সঙ্গে সঙ্গে গয়াপ্রাপ্তি হয়ে গেল—খণ্ডপ্রলয় দস্তুরমতো।

দোকানদারের আর্তনাদ—হৈ-হৈ হট্টগোল। মুহূর্তে টেনিদা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলেছে আমাকে, তারপর বিদ্যুৎবেগে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বৌ-বাজার স্ট্রীটে। আর বেমালুম ঘুসি চালিয়ে ফ্ল্যাট করে ফেলেছে গোটাতিনেক লোককে। তার পরেই তেমনি ব্লিৎস্ক্রীগ করে সোজা লাফিয়ে উঠে পড়েছে একখানা হাওড়ার ট্রামে। যেন ম্যাজিক!

পেছনের গণ্ডগোল যখন বৌবাজার স্ট্রীটে এসে পৌঁছেছে, ততক্ষণে আমরা ওয়েলিংটন স্ট্রীট পেরিয়ে গেছি।

আমি তখনো নিশ্বাস ফেলতে পারছি না। উঃ—একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি! অতগুলো লোক একবার কায়দা মতো পাকড়াও করতে পারলেই হয়ে গিয়েছিল, পিটিয়ে একেবারে পরোটা বানিয়ে দিত!

টেনিদা বললে, যত সব জোচ্চোর! দিয়েছি ঠাণ্ডা করে ব্যাটাদের!

আমি আর বলব কী! হাঁ করে কাতলা মাছের মতো দম নিচ্ছি তখনো। বহু ভাগ্যি যে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষে পেল আজকে!

ট্রাম চীনেবাজারের মোড়ে আসতেই টেনিদা বললে, নাম্—নাম্!

—এখানে আবার কী?

—আয় না তুই।···বলতে বলতেই এক ঝটকায় উড়ে পড়েছি ফুটপাথে।

টেনিদা বললে, চীনেদের কাছে শস্তায় ভালো জিনিস মিলতে পারে। আয় দেখি।

বাঙালীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি, আবার চীনেম্যানের পাল্লায়! নাঃ, প্রাণটা নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারব মনে হচ্ছে না! প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে নিতান্তই পটল তুলল আজকে! কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম—হায় হায়!

সভয়ে বললাম, আজ না-হয়—

—চল্ চল্—ঘাড়ে আবার একটি ছোট রদ্দা।

ক্যাঁক্ করে উঠলাম। বলতে হল, চলো।

চীনেম্যান বললে, কাম কাম, বাবু। হোয়াত্ ওয়ান্ত? (What want?)

টেনিদার ইংরেজী বিদ্যেও চীনেম্যানের মতোই। বললে, কট্ ওয়াণ্ট্।

—কত্? ভেরি নাইস্ কত্। দেয়ার আর মেনি। হুইচ্ তেক? (Cot? Very nice cot. There are many. Which take?)

—দিস্।—একটা দেখিয়ে দিয়ে টেনিদা বললে, কত দাম?

—তু হান্ড্রেদ্ লুপীজ—(Two hundred rupees)।

—অ্যাঁ—দুশো টাকা! ব্যাটা বলে কী! পাগল না পেট-খারাপ? কী বলিস প্যালা—এর দাম দুশো হয় কখনো?

চুপ করে থাকাই ভালো। যা দেখছি তা আশাপ্রদ নয়। পুরোনো খাট—রং-চং করে একটু চেহারা ফিরোবার চেষ্টা হয়েছে। খাট দেখে একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু টেনিদা যখন পছন্দ করেছে, তখন প্রতিবাদ করে মার খাই আর কি! না-হয় ম্যালেরিয়াতেই ভুগছি, তাই বলে কি এতই বোকা?

বললাম, হুঁ, বড্ড বেশি বলছে।

টেনিদা বললে, সব ব্যাটা চোর! ওয়েল মিস্টার চীনেম্যান, পনেরো টাকায় দেবে?

—হো-হোয়াত্? ফিপ্‌তিন লুপীজ? দোন্ত জোক বাবু। গিভ্ এইতি লুপীজ। (What? Fifteen rupees? Don't joke, Babu! Give eighty rupees.)

—নাও—নাও চাঁদ—আর পাঁচ টাকা দিচ্ছি—

—দেন গিভ্ ফিপ্‌তি—

শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় রফা হল।

খাট কিনে মহা উল্লাসে টেনিদা কুলির মাথায় চাপালে। আমাকে বললে, প্যালা, এবারে তুই বাড়ি যা—

পোলাও খাওয়ানোর কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হল—কিন্তু লাভ কী! দোকানদার ঠেঙিয়ে সেই থেকে অগ্নিমূর্তি হয়ে আছে—পোলাওয়ের কথা বলে বিপদে পড়ব নাকি! মানে মানে বাড়ি পালানোই প্রশস্ত।

কিন্তু পোলাও ভোজন কপালে আছেই—ঠেকাবে কে!

পরের গল্পটুকু সংক্ষেপেই বলি। রাত্রে বাড়ি ফিরে খাটে শুয়েই টেনিদার লাফ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছারপোকা—কাঁকড়াবিছে—পিশু,—কী নেই সেই চৈনিক খাটে! শোবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালাময়ী অনুভূতি!

খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে টেনিদা তাকিয়ে রইল খাটের দিকে। বটে, চালাকি! তিনটে গোরা আর চোরাবাজারের-দোকানদার-ঠ্যাঙানো রক্ত নেচে উঠেছে মগজের মধ্যে। তারপরেই একলাফে উঠোনে অবতরণ, কুড়ুল আনয়ন—এবং—

অতগুলো বাড়তি কাঠ দিয়ে আর কী হবে! দিন কয়েক কয়লার অভাব তো মিটল। আর ঘরে আছে গোপালভোগ চাল—অতএব—

অতএব পোলাও।

খট্টাঙ্গের জয় হোক! আহা-হা কী পোলাও খেলাম! পোলাও নয়—পলান্ন। তার বর্ণনা আর করব না, পাছে দৃষ্টি দাও তোমরা!

হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল—পোলাও, ডিমের ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা—

উস্-আস্ শব্দে নোলার জল টানল টেনিদা ঃ বলে যা—থামলি কেন ? মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি পোলাও, মশলা দোসে, চাউ-চাউ সামি কাবাব—

এবার আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি জুড়ে দিলাম ঃ আলু ভাজা, শুক্তো, বাটি-চচ্চড়ি, কুমড়োর ছোকা—

টেনিদা আর বলতে দিলে না। গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল ঃ থাম প্যালা, থাম বলছি ! শুক্তো—বাটি-চচ্চড়ি !—দাঁত খিচিয়ে বললে, তার চেয়ে বল না, হিঞ্চে সেদ্ধ, গাঁদাল আর সিঙি মাছের ঝোল ! পালা-জ্বরে ভুগিস আর বাসক পাতার রস খাস, এর চাইতে বেশি বুদ্ধি আর কী হবে তোর ! দিব্যি অ্যায়সা অ্যায়সা মোগলাই খানার কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ধাঁ করে নিয়ে এল বাটি-চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল ! ধ্যাত্তোর !

ক্যাবলা বললে, পশ্চিমে কুঁদরুর তরকারি দিয়ে ঠেকুয়া খায়। বেশ লাগে !

—বেশ লাগে ?—টেনিদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল ঃ কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতু আরো ভাল লাগে না ? তবে তাই খে-গে যা। তোদের মত উল্লুকের সঙ্গে পিকনিকের আলোচনাও ঝকমারি !

হাবুল সেন বললে, আহা-হা চেইত্যা যাইত্যাছ ক্যান ? পোলাপানে কয়—

—পোলাপান! এই গাড়োলগুলোকে জলপান করলে তবে রাগ যায়! তাও কি খাওয়া যাবে এগুলোকে? নিম্-নিসিন্দের চেয়েও অখাদ্য! এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম! তোরা ছোলার ছাতু আর কাঁচা লঙ্কার পিণ্ডি গেল গে —আমি ওসবের মধ্যে নেই!

সত্যিই যে চলে যায় দেখছি! আর দলপতি চলে যাওয়া মানেই আমরা একেবারে অনাথ! আমি টেনিদার হাত চেপে ধরলাম: আহা, বোসো না! একটা প্ল্যান-ট্যান হোক। ঠাট্টাও বোঝ না?

টেনিদা গজগজ করতে লাগল: ঠাট্টা! কুমড়োর ছোকা আর কুঁদরুর তরকারি নিয়ে ওসব বিচ্ছিরি ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!

—না—না, ওসব কথার কথা!—হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বোঝাতে লাগল: মোগলাই খানা না হইলে আর পিকনিক হইল কী?

—তবে লিস্টি কর—টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।

প্রথমে যে লিস্টিটা হল তা এইরকম:

বিরিয়ানি পোলাও

কোর্মা

কোপ্তা

কাবাব দু-রকম

মাছের চপ—

মাঝখানে বেরসিকের মতো বাধা দিলে ক্যাবলা: তাহলে বাবুর্চি চাই, একটা চাকর, একটা মোটর লরি, দুশো টাকা—

—দ্যাখ ক্যাবলা—টেনিদা ঘুসি বাগাতে চাইল।

আমি বললাম, চটলে কী হবে? চারজন মিলে চাঁদা উঠেছে দশ টাকা ছ-আনা।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, তাহলে একটু কম-সম করেই করা যাক। ট্যাঁক-খালির জমিদার সব—তোদের নিয়ে ভদ্দরলোকে পিক্‌নিক্ করে!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি দিয়েছ ছ-আনা, বাকি দশ টাকা গেছে আমাদের তিনজনের পকেট থেকে। কিন্তু বললেই গাঁট্টা। আর সে গাঁট্টা ঠাট্টার জিনিস নয়—জুৎসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে!

রফা করতে করতে শেষ পর্যন্ত লিস্টিটা যা দাঁড়ালো তা এইঃ

খিচুড়ি (প্যালা রাজহাঁসের ডিম আনিবে বলিয়াছে)

আলু ভাজা (ক্যাবলা ভাজিবে)

পোনা মাছের কালিয়া (প্যালা রাঁধিবে)

আমের আচার (হাবুল দিদিমার ঘরহইতে হাত-সাফাই করিবে)

রসগোল্লা, লেডিকেনি (ধারে 'ম্যানেজ' করিতে হইবে)

লিস্টি শুনে আমি হাঁড়িমুখ করে বললাম, ওর সঙ্গে আর একটা আইটেম জুড়ে দে হাবুল। টেনিদা খাবে।

—হেঁ—হেঁ প্যালার মগজে শুধু গোবর নেই, ছটাক-খানেক ঘিলুও আছে দেখছি!—বলেই টেনিদা আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। 'গেছি গেছি' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

আমরা পটলডাঙার ছেলে—কিছুতেই ঘাবড়াই না। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি-গণ্ডার সাবাড় করে থাকি। তাই বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছিলাম, দুর-দুর! হাঁসের ডিম খায় ভদ্দরলোকে! খেতে হলে রাজহাঁসের ডিম! রীতিমতো রাজকীয় খাওয়া!

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? খুব যে চালিয়াতি করছিস, তুই ডিম পাড়বি নাকি?—টেনিদা জানতে চেয়েছিল।

—আমি পাড়তে যাব কোন দুঃখে? কী দায় আমার?—আমি মুখ ব্যাজার করে বলেছিলামঃ হাঁসে পাড়বে।

—তাহলে সেই হাঁসের কাছ থেকে ডিম তোকেই আনতে হবে। যদি না আনিস, তাহলে—

তাহলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কিন্তু কী গেরো বলো দেখি! কাল রবিবার—ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিকনিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করতে না পারলে তো গেছি! পাড়ায় ভণ্টাদের বাড়ি রাজহাঁস আছে গোটাকয়েক। ডিম-টিমও তারা নিশ্চয় পাড়ে। আমি ভণ্টাকেই পাকড়ালাম। কিন্তু কী খলিফা ছেলে ভণ্টা! দু-আনার পাঁঠার ঘুগনি আর ডজনখানেক ফুলুরি সাবড়ে তবে মুখ খুলল।

—ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে।

—তুই দে না ভাই এনে! একটা আইসক্রীম খাওয়াব। ভণ্টা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজেরা পোলাও-মাংস সাঁটবেন আর আমার বেলায় আইসক্রীম! ওতে চলবে না। ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও—আমি বাবা ময়লা ঘাঁটতে পারব না। কী করি, রাজি হতে হল।

ভণ্টা বললে, দুপুরবেলা আসিস। বাবা মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। মা তখন ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। সেই সময় ডিম বের করে দেব।

গেলাম দুপুরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বাক্স—তার

ভেতরে সার-সার খুপরি। গোটা-দুই হাঁস ভেতরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ভণ্টা বললে, যা—নিয়ে আয়।

কিন্তু কাছে যেতেই বিদিকিচ্ছিভাবে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে উঠল হাঁসদুটো।

—ফোঁস-ফোঁস করছে যে!

ভণ্টা উৎসাহ দিলে ঃ ডিম নিতে এসেছিস—একটু আপত্তি করবে না? তোর কোন ভয় নেই প্যালা—দে হাত ঢুকিয়ে।

হাত ঢুকিয়ে দেব? কিন্তু কী বিচ্ছিরি ময়লা!—ময়লা—আর কী বদখৎ গন্ধ! একেবারে নাড়ি উলটে আসে! তার ওপরে যে-রকম ঠোঁট ফাঁক করে ভয় দেখাচ্ছে—

ভণ্টা বললে, চিয়ার আপ্ প্যালা! লেগে যা!

যা থাকে কপালে বলে যেই হাত ঢুকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাপরে! খটাং করে হাঁসটা হাত কামড়ে ধরলে। সে কী কামড়! হাঁই-মাই করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

—কী হয়েছে রে ভণ্টা, নিচে এত গোলমাল কিসের?—ভণ্টার মা-র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি আর নেই! হ্যাঁচকা টানে হাঁসের ঠোঁট থেকে হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় লাগালাম। দর-দর করে রক্ত পড়ছে তখন!

রাজহাঁস এমন রাজকীয় কামড় বসাতে পারে কে জানত! কিন্তু কী ফেরেববাজ ভণ্টাটা! জেনে-শুনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটালো! আচ্ছা—পিকনিকটা চুকে যাক—দেখে নেব তারপর! ওই পাঁঠার ঘুগনি আর ফুলুরির শোধ তুলে ছাড়ব!

কী করা যায়—গাঁটের পয়সা দিয়ে মাদ্রাজী ডিমই কিনতে হল গোটাকয়েক।

পরদিন সকালে শ্যামবাজার ইস্টিশানে পৌঁছে দেখি, টেনিদা,

ক্যাবলা আর হাবুল এর মধ্যেই মার্টিনের রেলগাড়িতে চেপে বসে আসে। সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি-কলসি, চালের পুঁটুলি, তেলের ভাঁড়। গাড়িতে গিয়ে উঠতে টেনিদা হাঁক ছাড়ল ঃ এনেছিস রাজহাঁসের ডিম ?

দুর্গা-নাম করতে করতে পুঁটুলি খুলে দেখালাম।

—এর নাম রাজহাঁসের ডিম! ইয়ার্কি পেয়েছিল ?—টেনিদা গাঁট্টা বাগালো।

আমি গাড়ির খোলা দরজার দিকে সরে গেলাম ঃ মানে—ইয়ে, ছোট রাজহাঁস কিনা—

—ছোট রাজহাঁস! কী পেয়েছিস আমাকে শুনি ? পাগল না পেটখারাপ ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও! ডিম তো আনছে!

টেনিদা গর্জন করে বললে, ডিম এনেছে না কচু! এই তোকে বলে রাখছি প্যালা—ডিমের ডালনা থেকে তোর নাম কেটে দিলাম। একটুকরো আলু পর্যন্ত নয়, একটু ঝোলও নয়!

মন খারাপ করে আমি বসে রইলাম। ডিমের ডালনা আমি ভীষণ ভালবাসি, তাই থেকেই আমাকে বাদ দেওয়া! আচ্ছা বেশ, খেয়ো তোমরা! এমন নজর দেব পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তোমাদের!

পিঁ করে বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল মার্টিনের রেল। তারপর ধ্বস্-ধ্বস্ ভোঁস-ভোঁস করে এর রান্নাঘর, ওর ভাঁড়ার-ঘরের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল।

টেনিদা বললে, বাগুইআটি ছাড়িয়ে আরো চারটে ইস্টিশান।

তার মানে প্রায় এক ঘণ্টার মামলা। লেডিকেনির হাঁড়িটা বের কর, ক্যাবলা।

ক্যাবলা বললে, এখুনি? তাহলে পৌঁছবার আগেই যে সাফ হয়ে যাবে!

টেনিদা বললে, সাফ হবে কেন, দুটো-একটা চেখে দেখব শুধু। আমার বাবা ট্রেনে চাপলেই খিদে পায়! এই একঘণ্টা ধরে শুধু-শুধু বসে থাকতে পারব না। বের কর্ হাঁড়ি—চটপট—

হাঁড়ি চটপটই বেরুল—মানে, বেরুতেই হল তাকে। তারপর মার্টিনের রেলের চলার তালে তালে ঝটপট করে সাবাড় হয়ে চলল। আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন জুল-জুল করে শুধু তাকিয়েই রইলাম। একটা লেডিকেনি চেখে দেখতে আমরাও যে ভালবাসি, সে-কথা আর মুখ ফুটে বলাই গেল না।

ইস্টিশান থেকে নেমে প্রায় মাইলটাক হাঁটবার পরে ক্যাবলার মামার বাড়ি। কাঁচা রাস্তা, এঁটেল মাটি, তার ওপর কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আবার। আগে থেকেই রসগোল্লার হাঁড়িটা বাগিয়ে নিল টেনিদা।

—এটা আমি নিচ্ছি। বাকি মোটঘাটগুলো তোরা নে।

—রসগোল্লা বরং আমি নিচ্ছি, তুমি চালের পোঁটলাটা নাও টেনিদা।—লেডিকেনির পরিণাম ভেবে আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

টেনিদা চোখ পাকালো ঃ খবর্দার প্যালা, ও-সব মতলব ছেড়ে দে। টুপটাপ করে দু-চারটে গালে ফেলবার বুদ্ধি, তাই নয়? হুঁ-হুঁ বাবা—চালাকি ন চলিষ্যতি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁটরি বোঁচকা কাঁধে ফেলে আমরা তিনজনেই এগোলাম।

—কিন্তু তিন পাও যেতে হল না। তার আগেই ধাঁই—ধপাস্! টেনে একখানা রাম-আছাড় খেল হাবুল।

—এই খেয়েছে কচুপোড়া!—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

সারা গায়ে কাদা মেখে হাবুল দাঁড়ালো। হাতের ডিমের পুঁটলিটা তখন কুঁকড়ে এতটুকু—হলদে রস গড়াচ্ছে তা থেকে।

ক্যাবলা বললে, ডিমের ডালনার বারোটা বেজে গেল!

তা গেল। করুণ চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। ইস্—এত কষ্টের ডিম! ওরই জন্যে রাজহাঁসের কামড় পর্যন্ত খেতে হয়েছে।

টেনিদা হুঙ্কার করে উঠল: দিলে সব পণ্ড করে! এই ঢাকাই বাঙালটাকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে! পিটিয়ে ঢাকাই পরোটা করলে তবে রাগ যায়!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাবুল চার টাকা চাঁদা দিয়েছে—তার আগেই কী যেন একটা হয়ে গেল! হঠাৎ মনে হল আমার পা দুটো মাটি ছেড়ে শোঁ করে শূন্যে উড়ে গেল, আর তারপরেই…

কাদা থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা-মুখ বেয়ে আচারের তেল গড়াচ্ছে। ঐ অবস্থাতেই চেটে দেখলাম একটুখানি। বেশ ঝাল-ঝাল টক-টক—বেড়ে আচার করেছিল হাবুলের দিদিমা।

ক্যাবলা আবার ঘোষণা করলে, আমের আচারের একটা বেজে গেল!

টেনিদা ক্ষেপে বললে, চুপ কর বলছি ক্যাবলা—এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেব!

কিন্তু তার আগেই টেনিদার বোম্বা উড়ল—মানে স্রেফ লম্বা হল কাদায়। সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি—

ধবধবে শাদা রসগোল্লাগুলো পাশের কাদাভরা খানায় গিয়ে পড়ে একেবারে নেবুর আচার!

ক্যাবলা বললে, রসগোল্লার তুটো বেজে গেল!

এবার আর টেনিদা একটা কথাও বললে না। বলবার ছিলই বা কী! রসগোল্লার শোকে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারজনে পথ চলতে লাগলাম আমরা। টেনিদা তবু লেডিকেনি-গুলো সাবাড় করেছে, কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায়! অমন স্পাঞ্জ রসগোল্লাগুলো!

পাঁচ মিনিট পরে টেনিদাই কথা কইল।

—তবু পোনামাছগুলো আছে, কী বলিস? খিচুড়ির সঙ্গে মাছের কালিয়া আর আলুভাজা—নেহাৎ মন্দ হবে না—অ্যাঁ?

হাবুল বললে, হ-হ, সেই ভালো। বেশি খাইলে প্যাট গরম হইবো। গুরুপাক না খাওয়াই ভালো।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল: শেয়াল বলেছিল দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা!—ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে ছিল, তাই দু-একটা হিন্দী শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে।

টেনিদা বললে, খাট্টা! বেশি পাঁঠ্ঠামি করবি তো চাঁট্টা বসিয়ে দেব!

ক্যাবলা ভয়ে স্পীকটি নট। আমি তখনও নাকের পাশ দিয়ে ঝাল-ঝাল টক-টক তেল চাটছি। হঠাৎ বুক-পকেটটা কেমন ভিজে ভিজে মনে হয়। হাত দিয়ে দেখি, বেশ বড়ো-সড়ো একটুকরো আমের আচার তার ভেতরে কায়েমি হয়ে আছে।

—জয় গুরু! এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম। সত্যি—হাবুলের দিদিমা বেড়ে আচার করেছিল! আরো গোটাকয়েক যদি ঢুকত!

বাগান-বাড়িতে পৌঁছুলাম আরো পনেরো মিনিট পরে।

চারিদিকে সুপুরি আর নারকেলের বাগান—একটা পানা-ভর্তি পুকুর, মাঝখানে একতলা বাড়িটা। কিন্তু ঘরে চাবিবন্ধ। মালীটা কোথায় কেটে পড়েছে কে জানে!

টেনিদা বললে, কুছ্ পরোয়া নেই। চুলোয় যাক মালী। বলং বলং বাহুবলং! নিজেরা উনুন খুঁড়ব—খড়ি কুড়ুব, রান্না করব—মালী ব্যাটা থাকলেই তো ভাগ দিতে হত! যা হাবুল—ইঁট কুড়িয়ে আন্—উনুন করতে হবে। প্যালা, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়,—ক্যাবলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।

—তার তুমি?—আমি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

—আমি?—একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে টেনিদা হাই তুলল: আমি এগুলো সব পাহারা দিচ্ছি। সবচাইতে কঠিন কাজটাই নিলাম আমি। শেয়াল কুকুর এলে তাড়াতে হবে তো! —যা তোরা—হাতে-হাতে বাকি কাজগুলো চটপট সেরে আয়।

কঠিন কাজই বটে! ইস্কুলের পরীক্ষার গার্ডদেরও অমনি কঠিন কাজ করতে হয়। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষতে গিয়ে যখন 'ঘোড়া-ঘোড়া ঘাস-ঘাস' নিয়ে আমাদের দম আটকাবার জো, তখন গার্ড মোহিনীবাবুকে টেবিলে পা তুলে দিয়ে 'ফোঁরর্-ফোঁ' শব্দে নাক ডাকাতে দেখেছি।

টেনিদা বললে, যা—যা সব—দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঝাঁ করে রান্নাটা করে ফ্যাল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে!

তা পেয়েছে বৈকি! পুরো একহাঁড়ি লেডিকেনি এখনো গজ-গজ করছে পেটের ভেতর! আমাদের বরাতেই শুধু অষ্টরম্ভা। প্যাঁচার মতো মুখ করে আমরা কাঠখড়ি সব কুড়িয়ে আনলাম।

টেনিদা লিস্টি বার করে বললে, মাছের কালিয়া। প্যালা রাঁধিবে।

আমাকে দিয়েই শুরু! আমি মাথা চুলকে বললাম, খিচুড়ি-টিচুড়ি আগে হয়ে যাক—তবে তো ?

—খিচুড়ি লাস্ট আইটেম—গরম-গরম খেতে হবে। কালিয়া সকলের আগে। নে প্যালা—লেগে যা—

ক্যাবলার মা মাছ কেটে নুন-টুন মাখিয়ে নিয়েছিলেন, তাই রক্ষা! কড়াইতে তেল চাপিয়ে আমি মাছ ঢেলে দিলাম তাতে।

আরে—এ কী কাণ্ড! মাছ দেবার সঙ্গে-সঙ্গে কড়াই-ভর্তি ফেনা! তারপরেই আর কথা নেই—অতগুলো মাছ তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। মাছের কালিয়া নয়—মাছের হালুয়া!

ক্যাবলা আদালতের পেয়াদার মতো ঘোষণা করলো ঃ মাছের কালিয়ার তিনটে বেজে গেল!

—তবে রে স্টুপিড!—টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ঃ কাঁচা তেলে মাছ দিয়ে তুই কালিয়া রাঁধছিস? এবার তোর পালাজ্বরের পিলেরই একদিন কি আমারই একদিন!

এ তো মার্টিনের রেল নয়—সোজা মাঠের রাস্তা। আমার কান পাকড়াবার জন্যে টেনিদার হাতটা এগিয়ে আসবার আগেই আমি হাওয়া। একেবারে পাঞ্জাব মেলের স্পীডে।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, খিচুড়ির লিস্ট থেকে প্যালার নাম কাটা গেল।

তা যাক। কপালে আজ হরি-মটর আছে সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি! গোমড়া মুখে একটা আমড়া-গাছতলায় এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

বসে বসে কাঠ-পিঁপড়ে দেখছি, হঠাৎ গুটি-গুটি হাবুল আর ক্যাবলা এসে হাজির।

—কী রে, তোরাও?

ক্যাবলা ব্যাজার মুখে বললে, খিচুড়ি টেনিদা নিজেই রাঁধবে। আমাদের আরো খড়ি আনতে পাঠাল।

সেই মুহূর্তেই হাবুল সেনের আবিষ্কার। একেবারে কলম্বাসের আবিষ্কার যাকে বলে!

—এই প্যালা—দ্যাখছস? ঐ গাছটায় কী রকম জলপাই পাকছে!

আর বলতে হল না। আমাদের তিনজনের পেটেই তখন ক্ষিদেয় ইঁদুর লাফাচ্ছে। জলপাই—জলপাই-ই সই! সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে উঠে পড়লাম। আহা—টক-টক—মিঠে-মিঠে জলপাই—যেন অমৃত!

হাবুলের খেয়াল হল প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

—এই, টেনিদার খিচুড়ি কী হইল?

ঠিক কথা—খিচুড়ি তো এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত! তড়াক করে গাছ থেকে নেমে পড়ল ওরা। হাতের কাছে পাতা-টাতা যা পেল, তাই নিয়ে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমিও গেলাম পেছনে-পেছনে, আশায়-আশায়। মুখে যাই বলুক—এক হাতা খিচুড়িও কি আমায় দেবে না? প্রাণ কি এত পাষাণ হবে টেনিদার?

কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ!

টেনিদা সেই নারকেল গাছটা হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে বলছে, দে—দে ক্যাবলা, পিঠটা আর-একটু ভাল করে চুলকে দে!

পিঠ চুলকে দিচ্ছে—সন্দেহ কী! কিন্তু সে ক্যাবলা নয়—একটা গোদা বানর। আর চার-পাঁচটা গোল হয়ে বসেছে টেনিদার চারিদিকে। কয়েকটাতে মুঠো-মুঠো চাল-ডাল মুখে

পুরছে, একটা আলুগুলো সাবাড় করছে আর আস্তে-আস্তে টেনিদার পিঠ চুলকে দিচ্ছে। আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, আর থেকে-থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর-একটু ভালো করে চুলকে দে!

এবার আমরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—টেনিদা—বাঁদর—বাঁদর!

—কী! আমি বাঁদর!—বলেই টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্ বাপ্ বলে চিৎকার।

—ইঁ-ইঁ—ক্লিচ্-ক্লিচ্! কিচ্-কিচ্!

চোখের পলকে বানরগুলো কাঁঠাল গাছের মাথায়। চাল-ডাল আলুর পুঁটলিও সেইসঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে-দেখিয়ে তরিবৎ করে খেতে লাগল—সেইসঙ্গে কী বিচ্ছিরি ভেংচি! ঐ ভেংচি দেখেই না লঙ্কার রাক্ষসগুলো ভয় পেয়ে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল!

পুকুরের ঘাটটায় চারজনে আমরা পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলাম। যেন শোকসভা! খানিক পরে ক্যাবলাই স্তব্ধতা ভাঙল।

—বন-ভোজনের চারটে বাজল!

—তা বাজল।—টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: কিন্তু কী করা যায় বল্ তো প্যালা? সেই লেডিকেনিগুলো কখন হজম হয়ে গেছে—পেট চুঁই-চুঁই করছে ক্ষিদেয়!

অগত্যা আমি বললাম, বাগানে একটা গাছে জলপাই পেকেছে টেনিদা—

—জলপাই! ইউরেকা! বনে ফল ভোজন—সেইটেই তো আসল বন-ভোজন! চল চল, শিগগির চল! লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল।

পরের উপকার করিও না

আমি প্যালারাম, ক্যাবলা আর হাবুল সেন—তিনজনে নেহাত গোবেচারার মতো কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছি। তাকিয়ে আছি কাঠগড়ায় আসামীর দিকে। তার মুখ আমাদের চেয়েও করুণ। ছ-ফুট লম্বা অমন জোয়ানটা ভয়ে কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেছে। গণ্ডারের খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটাও যেন চেপসে গেছে একটা থ্যাবড়া ব্যাঙের মতো। সাধুভাষায় যাকে বলে, দস্তুরমতো পরিস্থিতি!

কে আসামী?

আর কে হতে পারে? আমাদের পটলডাঙার সেই স্বনামধন্য টেনিদা। গড়ের মাঠে গোরা ঠ্যাঙানোর সেই প্রচণ্ড প্রতাপ এখন একটা চায়ের কাপের মতো ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। চায়ের কাপ না বলে চিরতার গেলাসও বলতে পারা যায় বোধহয়।

—হুজুর ধর্মাবতার—

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল লাফিয়ে উঠলেন। মনে হল যেন হাত-দশেক ছিটকে উঠল একটা কুড়ি-নম্বরী ফুটবল। গলার আওয়াজ তো নয়—যেন আট-দশটা চিনে-পটকা ফাটল একসঙ্গে। ধর্মাবতার চেয়ারের ওপর আঁৎকে উঠে পড়তে পড়তে সামলে গেলেন।

—অমন বাজখাঁই গলায় চেঁচাবেন না মশাই, পিলে চমকে যায়!—জজ সাহেব ভ্রূ কোঁচকালেন: কী বলতে হয় ঝটপট বলে ফেলুন।

উকিল একটা ঘুসি বাগিয়ে তাকালেন টেনিদার দিকে।

একরাশ কালো কালো আলপিনের মতো গোঁফগুলো তাঁর খাড়া হয়ে উঠল।

—ধর্মাবতার, আসামী ভজহরি মুখুজ্জে (আমাদের টেনিদা) কী অন্যায় করেছে, তা আপনি শুনেছেন। অবোলা জীবের ওপর ভীষণ অত্যাচার সে করেছে, তার নিন্দের ভাষা নেই। একটা ছাগল পরশু থেকে কাঁচা ঘাস পর্যন্ত হজম করতে পারছে না। আর-একটা সমানে বমি করছে। আর-একটা তিন দিন ধরে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে—ফরিয়াদীর একটা ট্যাঁক-ঘড়ি সুদ্ধু চিবিয়ে ফেলেছে।

রোগা সিঁটকে একটা লোক, হলধর পালুই—সে-ই ফরিয়াদী। হলধর ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করে কাঁদতে লাগল।

—খুব ভালো ঘড়ি ছিল হুজুর—কী শক্ত! আমার ছেলে ঐটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আম পাড়ত। চলত না বটে, তবু ঘড়ির মতো ঘড়ি ছিল একটা!—বলে হলধর এবার ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল। কান্নার বেগ একটু থামলে বললে, ঘড়ি না-হয় যাক হুজুর, কিন্তু আমার অমন তিনটে ছাগল! বুঝি পাগল হয়ে গেল হুজুর—একেবারে উদ্দাম পাগল!

জজ কানে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চুলকোতে চুলকোতে বিরক্ত মুখে বললেন, আঃ—জ্বালাতন! আরে বাপু, তুমিও তো দেখছি একটা ছাগল! ছাগল কখনো পাগল হয়? সে যাক, অপরাধের গুরুত্ব চিন্তা করে আমি আসামী ভজহরি মুখুজ্জেকে তিন টাকা জরিমানা করলাম। এই তিন টাকা ফরিয়াদী হলধর পালুইকে দেওয়া হবে তার ছাগলদের রসগোল্লা খাওয়াবার জন্যে।

জজ উঠে পড়লেন।

টেনিদা আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ভাবটা এই ঃ এ-যাত্রা তরিয়ে দে! আমার ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ!

আমি ক্যাবলা আর হাবুল সেন—'চারমূর্তি'র তিন মূর্তি—চাঁদা করে তিন টাকা জমা দিয়ে টেনিদাকে খালাস করে আনলাম।

নিঃশব্দে চার জন পথ দিয়ে চলেছি। কে যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

খানিক পরে আমি বললাম, খুব ফাঁড়া কেটে গেছে!

ক্যাবলা বললে, হ্যাঁ—জেল হয়ে যেতে পারত!

হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, দ্বীপান্তরও হইতে পারত! একটা ছাগল যদি মইর‍্যা যাইতগা, তাইলে ফাঁসি হওনই বা আশ্চর্য আছিল কী!

এতক্ষণ পরে টেনিদা গাঁক-গাঁক করে উঠল ঃ চুপ কর, মেলা বাজে বকিসনি! ইঃ, ফাঁসি! ফাঁসি হওয়া মুখের কথা কিনা!

আবার নিস্তব্ধতা। টেনিদার পেছু-পেছু আমরা গড়ের মাঠের দিকে এগিয়ে চললাম। খানিক পরে আমিই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, চানাচুর খাবে টেনিদা?

—নাঃ—টেনিদার মুখে-চোখে একটা গভীর বৈরাগ্য।

—আইসক্রীম কিনুম?—হাবুল সেনের প্রশ্ন।

—কিচ্ছু না—টেনিদা একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ঃ মন খিঁচড়ে গেছে—বুঝলি প্যালা! সংসারে কারুর উপকার করতে নেই!

আমি বললাম, নিশ্চয় না!

—উপকারীকে বাঘে খায়।—ক্যাবলা বললে।

—আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছিস!—বলে টেনিদা ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে। ক্যাবলা 'উঃ উঃ' করে উঠল।

হাবুল বললে, বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে গিয়া খামাখা ঝামেলা বাড়াইয়া হইবো কী?

—যা কইছস!—মনের আবেগে টেনিদা এবার হাবুলের ভাষাতেই হাবুলকে সমর্থন জানালো। তারপর গর্জন করে বললে, আমি আর একখানা নতুন বর্ণ-পরিচয় লিখব। তার প্রথম পাঠ থাকবে: কখনও পরের উপকার করিও না!

ক্যাবলা বললে, সাধু, সাধু!

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, সাধু! খবরদার সাধু-ফাধুর নাম আমার কাছে আর করবিনে! যদি ব্যাটাকে পাই—বলে, প্রচণ্ড একটা ঘুসি হাঁকালো আকাশের দিকে।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি গোড়া থেকে।

মানুষের অনেক রকম রোগ হয়: কালাজ্বর, পালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, পেটফাঁপা—এমনকি ঝিনঝিনিয়া পর্যন্ত। সব রোগের ওষুধ আছে, কিন্তু একটি রোগের নেই। সে হল পরোপকার। যখন চাগায় তখন অন্য লোকের প্রাণান্ত করে ছাড়ে।

টেনিদাকে একদিন এই রোগে ধরল। ছিল বেশ, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল কাঁসি বাজাচ্ছিল। হঠাৎ কী যে হল—কালীঘাটের এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

হাতে চিমটে, মাথায় জটা, লেংটি পরা এক বিরাটকায় সাধু। খানিকক্ষণ কটমট করে টেনিদার দিকে তাকিয়ে হেঁড়ে গলায় বললে, দে পাঁচসিকে পয়সা!

পাঁচসিকে পয়সা! টেনিদা বলতে যাচ্ছিল, ইয়ার্কি নাকি! কিন্তু সাধুর বিশাল চেহারা, বিরাট চিমটে আর জবাফুলের মতো

চোখ দেখে ভেবড়ে গেল। তো-তো করে বললে, পাঁচসিকে তো নেই বাবা, আনা-সাতেক হবে!

—আনা-সাতেক? আচ্ছা তাই দে, আর একটা বিড়ি।

—বিড়ি তো আমরা খাইনে বাবাঠাকুর!

—হুঁ, গুড-বয় দেখছি! তা বেশ। বিড়ি-ফিড়ি কক্ষনো খাসনি—ওতে যক্ষ্মা হয়! যাক—পয়সাই দে।

পয়সা হাতে পেয়ে সাধুর হাঁড়ির মতো মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। ঝুলি থেকে একটা জবা ফুল বের করে টেনিদার মাথায় দিয়ে বললে, তুই এখানে কেন রে?

—আজ্ঞে প্যাঁড়া খেতে এসেছিলাম।

সাধু বললে, তা বলছি না। তুই যে মহাপুরুষ রে! তোকে দেখে মনে হচ্ছে, পরোপকার করে তুই দেশজোড়া নাম করবি!

—পরোপকার!—টেনিদা একটা ঢোক গিলে বললে, দুনিয়ায় অনেক সৎকাজ করেছি বাবা। মারামারি, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়া, ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া—কিন্তু কখনো তো পরোপকার করিনি!

—করিসনি মানে? সাধু হেঁড়ে গলায় বললে, তুই ছোকরা তো বড্ড এঁড়ে-তক্কো করিস! এই আমাকে নগদ সাত আনা পয়সা দিলি, খেয়াল নেই বুঝি? আমার কথা শোন্! সংসার-টংসার ছেড়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে যা। দুনিয়ায় মানুষের অশেষ দুঃখ—সেই দুঃখ দূর করতে আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়্। আর্তের সেবা কর্—দেখবি তিন দিনেই তোর নামে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। দে-দে একটা বিড়ি দে—

—বললাম যে বাবাঠাকুর, আমি বিড়ি খাই না।

—ওহো, তাও তো বটে ! বেশ, বেশ বিড়ি কখনো খাসনি। আর শোন্—পরের উপকারে নশ্বর জীবন বিলিয়ে দে। আজ থেকেই লেগে যা—বলে কান থেকে একটা আধপোড়া বিড়ি নামিয়ে, সেটা ধরিয়ে সাধু ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

টেনিদা খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই—কালীঘাটের মা কালীর মহিমাতেই কি না কে জানে —সাধুর কথাগুলো তার মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। পরোপকার ? সত্যিই তো, তার মতো কি আর জিনিস আছে ! জীবন আর ক-দিনের ? সবই তো মায়া—স্রেফ ছলনা ! সুতরাং যে-কদিন বাঁচা যায়—লোকের ভালো করেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

সেই রাত্রেই সংসার ছাড়ল টেনিদা। মানে কলকাতা ছাড়ল।

গেল দেশে। কলকাতা থেকে মাইল-দশেক দূরে ক্যানিং লাইনে বাড়ি। গাঁয়ের নাম ধোপাখোলা। দেশের বাড়িতে দূর-সম্পর্কের এক বুড়ি জ্যাঠাইমা থাকেন। কানে খাটো। টেনিদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁরে, এমন অসময়ে দেশে এলি যে ?

—পরোপকার করব জেঠিমা !

—পুরী খেতে এসেছিস ? পুরী এখানে কোথায় বাবা ? পোড়া দেশে কি আর ময়দা-ফয়দা কিছু আছে ? ইংরেজ রাজত্বে আর বেঁচে সুখ নেই !

—ইংরেজ রাজত্ব কোথায় জেঠিমা ? এখন তো আমরা স্বাধীন, মানে—টেনিদা বাংলা করে বুঝিয়ে দিলে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট !

—কোট-প্যাণ্ট ?—জ্যেঠিমা বললেন, ছি বাবা, আমি বিধবা মানুষ, কোট-প্যাণ্ট পরব কেন ? থান পরি।

—দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালা হল! আমি বলছিলাম, দেশে রোগ-বালাই কিছু আছে?

—মালাই! মালাই খাবি? দুধই পাওয়া যায় না! গো-মড়কে সব গরু উচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

—উঃ—কানে হাত দিয়ে টেনিদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু দিন-তিনেক গ্রামে ঘুরে টেনিদা বুঝতে পারল, সত্যিই পরোপকারের অখণ্ড সুযোগ আছে। গ্রাম জুড়ে দারুণ ম্যালেরিয়া। পেটভরা পিলে নিয়ে সারা গাঁয়ের লোক রাত-দিন কোঁ-কোঁ করছে। সেইদিনই কলকাতায় ফিরল টেনিদা। পাঁচ-বোতল তেতো পাঁচন কিনে নিয়ে দেশে চলে গেল। কিন্তু দুনিয়াটা যে কী যাচ্ছেতাই জায়গা, সেটা টের পেতে তার দেরি হল না।

অসুখে ভুগে মরবে, তবু ওষুধ খাবে না।

একটা জামগাছের নিচে বসে ঝিমুচ্ছিল গজানন সাঁতরা। সন্দেহ কী—নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়া! টেনিদা গজাননের দিকে এগিয়ে এল। তারপর গজানন ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে এবং ট্যাঁ-ফোঁ করে উঠবার আগেই টেনিদা তার মুখে আধ বোতল জ্বরারি পাঁচন ঢেলে দিলে। যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি তেতো। আসলে গজাননের জ্বর-ফর কিছু হয়নি—খেয়েছিল খানিকটা তাড়ি। যেমন পাঁচন পড়া—নেশা ছুটে গিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সোজা 'মার-মার' শব্দে টেনিদাকে তাড়া করল।

কিন্তু ধরতে পারবে কেন? লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে টেনিদা ততক্ষণে পগার পার।

কী সাঙ্ঘাতিক লোক এই গজানন! পরোপকার বুঝল না, —বুঝল না টেনিদার মধ্যে আজ মহাপুরুষ জেগে উঠেছে। তবু হাল ছাড়লে চলবে না। পরের ভালো করতে গেলে এমন কিছু-

না-কিছু হয়ই। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে টেনিদা স্বগতোক্তি করলে, এই ছ্যাখো না বিদ্যাসাগর মশাই···

পরদিন বিকেলে সে গেল গ্রামের পাঁচুমামার বাড়িতে। একটা ভাঙা ইজিচেয়ারে শুয়ে পাঁচুমামা উঃ-আঃ করছেন।

—কী হয়েছে মামা?—বগল থেকে পাঁচনের বোতলটা বাগিয়ে দাঁড়ালো টেনিদা।

—এই গেঁটে বাত বাবা! গাঁটে গাঁটে ব্যথা। করুণ স্বরে পাঁচুমামা জানালেন।

—বাত? ওঃ!—টেনিদা মুহূর্তের জন্যে কেমন দমে গেল। তারপরেই উৎসাহের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

—আর ম্যালেরিয়া? ম্যালেরিয়া কখনো হয়নি?

—হয়েছিল বৈকি। গত বছর।

—হতেই হবে!—বিজ্ঞের মতো গম্ভীর গলায় টেনিদা বললে, ঐ হল রোগের জড়। ঐ ম্যালেরিয়া থেকেই সব। কিন্তু ভেবো না—বাত-ফাত সব ভালো করে দিচ্ছি।

—ভাল করে দিবি?—পাঁচুমামার মুখে-চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে বেরুল: তুই তাহলে ডাক্তার হয়ে এসেছিস? কই শুনিনি তো!

—ডাক্তার কী বলছ মামা—তার চেয়ে ঢের বড়! একেবারে মহাপুরুষ!

অগাধ বিস্ময়ে পাঁচুমামা হাঁ করলেন। টেনিদার দিকেই মুখ করে ছিলেন; কাজেই হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয়—সোজা জ্বরারি পাঁচন চলে গেল মামার গলার মধ্যে।

—ওয়াক্-ওয়াক্! ওরে বাবা রে—ডাকাত রে—মেরে ফেললে রে—ওয়াক্-ওয়াক্—গেছি-গেছি—পাঁচুমামা হাহাকার করে উঠলেন।

টেনিদা ততক্ষণে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে। শুনতে পেল, ভেতর থেকে মামা অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গাল দিচ্ছেন। তা দিন —তাতে কিছু আসে যায় না। পরোপকার তো হয়েছে! এর দাম মামা বুঝবে যথাসময়ে। তৃপ্তির হাসি নিয়ে টেনিদা পথ চলল।

খানিক দূর আসতেই চোখে পড়ল, একটা আমগাছ-তলায় একটি বছর-আটেকের ছেলে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চ্যাচাচ্ছে।

—এই, কী নাম তোর ?

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, লাড্ডু।

—লাড্ডু! তা অমন করে কাঁদছিস কেন ? চোখের জলে যে হালুয়া হয়ে যাবি—আর লাড্ডু থাকবি না! কী হয়েছে তোর ?

—বড়দা চাঁটি মেরেছে।

—কেন, তোকে তবলা ভেবেছিল বুঝি ?

—না! লাড্ডু বললে, আমি কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলাম।

—এই কার্তিক মাসে কাঁচা আম খেতে চেয়েছিস! শুধু চাঁটি নয়, গাঁট্টা খাওয়ার মতো শখ!

টেনিদা চলে যাচ্ছিল, কি মনে হতেই ফিরে দাঁড়ালো হঠাৎ।

—তোর টক খেতে খুব ভাল লাগে বুঝি ?

লাড্ডু মাথা নাড়ল।

—হুঁ—নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়ার লক্ষণ! তোর জ্বর হয় ?

—হয় বৈকি!

—তবে আর কথা নেই—টেনিদা বোতল বের করে বললে, হাঁ কর—

লাড্ডু আশান্বিত হয়ে বললে, আচার বুঝি ?

—আচার বলে আচার! দুরাচার, কদাচার, সদাচার—সক্কলের সেরা এই আচার! হাঁ কর—হাঁ কর ঝটপট—

লাড্ডু হাঁ করল।

তার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। 'বাপরে মা-রে বড়দা-রে' বলে লাড্ডু চেঁচিয়ে উঠল।

টেনিদা দ্রুত পা চালালো।

—বাপ!—

পিঠের উপর একটা ঢিল পড়তেই চমকে উঠল টেনিদা। লাড্ডু ঢিল চালাচ্ছে। অতএব যঃ পলায়তি—এবং প্রাণপণে। লাড্ডু বাচ্চা হলেও ঢিলে বেশ জোর আছে, হাতের তাকও তার ফসকায় না।

কিন্তু আর চলে না! গ্রামের লোক ক্ষেপে উঠেছে তার ওপর। বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখলে হৈ-হৈ করে ওঠে। রাস্তায় দেখলে তেড়ে আসে। তাকে দেখলে ছেলেপুলে পালাতে পথ পায় না।

জ্যাঠাইমা বললেন, তুই কী শুরু করেছিস বাবা? লোকে যে তোকে ঠ্যাঙাবার ফন্দি আঁটছে!

টেনিদা গম্ভীর হয়ে রইল। পরে বললে, পরের জন্যে আমি প্রাণ দেব জেঠিমা!

—কী বললি? ঘরের লোকের কান কেটে নিবি? কী সর্বনাশ! ওগো, আমাদের টেনু কি পাগল হয়ে গেল গো—মড়াকান্না জুড়লেন জ্যাঠাইমা।

উদাস ব্যথিত মনে পথে বেরিয়ে পড়ল টেনিদা। কী অকৃতজ্ঞ নরাধম দেশ! এই দেশের উপকারের জন্যে সে মরীয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ কেউ বুঝছে না তার কদর! ছিঃ ছিঃ! এইজন্যেই দেশ আজ পরাধীন—থুড়ি—স্বাধীন! কিন্তু কী করা যায়? কী ভাবে মানুষগুলোর উপকার করা যায়?

টেনিদা শূন্য মনে একটা গাছতলায় এসে বসল। ভরা দুপুর। কার্তিক মাসের নরম রোদের সঙ্গে ঝিরঝিরে হাওয়া। আকুল হয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল।

একটু দূরে একটা নিমগাছের নিচে একটা ছাগল ঝিমুচ্ছে।

ঝিমুচ্ছে! ভারি খারাপ লক্ষণ! এখানকার জলে হাওয়ায় ম্যালেরিয়া! ছাগলকেও ধরেছে। ধরাই স্বাভাবিক! আহা—অবোলা জীব! উপকার করতে হয়, তো ওদেরই! কেউ কখনো ওদের দুঃখ বোঝে না। আহা!

তাছাড়া সুবিধেও আছে। মানুষের মতো এরা অকৃতজ্ঞ নয়। উপকার করতে গেলে তেড়ে মারতেও আসবে না। ঠিক কথা—আজ থেকে সেই অসহায় প্রাণীগুলোর ভালো করাই তার ব্রত। ছিঃ ছিঃ! কেন এতদিন তার একথা মনে হয়নি!

পাঁচনের বোতল বাগিয়ে নিয়ে টেনিদা ছাগলের দিকে পা বাড়ালো।

তারপর?

তারপরের গল্প তো আগেই বলে নিয়েছি।

ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন

বউবাজার দিয়ে আসতে আসতে ভীমনাগের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল টেনিদা। আর নড়তে চায় না।

আমি বললুম, রাস্তার মাঝখানে অমন করে দাঁড়ালে কেন? চল।

যেতে হবে? নিতান্তই যেতে হবে? কাতর দৃষ্টিতে টেনিদা তাকাল আমার দিকে: প্যালা, তোর প্রাণ কি পাষাণে গড়া? ওই ছাখ, থরে থরে সন্দেশ সাজানো রয়েছে, থালার ওপর সোনালি রঙের রাজভোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, রসের মধ্যে ডুব-সাঁতার কাটছে রসগোল্লা, পান্‌তো! প্যালা রে—

আমি মাথা নেড়ে বললুম, চালাকি চলবে না। আমার পকেটে তিনটে টাকা আছে, ছোটমামার জন্যে মকরধ্বজ কিনতে হবে। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল এখন—

টেনিদা শাঁ করে জিভে খানিকটা লালা টেনে নিয়ে বললে, সত্যি বলছি, বড্ড খিদে পেয়েছে রে! আচ্ছা, দুটো টাকা আমায় এবার ধার দে, বিকেলে না হয় ছোটমামার জন্যে মকরধ্বজ—

কিন্তু ওসব কথায় ভোলবার বান্দা প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে নয়। টেনিদাকে টাকা ধার দিলে সে টাকা আদায় করতে পারে এমন খলিফা লোক দুনিয়ায় জন্মায়নি। পকেটটা শক্ত করে চেপে ধরে আমি বললুম, খাবারের দোকান চোখে পড়লেই তোমার পেট চুঁই চুঁই করে ওঠে—ওতে আমার সিম্প্যাথি নেই। তা ছাড়া এবেলা মকরধ্বজ না নিয়ে গেলে আমার ছেঁড়া কানটা সেলাই করে দেবে কে? তুমি?

রেলগাড়ির এঞ্জিনের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

—ব্রাহ্মণকে সকালবেলা দাগা দিলি প্যালা—মরে তুই নরকে যাবি!

—যাই তো যাব। কিন্তু ছোটমামার কানমলা যে নরকের চাইতে ঢের মারাত্মক সেটা জানা আছে আমার! আর, কী আমার ব্রাহ্মণ রে! দেলখোস্ রেস্তোরাঁয় বসে আস্তো আস্তো মুরগির ঠ্যাং চিবুতে তোমায় যেন দেখিনি আমি!

—উঃ! সংসারটাই মরীচিকা—ভীমনাগের দোকানের দিকে তাকিয়ে শেষ বার দৃষ্টিভোজন করে নিলে টেনিদা: নাঃ, বড়লোক না হলে আর সুখ নেই!

বিকেলে চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে সেই কথাই হচ্ছিল।

ক্যাবলা গেছে কাকার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে, হাবুল সেন গেছে দাঁত তুলতে। কাজেই আছি আমরা দুজন। মনের দুঃখে দু ঠোঙা তেলেভাজা খেয়ে ফেলেছে টেনিদা। অবশ্য পয়সাটা আমিই দিয়েছি এবং আধখানা আলুর চপ ছাড়া আর কিছুই আমার বরাতে জোটেনি।

আমার পাঞ্জাবীর আস্তিনটা টেনে নিয়ে টেনিদা মুখটা মুছে ফেলল। তারপর বললে, বুঝলি প্যালা, বড়লোক না হলে সত্যিই আর চলছে না!

—বেশ তো, হয়ে যাও না বড়লোক—আমি উৎসাহ দিলুম।

—হয়ে যাও না বড়লোক! হওয়াটা একেবারে মুখের কথা কিনা! টাকা দেবে কে, শুনি? তুই দিবি?—টেনিদা ভেংচি কাটল। আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না, আমি দেব না।

—তবে?

—লটারির টিকেট কেনো।—আমি উপদেশ দিলুম।

—ধ্যাত্তোর লটারির টিকিট! কিনে কিনে হয়রান হয়ে গেলুম, একটা ফুটো পয়সাও যদি জুটত কোনবার! লাভের মধ্যে টিকিটের জন্যে বাজারের পয়সা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লুম, বড়দা দুটো অ্যায়সা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে! ওতে হবে না—বুঝলি? বিজ্‌নেস করতে হবে।

—বিজ্‌নেস!

—আলবৎ বিজ্‌নেস!—টেনিদার মুখ সঙ্কল্পে কঠোর হয়ে উঠল: ওই যে কী বলে, হিতোপদেশে লেখা আছে না, বাণিজ্যে বসতি ইয়ে—মানে লক্ষ্মী! ব্যবসা ছাড়া পথ নেই—বুঝেছিস?

—তা তো বুঝেছি। কিন্তু তাতেও তো টাকা চাই।

—এমন বিজ্‌নেস করব যে নিজের একটা পয়সাও খরচ হবে না। সব পরস্মৈপদী—মানে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে।

—সে আবার কী বিজ্‌নেস?—আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলুম।

—হুঁ-হুঁ, আন্দাজ কর্ দেখি?—চোখ কুঁচকে মিটি মিটি হাসতে লাগল টেনিদা: বলতে পারলি না তো? ওসব কি তোর মতো নিরেট মগজের কাজ? এমনি একটা মাথা চাই, বুঝলি?—সগৌরবে টেনিদা নিজের ব্রহ্মতালুতে দুটো টোকা দিলে।

—কেন ছলনা করছ? বলেই ফেল না—আমি কাতর হয়ে জানতে চাইলুম।

টেনিদা একবার চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিলে, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, ফিলিম্ কোম্পানি!

—অ্যাঁ ! !—আমি লাফিয়ে উঠলুম।

—গাধার মতো চ্যাঁচাস্‌নি—টেনিদা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল ঃ সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। তুই গল্প লিখবি—আমি ডাইরেকট—মানে পরিচালনা করব। দেখবি চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে যাবে !

—ফিলিমের কী জানো তুমি ?—আমি জানতে চাইলুম।

—কে-ই বা জানে ?—টেনিদা তাচ্ছিল্য-ভরা একটা মুখভঙ্গি করলে ঃ সবাই সমান—সকলের মগজেই গোবর। তিনটে মারামারি, আটটা গান আর গোটাকতক ঘর বাড়ি দেখালেই ফিলিম হয়ে যায় ! টালিগঞ্জে গিয়ে আমি শুটিং দেখে এসেছি তো।

—কিন্তু তবুও—

—ধ্যাৎ, এই একটা গাড়ল !—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, সত্যি সত্যিই কি আর ছবি তুলব আমরা ! ওসব ঝামেলার মধ্যে কে যাবে !

—তাহলে ?

—শেয়ার বিক্রি করব। বেশ কিছু শেয়ার বিক্রি করতে পারলে—বুঝলি তো ?—টেনিদা চোখ টিপল ঃ দ্বারিক, ভীমনাগ, দেলখোস, কে. সি. দাস—

এইবার আমার নোলায় জল এসে গেল। চুক্‌চুক্‌ করে বললুম—থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না !

পরদিন গোটা পাড়াটাই পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল ঃ

“দি ভজহরি ফিল্‌ম্‌ কর্পোরেশন”

আসিতেছে—আসিতেছে

রোমাঞ্চকর বাণীচিত্র

“বিভীষিকা” !!

পরিচালনা ঃ ভজহরি মুখোপাধ্যায় (টেনিদা)

কাহিনী ঃ প্যালারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

তার নিচে ছোট ছোট হরফে লেখা ঃ

সর্বসাধারণকে কোম্পানির শেয়ার কিনিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য মাত্র আট আনা। একত্রে তিনটি শেয়ার কিনিলে মাত্র এক টাকা।

এর পরে একটা হাত এঁকে লিখে দেওয়া হয়েছে ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য—শেয়ার কিনিলে প্রত্যেকেরই বইতে অভিনয়ের চান্স দেওয়া হইবে। এমন সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। মাত্র অল্প শেয়ার আছে, এখন না কিনিলে পরে পস্তাইতে হইবে। সন্ধান করুন—১৮নং পটলডাঙা স্ট্রীট, কলিকাতা।

আর, বিজ্ঞাপনের ফল যে কত প্রত্যক্ষ হতে পারে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতে-নাতে তার প্রমাণ মিলে গেল। এমন প্রমাণ মিলল যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা আমরা আশা করিনি। টেনিদাদের অত বড় বাড়িটা একেবারে খালি, বাড়িশুদ্ধু সবাই গেছে দেওঘরে হাওয়া বদলাতে। টেনিদার ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে, তাই একা রয়ে গেছে বাড়িতে, আর আছে চাকর বিষ্টু।

তাই দিব্যি আরাম করে বসে আমরা তে-তলার ঘরে রেডিয়ো শুনছি আর পাঁটার ঘুগনি খাচ্ছি, এমন সময় বিষ্টু খবর নিয়ে এল মূর্তিমান একটি ভগ্নদূতের মতো।

বিষ্টুর বাড়ি চাটগাঁয়। হাঁই-মাই করে নাকি সুরে কী যে বলে ভালো বোঝা যায় না। তবে যেটুকু বোঝা গেল, শুনে আমরা আঁতকে উঠলুম। গলায় পাঁটার ঘুগনি বেধে গিয়ে মস্ত একটা বিষম খেলো টেনিদা।

বিষ্টু জানালো : 'আঁড়িত্ ডাঁহাইত হইড়্ছে' (বাড়িতে ডাকাত পড়েছে) !

বলে কী ব্যাটা ! পাগল না পেট-খারাপ ! ম্যাড়া না মিরগেল ! এই ভরদুপুর বেলায় একেবারে কলকাতার বুকের ভেতরে ডাকাত পড়বে কী রকম !

বিষ্টু বিবর্ণ মুখে জানালো : নিছে হাঁসি দেইক্যা যান (নিচে এসে দেখে যান) ।—আমি ভাবছিলাম খাটের তলাটা নিরাপদ জায়গা কি না, কিন্তু টেনিদা এমন এক বাঘা হাঁকার ছাড়লে যে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা দস্তুরমতো হকৃচকিয়ে উঠল ।

—কাপুরুষ ! চলে আয় দেখি—একটা বোম্বাই ঘুষি হাঁকিয়ে ডাকাতের নাক থ্যাবড়া করে দি ! আমি নিতান্ত গোবেচারা প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে, সিং মাছের ঝোল খেয়ে প্রাণটাকে কোনমতে ধরে রেখেছি, ওসব ডাকাত-ফাকাতের ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। বেশ তো ছিলাম, এসব ভজঘট ব্যাপার কেন রে বাবা ! আমি বলতে চেষ্টা করলুম, এই—এই মানে, আমার কেমন পেট কামড়াচ্ছে—

—পেট কামড়াচ্ছে ! টেনিদা গর্জন করে উঠল : পাঁঠার ঘুগনি সাবাড় করার সময় তো সে কথা মনে ছিল না দেখছি ! চলে আয় প্যালা, নইলে তোকেই আগে—

কথাটা টেনিদা শেষ করল না, কিন্তু তার বক্তব্য বুঝতে বেশি দেরি হল না আমার। 'জয় মা দুর্গা,—কাঁপতে কাঁপতে আমি টেনিদাকে অনুসরণ করলুম ।

কিন্তু না—ডাকাত পড়েনি ।

পটলডাঙার মুখ থেকে কলেজ স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত 'কিউ' ।

কে নেই সেই কিউতে ? স্কুলের ছেলে, মোড়ের বিড়িওয়ালা,

পাড়ার ঠিকে ঝি, উড়ে ঠাকুর, এমনকি যমদূতের মত দেখতে একজোড়া ভীমদর্শন কাবুলিওয়ালা।

আমরা সামনে এসে দাঁড়াতেই গগনভেদী কোলাহল উঠল ঃ

—আমি শেয়ার কিনব—

—এই নিন মশাই আট আনা পয়সা—

ঝি বললে, ওগো বাছারা, আমি একটা ট্যাকা এনেছি। আমাকে তিনখানা শেয়ার দাও—আর একটি হিরোইনের চান্স দিয়ো—

পাশের বোর্ডিংটার উড়ে ঠাকুর বললে, আমিও আষ্টো গণ্ডা পয়সা আনুচি—

সকলের গলা ছাপিয়ে কাবুলিওয়ালা রুদ্র কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল ঃ এঃ বাব্বুঃ, এক রুপেয়া লায়া, হাম্‌কো ভি চান্স চাহিয়ে—

তারপরেই সমস্বরে চিৎকার উঠল ঃ চান্স—চান্স !

চিৎকারের চোটে আমার মাথা ঘুরে গেল—দু-হাতে কান চেপে আমি বসে পড়লুম।

আশ্চর্য, টেনিদা দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল একেবারে শান্ত স্তব্ধ বুদ্ধদেবের মতো। শুধু তাই নয়, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত একটা দাঁতের ঝলক বয়ে গেল তার—মানে হাসল।

তারপর বললে, হবে, হবে, সকলেরই হবে।—বরাভয়ের মতো একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, প্রত্যেককেই চান্স দেওয়া হবে। এখন চাঁদেরা আগে সুড়-সুড় করে পয়সা বের করো দেখি ! খবর্দার, অচল আধুলি চালিয়ো না, —তা হলে কিন্তু—

—জয় হিন্দ্‌—জয় হিন্দ্‌—

ভিড়টা কেটে গেলে টেনিদা দু-হাত তুলে নাচতে শুরু করে

দিলে। তারপর ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ার-শুদ্ধই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

আমি বললুম, আহা-হা—

কিন্তু টেনিদা উঠে পড়েছে ততক্ষণে। আমার কাঁধের ওপর এমন একটা অতিকায় থাবড়া বসিয়ে দিলে যে, আমি আর্তনাদ করে উঠলুম।

—ওরে প্যালা, আজ দুঃখের দিন নয় রে, বড় আনন্দের দিন! মার দিয়া কেল্লা! ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ, চাচার হোটেল, দেলখোস—আঃ!

যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আমিও বললুম, আঃ!

—আয়, গুণে দেখি—এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত আবার হাসির ঝলক উলসে উঠল।

রোজগার নেহাত মন্দ হয়নি। গুণে দেখি ছাব্বিশ টাকা বারো আনা।

—বারো আনা?—টেনিদা ভ্রূকুটি করলে, বারো আনা কী করে হয়? আট আনা আর এক টাকা করে হলে—উঁহু! নিশ্চয় ডামাডোলের মধ্যে কোন ব্যাটা চার গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দিয়েছে—কী বলিস?

আমি মাথা নেড়ে জানালুম আমারও তাই মনে হয়।

—উঃ—দুনিয়ায় সবই জোচ্চোর! একটাও কি ভালো লোক থাকতে নেই রে? দিলে সকাল বেলাটায় বামুনের চার-চার আনা পয়সা ঠকিয়ে!—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: যাক, এতেও নেহাত মন্দ হবে না। দেলখোস, ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ—

আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিলুম, চাচার হোটেল, কে. সি. দাস—

টেনিদা বললে, ইত্যাদি—ইত্যাদি। কিন্তু শোন্ প্যালা,

একটা কথা আগেই বলে রাখি। প্ল্যানটা আগাগোড়াই আমার। অতএব বাবা সোজা হিসেব—চৌদ্দ আনা—দু আনা!

আমি আপত্তি করে বললুম, অ্যাঁ, তা কী করে হয়?

টেনিদা সজোরে টেবিলে একটা কিল মেরে গর্জন করে উঠল, হুঁ, তাই হয়! আর তা যদি না হয়, তা হলে তোকে সোজা দোতলার জানলা গলিয়ে নিচে ফেলে দেওয়া হয়; সেটাই কি তবে ভালো হয়?

আমি কান চুলকে জানালুম, না, সেটা ভালো হয় না।

—তবে চল্—গোটাকয়েক মোগলাই পরোটা আর কয়েক ডিশ ফাউল কারি খেয়ে ভজহরি ফিল্ম্ কর্পোরেশনের মহরত করে আসি।—টেনিদা ঘর-ফাটানো একটা পৈশাচিক অট্টহাসি করে উঠল। হাসির শব্দে ভেতর থেকে ছুটে এলো বিষ্টু। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললে, ছুটোবাবুর মাথা হাঁড়াপ (খারাপ) অইচে!

কিন্তু—দিন কয়েক বেশ কেটে গেল। দ্বারিকের রাজভোগ আর চাচার কাটলেট খেয়ে শরীরটাকে দস্তুরমতো ভালো করে ফেলেছি দুজনে। কে. সি. দাশের রসোমালাই খেতে খেতে দুজনে ভাবছি—আবার নতুন কোনো একটা প্ল্যান করা যায় কি না, এমন সময়—

দোরগোড়ায় যেন বাজ ডেকে উঠল!

সেই যমদূতের মতো একজোড়া কাবুলিওয়ালা। অতিকায় জাব্বা-জোব্বা আর কালো চাপদাড়ির ভেতর দিয়ে যেন জিঘাংসা ফুটে বেরোচ্ছে।

আমরা ফিরে তাকাতেই লাঠি ঠুকল: এঃ বাব্বুঃ—রুপেয়া কাঁহা? হাম্‌লোগ কা চান্স কিধর?

—অ্যাঁঃ !—টেনিদার হাত থেকে রসোমালাইটা বুক-পকেটের ভেতর পড়ে গেল ঃ প্যালা রে, সেরেছে !

—সারবেই তো !—আমি বললুম, তবে আমার সুবিধে আছে। চৌদ্দ আনা—দু আনা। চৌদ্দ আনা ঠ্যাঙানি তোমার, মানে স্রেফ্ ছাতু করে দেবে। দু আনা খেয়ে আমি বাঁচলেও বেঁচে যেতে পারি।

কাবুলিওয়ালা আবার হাঁকল ঃ—এঃ ভজহরি বাব্বু—বাহার তো আও—

বাহার আও—মানেই নিমতলা যাও ! টেনিদা এক লাফে উঠে দাঁড়াল, তারপর সোজা আমাকে বগলদাবা করে পাশের দরজা দিয়ে অন্যদিকে।

—ওগো ভালোমানুষের বাছারা, আমার ট্যাকা কই, চান্স কই ?

ঝি। হাতে আঁশবটি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—আমারো চান্সো মিলিবো কি না ?—উড়ে ঠাকুর ভাত রাঁধবার খুন্তিটাকে হিংস্রভাবে আন্দোলিত করল।

— জোচ্চুরি পেয়েচেন স্যার—আমরা শ্যামবাজারের ছেলে—আস্তিন গুটিয়ে একদল ছেলে তাড়া করে এল।

এক মুহূর্ত আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। তারপরেই—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে !' আমাকে কাঁধে তুলে টেনিদা একটা লাফ মারল। তারপর আমার আর ভালো করে জ্ঞান রইল না। শুধু টের পেলুম, চারদিকে একটা পৈশাচিক কোলাহল ঃ 'চোট্টা—চোট্টা—ভাগ যাতা—' আর বুঝতে পারলুম—যেন পাঞ্জাব মেলে চড়ে উড়ে চলেছি !

ধপাৎ করে মাটিতে পড়তেই আমি হাঁউমাউ করে উঠলুম।

চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, হাওড়া স্টেশন। রেলের একটা এঞ্জিনের মতোই হাঁপাচ্ছে টেনিদা।

বললে, হুঁ হুঁ বাবা, পাঁচশো মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান—আমাকে ধরবে ওই ব্যাটারা! যা প্যালা—পকেটে এখনো বারো টাকা চার আনা রয়েছে, ঝট্ করে দু-খানা দেওঘরের টিকিট কিনে আন্। দিল্লি এক্সপ্রেস এখুনি ছেড়ে দেবে।

ক্যামোফ্লেজ

চাটুজ্জেদের রোয়াকে গল্পের আড্ডা জমেছিল। আমি, ক্যাবলা, হাবুল সেন, আর সভাপতি আমাদের পটলডাঙার টেনিদা। একটু আগেই ক্যাবলার পকেট হাতড়ে টেনিদা চারগণ্ডা পয়সা রোজগার করে ফেলেছে, তাই দিয়ে আমরা তারিয়ে তারিয়ে কুল্‌পি বরফ খাচ্ছিলাম।

শুধু হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা বসে আছে। হাতের শালপাতাটার ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় কুলপির রস গড়িয়ে পড়ছে, ক্যাবলা খাচ্ছে না।

টেনিদা হঠাৎ তার বাঘা গলায় হুঙ্কার ছাড়লে, এই ক্যাবলা, খাচ্ছিস না যে ?

ক্যাবলার চোখে তখন জল আসবার জো। সে জবাব দিলে না, শুধু মাথা নাড়ল।

—খাবি না ? তবে না খাওয়াই ভালো। কুলপি খেলে ছেলেপুলের পেট খারাপ করে—বলতে না বলতেই থাবা দিয়ে টেনিদা ক্যাবলার হাত থেকে কুলপিটা তুলে নিলে, তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে সোজা শ্রীমুখের গহ্বরে।

ক্যাবলা বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ ! এর মানে কী ? বলি, মানেটা কী হল এর ?—টেনিদা বজ্রগর্ভ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

ক্যাবলা এবারে কেঁদে ফেলল : আমার চার আনা পয়সা তুমি মেরে দিলে, অথচ আমি ভাবছিলাম সিনেমা দেখতে যাব—একটা ভালো যুদ্ধের বই—

—যুদ্ধের বই—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : বলি যুদ্ধের বইতে কী দেখবার আছে র‍্যা ? খালি দুড়ুম দাড়ুম, খালি ধুম-ধাড়াক্কা, আর খানিকটা বাহাদুর কা খেল্ ! যুদ্ধের গল্প যদি শুনতে চাস তবে শোন্ আমার কাছে।

—তুমি যুদ্ধের কী জানো ?—আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

—কী বললি প্যালা ?—টেনিদার হুঙ্কারে আমার পালাজ্বরের পিলে নেচে উঠল : আমি জানিনে ? তবে কে জানে শুনি ? তুই ?

—না, না, আমি আর জানব কোত্থেকে !—আমি তাড়াতাড়ি বললাম : বাসকপাতার রস খাই আর পালাজ্বরে ভুগি, ওসব যুদ্ধ ফুদ্ধ আমি জানব কেমন করে ? তবে বলছিলাম কিনা—টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সোজা মুখে ইস্কুপ এঁটে দিলাম।

—কিছুই বলছিলি না। মানে, কখনোই কিছু বলবি না।—টেনিদা চোখ দিয়েই যেন আমাকে একটা পেল্লায় রদ্দা কষিয়ে দিলে : ফের যদি যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিস তবে ক্রুদ্ধ হয়ে নাকের ডগায় এমন একটি মুগ্ধবোধ বসিয়ে দোব যে, সোজা বুদ্ধদেব হয়ে যাবি—বুঝলি ? মানে মিউজিয়ামে নাকভাঙা বুদ্ধদেব দেখেছিস তো, ঠিক সেইরকম।

আতঙ্কে আমি একেবারে ল্যাম্প-পোস্ট হয়ে গেলাম।

টেনিদা গলা ঝেড়ে বললে, আমি যখন যুদ্ধে যাই—মানে বার্মা ফ্রণ্টে যেবার গেলাম—

খুক-খুক করে একটা চাপা আওয়াজ। হাবুল সেন হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

—হাসছিস যে হাবলা ?—টেনিদা এবার হাবুলের দিকে মনোনিবেশ করলে।

মুহূর্তে হাবুল ভয়ে পান্‌সে মেরে গেল। তোতলিয়ে বললে, এই ন্‌-ন্‌-না, ম্‌-মানে, ভাবছিলাম তুমি আবার কবে যু-যু-যুদ্ধে গেলে—

দারুণ উত্তেজনায় টেনিদা রোয়াকের সিমেণ্টের উপর একটা কিল বসিয়ে দিয়ে উঃ উঃ করে উঠল। তারপর সেটাকে সামলে নিয়ে চিৎকার করে বললে, গুরুজনের মুখে মুখে তক্কো! ওইজন্যেই তো দেশ আজো পরাধীন! বলি, আমি যুদ্ধে যাই না যাই তাতে তোর কী? গল্প চাস তো শোন্‌, নইলে স্রেফ ভাগাড়ে চলে যা। তোদের মতো বিশ্ববকাটকে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি!

—না, না, তুমি বলে যাও, আর আমরা তর্ক করব না।··· হাবুল সভয়ে আত্মসমর্পণ করল।

টেনিদা কুলপির শালপাতাটা শেষ বার খুব দরদ দিয়ে চেটে নিলে, তারপর সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, তবে শোন্‌—

আমি তখন যুদ্ধ করতে করতে আরাকানের এক দুর্গম পাহাড়ী জায়গায় চলে গেছি। জাপানীদের পেলেই এমন করে ঠেঙিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাটারা 'ফুজিয়ামা' 'টুজিয়ামা' বলে ল্যাজ তুলে পালাতে পথ পাচ্ছে না। তেরো নম্বর ডিভিশনের আমি তখন কম্যান্‌ডার—তিন তিনটে ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়ে গেছি।

ক্যাবলা ফস্‌ করে জিজ্ঞেস করলে, সে ভিক্টোরিয়া ক্রসগুলো কোথায়?

—অত খোঁজে তোর দরকার কী? বলি গল্প শুনবি, না বাগড়া দিবি বল্‌তো?

—যেতে দাও, যেতে দাও। অমৃতং ক্যাবলা-ভাষিতং। তুমি গল্প চালিয়ে যাও টেনিদা—হাবুল মন্তব্য করলে।

—যুদ্ধ করতে করতে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলাম—যার নাম তোরা কাগজে খুব দেখেছিস। নামটা ভুলে যাচ্ছি—সেই যে কিসের একটা ডিম—

আমি বললাম, হাঁসের ডিম ?

টেনিদা বললে, তোর মাথা !

ক্যাবলা বললে, তবে কি মুরগির ডিম ?

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু !

আমি আবার বললাম, তবে নিশ্চয় ঘোড়ার ডিম। তাও না ? কাকের ডিম, বকের ডিম, ব্যাঙের ডিম—

ক্যাবলা বললে, ঠিক, ঠিক, আমার যেন মনে পড়েছে। বোধ হয় টিক্‌টিকির ডিম—

—অ্যাই, অ্যাই মনে পড়েছে !—টেনিদা এমনভাবে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে যে ক্যাবলা আর্তনাদ করে উঠল: ঠিক ধরেছিস, টিড্ডিম !···হ্যাঁ—যা বলছিলাম। টিড্ডিমে তখন পেল্লায় যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানী পেলেই পটাপট মেরে দিচ্ছি। চা খেতে খেতে জাপানী মারছি, ঝিমুতে ঝিমুতে জাপানী মারছি, এমন কি যখন ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছি তখনো কোন্ না দু-চারটে জাপানী মেরে ফেলছি !

—নাক ডাকাতে ডাকাতে জাপানী মারা ! সে আবার কী রকম ?—আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

—হে-হে-হে—টেনিদা একগাল হাসল: সে ভারী ইণ্টারেস্টিং! আমার এই কুতুব-মিনারের মতো নাকই দেখেছিস, এর ডাক তো কখনো শুনিস নি ! একেবারে যাকে বলে রণ-ডম্বরু ! ওইজন্যেই তো মেজকাকা গেল বছর বিলিতী ইঞ্জিনিয়ার ডেকে আমার ঘরটা সাউণ্ড প্রুফ করিয়ে নিলে, যাতে বাইরে থেকে ওর

আওয়াজ কারো কানে না যায়। তা ছাড়া পাড়ার লোকেও কর্পোরেশনে লে খালেখি করছিল কা! একদিন তো পুলিশ এসে বাড়ি তছনছ—রোজ রাত্রে এ বাড়িতে মেশিন গানের আওয়াজ পাওয়া যায়, নিশ্চয় এখানে বে-আইনি অস্ত্রের কারখানা আছে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড! যাক সে গল্প আর একদিন হবে।

হ্যাঁ—গল্পটা বলি। রোজ রাত্রে ট্রেঞ্চ থেকে আমার নাকের এমনি আওয়াজ বেরুত যে আর সেন্ট্রি দরকার হত না। জাপানীরা ভাবত, সারা রাত বুঝি মেশিন গান চলছে, তাই পাহাড়ের ওপার থেকে তারা আর নাক গলাবার ভরসা পেত না। আমাদের যিনি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার ছিলেন—নাম বোধহয় মিস্টার বোগাস্—তাঁর মগজে শেষে একটা চমৎকার বুদ্ধি গজালো। তিনি একটা লোক রাখলেন। সে ব্যাটা সারারাত আমার পাশে বসে থাকত আর আমার নাকে একটার পর একটা শিসের গুলি, পাথরের টুকরো যা পারত বসিয়ে দিত। আধ সেকেণ্ডের মধ্যেই দোনলা বন্দুকের ছুটো গুলির মতো সেগুলো ছিটকে বেরিয়ে যেত—কত জাপানী যে ওতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই।

আমি বিড়-বিড় করে আওড়ালাম : সব গাঁজা!

টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরল : কী বললি?

—না, না, বলছিলাম, এই আর কি—আমি সামলে গেলাম : কী মজা!

—হ্যাঁ, সে খুব মজার ব্যাপার! ওইজন্যেই তো একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস পাই আমি—টেনিদা তার দুর্দান্ত নাকটাকে গণ্ডারের খাঁড়ার মতো সগৌরবে আকাশের দিকে তুলে ধরল।

—তারপর ? এই নাকের জোরেই বুঝি যুদ্ধজয় হল ?—হাবুল জানতে চাইল।

—অনেকটা। জাপানীদের যখন প্রায় নিকেশ করে ছেড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল। আর সেইটেই হল আমাদের আসল গল্প।

—বলো, বলো—আমরা তিনজনে সমস্বরে প্রার্থনা জানালাম।

টেনিদা আবার শুরু কল্লল: আমার একটা কুকুর ছিল। তোদের বাংলা দেশের ঘিয়ে-ভাজা নেড়ি কুত্তো নয়, একটা বিরাট গ্রে-হাউণ্ড। যেমন তার গাঁক-গাঁক ডাক, তেমনি তার বাঘা চেহারা। আর কী তালিম ছিল তার! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দু পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত। বেচারা অপঘাতে মারা গেল। দুঃখ হয় কুকুরটার জন্যে, তবে বামুনের জন্যে মরেছে, ব্যাটা নির্ঘাত স্বর্গে যাবে।

—কী করে মরল ?—হাবুল প্রশ্ন করল।

—আরে দাঁড়া না কাঁচকলা! যত সব ব্যস্তবাগীশ, আগে থেকেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে গল্পটা মাটি করে দিচ্ছে!

—যাক, যা বলছিলাম। একদিন বিকেলবেলা, হাতে তখন কোন কাজ নেই—আমি সেই কুকুরটাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়ী জঙ্গলে বেড়াচ্ছি হাওয়া খেয়ে। দু-দিন আগেই জাপানী ব্যাটারা ওখান থেকে সরে পড়েছে, কাজেই ভয়ের কোন কারণ ছিল না। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে, আর আমি চলেছি পেছনে পেছনে।

কিন্তু ওই বেঁটে ব্যাটাদের পেটে পেটে শয়তানি! দিলে এই টেনি শর্মাকেই একটা লেঙ্গি কষিয়ে। যেতে যেতে দেখি, পাহাড়ের এক নিরিবিলি জায়গায় এক দিব্যি আমগাছ। যত না পাতা, তার

চাইতে ঢের বেশি পাকা আম তাতে। একেবারে কাশীর ল্যাংড়া ! দেখলে নোলা শক্‌শক্‌ করে ওঠে !

—আরাকানের পাহাড়ে কাশীর ল্যাংড়া !—আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললাম।

—দ্যাখ্‌, প্যালা, ফের বাধা দিয়েছিস তো একটা. চাঁটি হাঁকিয়ে—

—আহা যেতে দাও—যেতে দাও—হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, পোলাপান !

—পোলাপান !—টেনিদা গর্জে উঠল ঃ আবার বকর-বকর করলে একেবারে জলপান করে খেয়ে ফেলব—এই বলে দিলাম, হুঁঃ !

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। খাস কাশীর ল্যাংড়া ! কুকুরটা আমাকে একটা চোখের ইঙ্গিত করে বললে, গোটা-কয়েক আম পাড়ো।

ক্যাবলা বললে, কুকুরটা আম খেতে চাইল ?

—চাইলই তো। এ তো আর তোদের এঁটুলি-কাটা নেড়ি কুত্তো নয়, সেরেফ বিলিতি গ্রে-হাউণ্ড। আম তো আম ! কলা, মুলো, গাজর, উচ্ছে, নাল্‌তে শাক, সজনেডাঁটা সবই তরিবৎ করে খায়। আমি আম পাড়তে উঠলাম। আর যেই ওঠা—টেনিদা থামল।

—কী হল ?

—যা হল তা ভয়ঙ্কর। আমগাছটা হঠাৎ জাপানী ভাষায় 'ফুজিয়ামা-টুজিয়ামা' বলে ডালপালা দিয়ে আমায় সাপটে ধরলে। তারপরেই বীরের মতো কুইক্‌ মার্চ। তিন-চারটে গাছও তার সঙ্গে সঙ্গে 'নিপ্পন বান্‌জাই' বলে হাঁটা আরম্ভ করলে।

—সেকি !—আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ঃ গাছটা তোমাকে জাপটে ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে !

—করলে তো! আরে, গাছ কোথায়! স্রেফ ক্যামোফ্লেজ।

—ক্যামাফ্লেজ মানে?

—ক্যামোফ্লেজ মানে জানিসনে? কোথাকার গাড়োল সব! টেনিদা একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বললঃ মানে, ছদ্মবেশ। জাপানীরা ও ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট ছিল। জঙ্গলের মধ্যে কখনো গাছ সেজে, কখনো ঢিবি সেজে ব্যাটারা বসে থাকত। তারপর সুবিধে পেলেই—ব্যস্!

—সর্বনাশ! তারপর?

—তারপর?—টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলঃ তারপর যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

—কী হল?—আমরা রুদ্ধশ্বাসে বললাম, কী করলে তারপর?

—আমাকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। ক্যামোফ্লেজকে খুলে ফেললে, তারপর বত্রিশটা কোদালে কোদালে দাঁত বের করে পৈশাচিক হাসি হাসল। কোমর থেকে ঝক্‌ঝকে একটা তরোয়াল বের করে বললে, মিস্টার, উই উইল কাট্ ইউ!

—কী ভয়ানক!—ক্যাবলা আর্তনাদ করে বললে, তুমি বাঁচলে কী করে?

—আর কী বাঁচা যায়?—বললে, 'নিপ্পন বানজাই'—মানে, জাপানের জয় হোক। তারপর তলোয়ারটা ওপরে তুলে—

হাবুল অস্ফুটস্বরে বললে, তলোয়ারটা তুলে?

—ঝাঁ করে এক কোপ! সঙ্গে সঙ্গে আমার মুণ্ডু নেমে গেল। তারপর রক্তে রক্তময়!

—ওরে বাবা!—আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলামঃ তবে তুমি কি তাহলে—

—ভূত ? দূর গাধা, ভূত হব কেন ? ভূত হলে কারু কি ছায়া পড়ে ? আমি জলজ্যান্ত বেঁচেই আছি—কেমন ছায়া পড়েছে—দেখতে পাচ্ছিস না ?

আমাদের তিনজনের মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

হাবুল অতি কষ্টে বলতে পারল ঃ মুণ্ডু কাটা গেল, তাহলে তুমি বেঁচে রইলে কী করে ?

—হুঁ-হুঁ, আন্দাজ কর দেখি—টেনিদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসতে লাগল।

—কিছু বুঝতে পারছি না—কোন মতে বলতে পারলাম আমি। মনে মনে ততক্ষণ রাম নাম জপ করতে শুরু করেছি। টেনিদা বলে ভুল করে তাহলে কি এতকাল একটা স্কন্ধকাটার সঙ্গে কারবার করছি ?

—দূর গাধা—টেনিদা বিজয়গর্বে বললে, কুকুরটা পালিয়ে এল যে !

—তাতে কী হল ?

—তবু বুঝলি না ? আরে এখানেও যে ক্যামোফ্লেজ !

—ক্যামোফ্লেজ !

—আরে ধ্যাৎ। তোদের মগজে বিলকুল সব ঘুঁটে, এক ছটাকও বুদ্ধি নেই ! মানে আমি টেনি শর্মা—চালাকিতে অমন পাঁচশো জাপানীকে কিনতে পারি। মানে আমি কুকুর সেজে-ছিলাম, আর কুকুরটা হয়েছিল আমি। বেঁটে ব্যাটাদের শয়তানী জানতাম তো ! ওরা যখন আমার—মানে কুকুরটার মাথা কেটে ফেলেছে, সেই ফাঁকে লেজ তুলে আমি হাওয়া !

আর তারপরেই পেলাম তিন নম্বর ভিক্টোরিয়া ক্রসটা।

টেনিদা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে আমাদের সকলের বোকাটে মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর একটা পৈশাচিক হুঙ্কার ছাড়লঃ দু আনা পয়সা বার কর্ প্যালা, ওই গরম গরম চানাচুর যাচ্ছে—

টেনিদা বললে, প্যালা, মেরে দিয়েছি কেল্লা! চল একটু মিষ্টি-মুখ করে আসা যাক।

মিষ্টিমুখ করতে আপত্তি আছে এমন অপবাদ প্যালারামের শত্রুরাও দিতে পারবে না। তবে টেনিদার সঙ্গে যেতেই আপত্তি আছে একটু। ওর মিষ্টিমুখ মানেই আমার পকেট ফাঁক। টেনিদা যখনই বলেছে, চল প্যালা—বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে তোকে জলযোগ করিয়ে আনি—তখনই আমার কমসে-কম পাঁচটি করে টাকা স্রেফ বরবাদ। মানে রাজভোগগুলো ও-ই খেয়েছে—আর আমি বসে বসে দু-একটা যা খেতে চেষ্টা করেছি থাবা দিয়ে সেগুলো কেড়ে নিয়ে বলেছে, এ-সব ছেলেপুলের খেতে নেই— পেট খারাপ করে।

অতএব গেলাস দুই জল খেয়েই আমায় উঠে আসতে হয়েছে। একেবারে খাঁটি জলযোগ যাকে বলে। তাই টেনিদার প্রস্তাব কানে যেতেই আমি তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

বললাম, আমার শরীর ভালো নেই—আমি এখন মামাবাড়ি যাচ্ছি।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে খাড়া করে বললে, শরীর ভালো নেই তো মামাবাড়ি যাচ্ছিস কেন? তোর মামা কি ভেটিনারি সার্জন যে তোর মতো ছাগলকে পটাং পটাং করে ইনজেকশন দেবে? বেশি পাকামি করিসনি প্যালা—চল আমার সঙ্গে।

—সত্যি বলছি টেনিদা—

কিন্তু সত্যি মিথ্যে কিছুই টেনিদা আমায় বলতে দিলে না। আমার পিঠে পনেরো সের ওজনের একটা চাঁটি বসিয়ে বললে, কেন বচ্ছরকার প্রথম দিনটিতে একরাশ মিথ্যে বলছিস প্যালা? কোন ভাবনা নেই, বুঝলি? তোর এক পয়সাও খরচ নেই—সব পরস্মৈপদী।

—পরস্মৈপদী কে খাওয়াবে? আমাদের মতো অপোগণ্ডকে খাওয়াবার জন্যে কার মাথা-ব্যথা পড়েছে?

টেনিদা বললে, তোর মগজে আগে গোবর ছিল, এখন একেবারে নিটোল ঘুঁটে। ওরে গর্দভ, আজ যে হালখাতা! দোকানে গেলেই খাওয়াবে।

—কিন্তু আমাদের খাওয়াবে কেন? নেমন্তন্ন করেনি তো?

—সেই ব্যবস্থাই তো করেছি। টেনিদা হেঁ-হেঁ করে হেসে বললে, এই দ্যাখ—

বলেই পকেট থেকে বের করলে একগাদা লাল-নীল হালখাতার চিঠি।

—এ-সব চিঠি পেলে কোথায়?

—আরে আমার চিঠি নাকি? সব কুট্টিমামার।

—কুট্টিমামা!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই যে গজগোবিন্দ হালদার? তোকে বলিনি? সেই যে ভালুকের নাক টিকের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল? সেই কুট্টিমামা। তার অনেক এসেছে। তাই থেকেই কয়েকটা হাত-সাফাই করেছি আমি। বিশেষ করে এইটে—

বলে একটা লাল রঙের চিঠি এগিয়ে দিলে।

তাতে 'নতুন খাতা' 'মহরৎ'-টহরৎ এইসব বাঁধা গতের তলায় কালি দিয়ে লেখা আছে: প্রিয় গজগোবিন্দবাবু, অবশ্য আসিবেন।

মাংস, পোলাও, দই, রসগোল্লার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতি আপনাদের চন্দ্রকান্ত চাকলাদার—প্রোপ্রাইটার নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি।

টেনিদার চোখ চক্‌চক্ করে উঠল : দেখছিস তো খ্যাঁটের ব্যবস্থাখানা ? এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। তবে একা খেয়ে সুবিধে হবে না, তাই তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছি।

—কিন্তু টেনিদা—

টেনিদা মুখটাকে গণ্ডারের মতো করে বললে, আবার কিন্তু কী রে ! পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে তুই দেখছি একটা পটোলের দোলমা হয়ে গেছিস ! মাংস পোলাও খেতে পাবি, তাতে অত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন ?

—আমি বলছিলাম, হালখাতায় গেলে নাকি টাকা-ফাকা দিতে হয়—

—না দিলেই হল ! দোকানদারেরা এ-সময় ভারি জব্দ থাকে—জানিস তো ? যত টাকাই পাওনা থাক না কেন—মুখ ফুটে চাইতে পারে না। যত খুশি খেয়ে আয়, হাসিমুখে বলবে, আর দুটো মিহিদানা দেব স্যার ? চল্ প্যালা—এমন মওকা ছাড়তে নেই !

ভেবে দেখলাম, ছাড়া উচিত নয়। আমি টেনিদার সঙ্গই নিলাম।

প্রথমে দু-একটা খুচরো খাওয়া-দাওয়া হল।

এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ—দুটো একটা মিষ্টি—এইসব। দোকানদারেরা অবশ্য আড়চোখে টাকার থালার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আমরা কী দিই। আমরা ও-সবে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের কাজ ম্যানেজ করে গেলাম, অর্থাৎ যতটা পারা যায়

রসগোল্লা, ঘোলের সরবৎ, ডাবের জল এসব সেঁটে নিলাম। এক-আধজন বেশ ব্যাজার হল, একজনের গলা তো স্পষ্টই শোনা গেল ঃ দুশো সাতাশ টাকা বাকি—গজগোবিন্দবাবু একটা পয়সা ছোঁয়ালেন না—আবার দুটো ছোকরা এসে তিনটাকার খাবার সাবড়ে গেল !

ও-সব তুচ্ছ কথায় আমরা কান দিলাম না—দেওয়ার দরকারই বোধ হল না। উপরন্তু দু-জনে চারটে করে পান নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়।

আমি টেনিদাকে বললাম, এ-সব ঘোল-ফোল খেয়ে পেট ভরিয়ে লাভ কী ? তোমার সেই নাসিকামোহন নস্য কোম্পানিতেই চলো না !—বলতে বলতে আমার নোলায় প্রায় আধসের জল এসে গেল। পোলাওটা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাহলে খেতে জুত লাগবে না। তা ছাড়া বেশি দেরি হলে মাংসও আর থাকবে না—কেবল খানকয়েক পাঁটার হাড় পড়ে থাকবে।

টেনিদা বললে, আঃ—এই পেটুকটা দেখছি জ্বালিয়ে খেল ! এইসব টুক্‌টাক্ খেয়ে ক্ষিদেটা জমিয়ে নিচ্ছি, তা এটার কিছুতেই আর তর সইছে না !

—মানে, আমি বলেছিলাম, যদি ফুরিয়ে-টুরিয়ে যায়—

—হুঁ, সেও একটা কথা বটে !—টেনিদা নাক চুলকে বললে, আচ্ছা চল্—যাওয়া যাক—

ঠিকানা বাগবাজারের। তাও কি এক গলির মধ্যে ! অনেক খুঁজে পেতে বের করতে হল।

এই নাকি নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি ! দেখে কেমন যেন খটকা লেগে গেল। একটা পুরোনো একতলা ঘর। ভেতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। বাইরে একটা সাইনবোর্ড—তাতে

প্রকাণ্ড নাকওলা একটা লোক এক জালা নস্যি টানছে, এমনি একটা ছবি! সাইনবোর্ডটা কেমন কাত হয়ে ঝুলছে। এরাই খাওয়াবে মাংস-পোলাও!

বললাম, টেনিদা—পোলাও-টোলাওয়ের গন্ধ তো পাচ্ছি না!

টেনিদা বললে, আছে—সব আছে। চল্—ভেতরে যাই।

ঘরে ঢুকে দেখি একটা ময়লা-চাদর-পাতা তক্তপোষে দুটো যণ্ডা-মতন লোক কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে আছে। পাশে একটা কাচভাঙা আলমারি—তাতে গোটাকয়েক শিশি-বোতল। আর কিচ্ছু নেই।

আমরা কিরকম ঘাবড়ে গেলাম। জায়গা ভুল করিনি তো! কিন্তু তাই বা কী করে হবে! বাইরে তো স্পষ্টই সাইনবোর্ড ঝুলছে। ওই তো আলমারির গায়ে সাঁটা এক টুকরো কাগজে লেখা রয়েছেঃ নাসিকামোহন নস্য কোম্পানী—প্রোঃ চন্দ্রকান্ত চাকলাদার।

আমাদের দেখেই একটা লোক বাঘাটে গলায় বললে, কী চাই?

সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রায় দরজার বাইরে। টেনিদা ঢোক গিলে বললে, আমরা হালখাতার নেমন্তন্ন পেয়ে আসছি।

—হালখাতার নেমন্তন্ন!—লোকটা তেমনি বাঘা গলায় কি বলতে যাচ্ছিল, দু-নম্বর তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, কে পাঠিয়েছে তোমাদের?

ব্যাপারটা কি রকম গোলমেলে মনে হল। আমি ভাবছিলাম কেটে পড়া উচিত, কিন্তু টেনিদা হাল ছাড়ল না। পকেট থেকে সেই চিঠিটা বের করে বললে, এই তো—মামা আমাদের পাঠিয়েছেন। মামা—মানে গজগোবিন্দ হালদার—

—গজগোবিন্দ হালদার ?—প্রথম লোকটা এবারে ঝাঁটা-গোঁফের পাশ দিয়ে মিটি-মিটি হাসল: ওহো—তাই বলো! আগে বললেই বুঝতে পারতাম। আমাদের এখানে আজ স্পেশ্যাল ব্যবস্থা কিনা—তাই বেছে বেছে মাত্র জনকয়েককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তা গজগোবিন্দবাবু কোথায় ? তিনি যে বড় এলেন না ?

—তিনি একটু জরুরি কাজে আসানসোলে গেছেন—টেনিদা পটাং করে মিথ্যে কথা বলে দিলে: তাই আমাদের এখানে আসতে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

শুনে প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরে তেমনি হাসি-হাসি মুখে বললে, তা তোমরা এসেছ—তাতেও হবে। এসো-এসো—

লোকটা উঠে দাঁড়ালো।

—চল ভেতরের ঘরে। সেখানেই বিরিয়ানি পোলাও আর মোগলাই কালিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা! এসো—চলে এসো—নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

টেনিদা বললে, আয় প্যালা—

আসতে বলার দরকার ছিল না। তার অনেক আগেই এসে পড়েছি আমি। জিবের ডগায় সুড়সুড় করে উঠছে। সরবৎ-টরবৎগুলো এতক্ষণ পেটের মধ্যেই ছিল—হঠাৎ সেগুলো হজম হয়ে গিয়ে ক্ষিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি চুঁই-চুঁই করতে লাগল।

সেই লোকটার পেছনে পেছনে আমরা এগিয়ে চললাম। একটা অন্ধকার বারান্দা—তারপরে আর একটা ঘর। তার মধ্যেও আলো নেই। লোকটা বললে, ঢুকে পড়ো এখানে।

—অন্ধকার যে!—টেনিদার গলায় সন্দেহের সুর। আমার

কি রকম যেন বেয়াড়া লাগল। যে-ঘরে পোলাও কালিয়া থাকে সে ঘর অন্ধকার থাকবে কেন? পোলাওয়ের জলুসেই আলো হয়ে থাকবার কথা!

লোকটা বললে, ঢোকো না—আলো জ্বেলে দিচ্ছি।

টেনিদা ঢুকল, পেছন পেছন আমিও। আর যেই ঢুকেছি—অমনি পটাৎ করে লোকটা দরজা বন্ধ করে দিলে।

—একি—একি—দোর বন্ধ করছেন কেন?

দরজার ওপার থেকে সেই লোকটার পৈশাচিক অট্টহাসি শোনা গেল: পোলাও-কালিয়া খাওয়াব বলে!

—শেকল আটকে দিলেন কেন?—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: ঘরে তো পোলাও-কালিয়া কিছু নেই! এ যে কয়লার ঘর মনে হচ্ছে! ঘুঁটের গন্ধ আসছে—

লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় বললে, ঘুঁটের গন্ধ! শুধু ঘুঁটের গন্ধেই পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? এরপরে তিনটি বাছা বাছা গুণ্ডা আসবে—দেবে রাম ঠ্যাঙানি—যাকে বলে আড়ং-ধোলাই! প্রাণ খুলে পোলাও-কালিয়া খাবে!

শুনে আমার হাত-পা সোজা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল! আমি ধপাস্ করে সেই অন্ধকার কয়লার ঘরের মেঝেই বসে পড়লাম। নাক মুখের ওপর দিয়ে ফুড়ুক ফুড়ুক করে গোটা-চারেক আরশোলা উড়ে গেল।

টেনিদা কাঁপতে কাঁপতে বললে, আমাদের সঙ্গে এ রসিকতা কেন স্যার? আমরা কী করেছি?

—কী করেছ?—লোকটা সিংহনাদ ছাড়ল: তোমরা—মানে, তোমার মামা গজগোবিন্দ আমাদের কোম্পানী থেকে তিনশো তিপ্পান্ন টাকার নস্যি কিনেছে তিন বছর ধরে—সব

বাকিতে। একটা পয়সা ছোঁয়ায়নি। তারপর আর এ-পাড়া সে মাড়ায়নি—আর আমাদের কোম্পানী তারই জন্যে লালবাতি জ্বেলেছে। আজ তাকে ঠ্যাঙাবার জন্যেই পোলাও-মাংসের টোপ ফেলেছিলাম। সে আসেনি—তোমরা এসেছ। টাকা তো পাবই না—কিন্তু তোমাদের রাম ঠ্যাঙানি দিয়ে যতটা পারি—সুখ করে নেব। একটু দাঁড়াও গুণ্ডারা এল বলে—

টেনিদা হাঁউ-মাউ করে উঠল ঃ দোহাই স্যার—আমাদের ছেড়ে দিন স্যার! আমরা নেহাৎ নাবালক, নস্যি-টস্যির ধার ধারিনে—আমাদের ছেড়ে দিন—

কিন্তু লোকটার আর সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় শেকল দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে। গুণ্ডা ডাকতেই গেছে খুব সম্ভব।

আমার পালাজ্বরের পিলেতে গুর-গুর করে শব্দ হচ্ছে। বুকের ভেতর ঠাণ্ডা হিম। চোখের সামনে কেবল পটোল-ধুঁদুল-কাঁচকলা এইসব দেখতে পাচ্ছি। হালখাতার পোলাও খেতে গিয়ে পটলডাঙার প্যালারামের এবার পটোল তোলবার জো!

টেনিদা বললে, প্যালারে—মেরে ফেলবে যে!

আমার গলা দিয়ে কেবল কুঁই কুঁই করে খানিকটা আওয়াজ বেরুল।

—ওরে বাবা পায়ের ওপর দিয়ে যে ছুঁচো দৌড়োচ্ছে!

—এর পরে লাঠি দৌড়োবে—অনেক কষ্টে আমি বলতে পারলাম।

টেনিদা দরজাটার ওপর দুম্-দুম্ করে লাথি ছুড়তে লাগল ঃ দোহাই স্যার—ছেড়ে দিন স্যার—আমরা নেহাৎ নাবালক স্যার—

কটাৎ! আমার কপালে কিসে যেন ঠোকর মারল! তার

পরেই কী একটা প্রাণী নাকের ওপর একটা নোংরা পাখার ঘা দিয়ে উড়ে গেল। নির্ঘাত চামচিকে!

—বাপ্‌রে—বলে আমি লাফ মারলাম। এক লাফে একটা জানলার কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলাম, জানলার গরাদ ভাঙা। অর্থাৎ গলে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

টেনিদা তখনো প্রাণপণে দরজা ধাক্কাচ্ছে। চেঁচিয়ে বললাম, টেনিদা, এখানে একটা ভাঙা জানলা!

—কই? কোথায়?

—এই তো—বলেই আমি জানলা দিয়ে দু-নম্বর লাফ। আর সঙ্গে সঙ্গে—একেবারে ডাস্টবিনে রাজ্যের দুর্গন্ধ আবর্জনার ভেতরে।

টেনিদাও আমার ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল পরমুহূর্তেই। আর তক্ষুনি উল্‌টে গেল ডাস্টবিন। আমাদের গায়ে মাথায় পৃথিবীর সবরকম পচা আর নোংরা জিনিস একেবারে মাখামাখি! হালখাতার খাওয়া-দাওয়াই বটে! অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যা কিছু খেয়েছিলাম—সব ঠেলে বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে।

কিন্তু বমি করারও সময় নেই আর। পেছনে একটা কুকুর তাড়া করেছে—কারা যেন বললে, চোর—চোর! সর্বাঙ্গে সেই পচা আবর্জনা মেখে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেছি আমরা। সোজা বড় রাস্তার দিকে। সেখান থেকে একেবারে গিয়ে গঙ্গায় নামতে হবে—পুরো দু-ঘণ্টা চান না করলে গায়ের গন্ধ যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আমি সগর্বে ঘোষণা করলাম, জানিস, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে !

ক্যাবলা একটা গুলতি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা নেড়ি কুকুরের ল্যাজকে তাক করছিল। কুকুরটা বেশ বসে ছিল, হঠাৎ কি মনে করে ঘেঁাক শব্দে পিঠের একটা এঁটুলিকে কামড়ে দিলে—তারপর পাঁই-পাঁই করে ছুট লাগালো। ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে, দ্যুৎ ! কতক্ষণ ধরে টার্গেট করছি—ব্যাটা পালিয়ে গেল !—আমার দিকে ফিরে বললে, তোর ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে—এ আর বেশি কথা কী ! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, রাঙা কাকা সবাই দাঁত বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, কাকারা সকলে দাঁত বাঁধায় কেন বল তো ? এর মানে কী ?

হাবুল সেন বললে, হঃ ! এইটা বোজোস্ নাই ? কাকা-গো কামই হইল দাঁত খিঁচানি। অত দাঁত খিঁচালে দাঁত খারাপ হইবো না তো কী ?

টেনিদা বসে বসে একমনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি চিবুচ্ছিল। টেনিদার ওই একটা অভ্যেস—কিছুতেই মুখ বন্ধ রাখতে পারে না। একটা কিছু-না-কিছু তার চিবোনো চাই-ই চাই। রসগোল্লা, কাটলেট, ডালমুট, পকৌড়ি, কাজু বাদাম—কোনোটায় অরুচি নেই। যখন কিছু জোটে না, তখন চুয়িং গাম থেকে শুকনো কাঠি—যা পায় তাই চিবোয়। একবার ট্রেনে যেতে মনের ভুলে পাশের ভদ্রলোকের লম্বা দাড়ির ডগাটা খানিক

চিবিয়ে দিয়েছিল—সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড! ভদ্রলোক রেগে গিয়ে টেনিদাকে ছাগল-টাগল কী সব যেন বলেছিলেন।

হঠাৎ কাঠি চিবুনো বন্ধ করে টেনিদা বললে, দাঁতের কথা কী হচ্ছিল র‍্যা? কী বলছিলি দাঁত নিয়ে?

আমি বললাম, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাবলা বললে, ঈস্—ভারি একটা খবর শোনাচ্ছেন ঢাক-ঢোল বাজিয়ে! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, ফুলু মাসি—

টেনিদা বাধা দিয়ে বললে, থাম্ থাম্, বেশি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিসনি। দাঁত বাঁধানোর কী জানিস তোরা? হুঁঃ! জানে বটে আমার কুট্টিমামা গজগোবিন্দ হালদার! সায়েবরা তাকে আদর করে ডাকে মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে। সে-ও দাঁত বাঁধিয়েছিল। কিন্তু সে দাঁত এখন আর তার মুখে নেই—আছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

—পড়ে গেছে বুঝি?

—পড়েই গেছে বটে!—টেনিদা তার খাঁড়ার মতো নাক-টাকে খাড়া করে একটা হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে হাই ক্লাস, তারপর বললে, সে-দাঁত কেড়ে নিয়ে গেছে।

—দাঁত কেড়ে নিয়েছে? সে আবার কী? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এত জিনিস থাকতে দাঁত কাড়তে যাবে কেন?

—কেন? টেনিদা আবার হাসল: দরকার থাকলেই কাড়ে। কে নিয়েছে বল্ দেখি?

ক্যাবলা অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, যার দাঁত নেই।

—ইঃ, কী পণ্ডিত! টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, দিলে বলে! অত সোজা নয়, বুঝলি? আমার কুট্টিমামার দাঁত যে-সে নয়—সে এক-একটা মুলোর মতো। সে বাঘা দাঁতকে বাগানো যার-তার কাজ নয়।

—তবে বাগাইল কেডা ? বাঘে ? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—এঁঃ, বাঘে ! বলছি দাঁড়া। ক্যাবলা, তার আগে দু-আনার ডালমুট নিয়ে আয়—

হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা ডালমুট আনতে গেল। মানে, যেতেই হল তাকে।

আমাদের জুলজুলে চোখের সামনে একাই ডালমুটের ঠোঙা সাবাড় করে টেনিদা বললে, আমার কুট্টিমামার কথা মনে আছে তো ? সেই যে চা-বাগানে চাকরি করে আর একাই দশজনের মতো খেয়ে সাবাড় করে ? আরে, সেই লোকটা—যে ভালুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছিল ?

আমরা সমস্বরে বললাম, বিলক্ষণ ! 'কুট্টিমামার হাতের কাজ' কি এত সহজেই ভোলবার ?

টেনিদা বললে, সেই কুট্টিমামারই গল্প। জানিস তো—সায়েবরা ডেকে নিয়ে মামাকে চা-বাগানে চাকরি দিয়েছিল ? মামা খাসা আছে সেখানে। খায়-দায় কাঁসি বাজায়। কিন্তু বেশি সুখ কি আর কপালে সয় রে ? একদিন জুত করে একটা বন-মুরগির রোস্টে যেই কামড় বসিয়েছে—অমনি ঝন্-ঝনাৎ ! কুট্টিমামার একটা দাঁত পড়ল প্লেটের ওপর খসে, আর তিনটে গেল নড়ে।

হয়েছিল কী, জানিস ? শিকার করে আনা হয়েছিল তো বন-মুরগি ? মাংসের মধ্যে ছিল গোটাকয়েক ছর্‌রা। বেকায়দা কামড় পড়তেই অ্যাকসিডেন্ট, দাঁতের বারোটা বেজে গেল।

মাংস রইল মাথায়—ঝাড়া তিন ঘণ্টা নাচানাচি করলে কুট্টি-মামা। কখনো কেঁদে বললে, পিসিমা গো তুমি কোথায় গেলে ? কখনো ককিয়ে ককিয়ে বললে, ইঁ-হি-হি—আমি গেলুম ! আবার

কখনো দাপিয়ে দাপিয়ে বললে, ওরে বন-মুরগি রে—তোর মনে এই ছিল রে! শেষকালে তুই আমায় এমন করে পথে বসিয়ে গেলি রে!

পাক্কা তিন দিন কুট্‌টিমামা কিচ্ছুটি চিবতে পারল না। শুধু রোজ সের-পাঁচেক করে খাঁটি দুধ আর ডজন-চারেক কমলা লেবুর রস খেয়ে কোনোমতে পিত্তিরক্ষা করতে লাগল।

দাঁতের ব্যথা-ট্যথা একটু কমলে সায়েবরা কুট্‌টিমামাকে বললে, তোমাকে ডেনটিস্টের ওখানে যেতে হবে!

—অ্যাঁ!

সায়েবরা বললে, দাঁত বাঁধিয়ে আসতে হবে।

ডেনটিস্টের নাম শুনেই তো কুট্‌টিমামার চোখে তালগাছে চড়ে গেল। কুট্‌টিমামার দাদু নাকি একবার দাঁত তুলতে গিয়েছিলেন। যে ডাক্তার দাঁত তুলছিলেন, তিনি চোখে কম দেখতেন। ডাক্তার করলেন কী—দাঁত ভেবে কুট্‌টিমামার দাদুর নাকে সাঁড়াশি আটকে দিয়ে সেটাকেই টানতে লাগলেন! আর বলতে লাগলেন: ইস্—কী প্রকাণ্ড গজদন্ত, আর কী ভীষণ শক্ত! কিছুতেই নাড়াতে পারছি না!

কুট্‌টিমামার দাদু তো হাঁই-মাই করে বলতে লাগলেন, ওঁটা—ওঁটা আঁমার আঁক! আঁক!—টানের চোটে নাক বেরুচ্ছিল না—আঁক।

ডাক্তার রেগে বললেন, আর হাঁক-ডাক করতে হবে না—খুব হয়েছে! আরো গোটা-কয়েক টান-ফান দিয়ে নাকটাকে যখন কিছুতেই কায়দা করতে পারলেন না—তখন বিরক্ত হয়ে বললেন: নাঃ, হল না! এমন বিচ্ছিরি শক্ত দাঁত আমি কখনো দেখিনি! এরকম দাঁত কোনো ভদ্রলোকে তুলতে পারে না।

কুট্‌টিমামার দাদু বাড়ি ফিরে এসে বারো দিন নাকের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে রইলেন। তেরো দিনের দিন উকিল ডাকিয়ে উইল করলেন ঃ 'আমার পুত্র বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে-কেহ দাঁত বাঁধাইতে যাইবে, তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিব।'

অবিশ্যি কুট্‌টিমামার দাদুর সম্পত্তিতে কুট্‌টিমামার কোনো রাইট নেই—তবু দাদুর আদেশ তো! কুট্‌টিমামা গাঁই-গুঁই করতে লাগলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে 'মাই নোজ'-টোজও বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো? ঝড়াং করে বলে দিলে, নো ফোক্‌লা দাঁত উইল ডু! দাঁত বাঁধাতেই হবে!

কুট্‌টিমামা তো মনে মনে 'তনয়ে তারো তারিণী' বলে রাম-প্রসাদী গান গাইতে গাইতে, বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ডেনটিস্টের কাছে হাজির। ডেনটিস্ট প্রথমেই তাঁকে একটা চেয়ারে বসালে। তারপর দাঁতের ওপরে খুর খুর করে একটা ইলেকট্রিক বুরুশ বসিয়ে সেগুলোকে অর্ধেক ক্ষয় করে দিলে। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাকি সবকটা দাঁতকে নড়িয়ে ফেললে। শেষে বেজায় খুশি হয়ে বললে, এর দু-পাটি দাঁতই খারাপ। সব তুলে ফেলতে হবে।

শুনেই কুট্‌টিমামা প্রায় অজ্ঞান! গোটা-তিনেক খাবি খেয়ে বললেন, নাকটাও?

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন, চোপরাও!

তারপর আর কী? একটা পেল্লায় সাঁড়াশি নিয়ে ডাক্তার কুরুৎ কুরুৎ করে কুট্‌টিমামার সব কটা দাঁত তুলে দিলে। কুট্‌টিমামা আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে কেঁদে ফেললেন। কিচ্ছুটি

নেই মুখের ভেতর—একদম গাঁয়ের পেছল রাস্তার মতো—মাঝে মাঝে গর্ত। ওঁকে ঠিক বাড়ির বুড়ি ধাই রামধনিয়ার মত দেখাচ্ছিল।

কুট্টিমামা কেঁদে ফ্যাক ফ্যাক করে বললেন, ওগো আমার কী হল গো—

ডাক্তার আবার ধমক দিয়ে বললে, চোপরাও! সাত দিন পরে এসো—বাঁধানো দাঁত পাবে।

বাঁধানো দাঁত নিয়ে কুট্টিমামা ফিরলেন। দেখতে শুনতে দাঁতগুলো নেহাত খারাপ নয়। খাওয়াও যায় একরকম। খালি একটা অসুবিধে হত। খাওয়ার অর্ধেক জিনিস জমে থাকত দাঁতের গোড়ায়। পরে আবার সেগুলোকে জাবর কাটতে হত।

তবু ওই দাঁত নিয়েই দুঃখে সুখে কুট্টিমামার দিন কাটছিল। কিন্তু সাহেবের কাণ্ড জানিস তো? ওদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কিছুতেই তিনটে দিন বসে থাকতে পারে না। একদিন বললে, মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, আমরা বাঘ শিকার করতে যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

বাঘ-টাঘের ব্যাপার কুট্টিমামার তেমন পছন্দ হয় না। কারণ বাঘ হরিণ নয়—তাকে খাওয়া যায় না, বরং সেই উলটে খেতে আসে। কুট্টিমামা খেতে ভালোবাসে, কিন্তু কুট্টি-মামাকেই কেউ খেতে ভালোবাসে—এ-কথা ভাবলে তাঁর মন ব্যাজার হয়ে যায়। বাঘগুলো যেন কী! গায়ে যেমন বিটকেল গন্ধ, স্বভাব চরিত্তিরও তেমনি যাচ্ছেতাই!

কুট্টিমামা কান চুলকে বললে, বাঘ স্যার—ভেরি ব্যাড স্যার—আই নট্ লাইক্ স্যার—

কিন্তু সায়েবরা সে কথা শুনলে তো! গোঁ যখন ধরেছে

তখন গেলই। আর কুট্‌টিমামাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে গেল।

গিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে এক ফরেস্ট বাংলোয় উঠল।

চারদিকে ধুন্ধুমার বন। দেখলেই পিত্তি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রাত্তিরে হাতির ডাক শোনা যায়—বাঘ হুম্‌-হাম্‌ করতে থাকে। গাছের ওপর থেকে টুপ-টুপ করে জোঁক পড়ে গায়ে। বানর এসে খামোকা ভেংচি কাটে। সকালে কুট্‌টিমামা দাড়ি কামাচ্ছিলেন—একটা বানর এসে 'ইলিক্‌ চিলিক্‌' এইসব বলে তাঁর বুরুশটা নিয়ে গেল। আর সে কী মশা! দিন নেই—রাত্তির নেই—সমানে কামড়াচ্ছে। কামড়ানোও যাকে বলে! দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই হাতে পায়ে মুখে যেন চাষ করে ফেললে।

তার মধ্যে আবার সায়েবগুলো মোটর গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল বাঘ মারতে।

—মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, তুমিও চলো।

কুট্‌টিমামা তক্ষুনি বিছানায় শুয়ে হাত পা ছুড়তে আরম্ভ করে দিলে। চোখদুটোকে আলুর মতো বড় বড় করে, মুখে গ্যাঁজলা তুলে বলতে লাগলঃ বেলি পেইন স্যার—পেটে ব্যথা স্যার—অবস্থা সিরিয়াস্‌ স্যার—

দেখে সায়েবরা ঘোঁয়া-ঘোঁয়া—ঘ্যাঁয়োৎ-ঘ্যাঁয়োৎ করে বেশ খানিকটা হাসল।—ইউ গাঁজা-গাবিণ্ডে, ভেরি নটি—বলে একজন কুট্‌টিমামার পেটে একটা চিমটি কাটলে—তারপর বন্দুক কাঁধে ফেলে শিকারে চলে গেল।

আর যেই সায়েবরা চলে যাওয়া—অমনি তড়াক করে উঠে বসলেন কুট্‌টিমামা। তক্ষুনি এক ডজন কলা, দুটো পাঁউরুটি

আর এক শিশি পেয়ারার জেলি খেয়ে শরীর টরীর ভালো করে ফেললেন।

বাংলোর পাশেই একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা। সেখানে একটা শিমুল গাছ। কুট্‌টিমামা একখানা পেল্লায় কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে সেখানে এসে বসলেন।

চারদিকে পাখি-টাখি ডাকছিল। পেটটা ভরা ছিল, মিঠে মিঠে হাওয়া দিচ্ছিল—কুট্‌টিমামা খুশি হয়ে মহাভারতের সেই জায়গাটা পড়তে আরম্ভ করলেন—যেখানে ভীম বকরাক্ষসের খাবার-দাবারগুলো সব খেয়ে নিচ্ছে।

পড়তে পড়তে ভাবের আবেগে কুট্‌টিমামার চোখে জল এসেছে, এমন সময়ঃ গর্ র্—গর্ র্—

কুট্‌টিমামা চোখ তুলে তাকাতেইঃ

কী সর্বনাশ! ঝর্ণার ওপারে বাঘ!

কী রূপ বাছার! দেখলেই পিলে-টিলে উল্‌টে যায়। হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা, আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, হল্‌দের ওপরে কালো কালো ডোরা, অজগরের মতো বিশাল ল্যাজ। মস্ত হাঁ করে, মুলোর মতো দাঁত বের করে আবার বললে, গর্—র্—র্!

একেই বলে বরাত! যে-বাঘের ভয়ে কুট্‌টিমামা শিকারে গেলেন না, সে-বাঘ নিজে থেকেই দোরগোড়ায় হাজির। আর কেউ বলে তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যেত, আর বাঘ তাকে সারিডন ট্যাবেলেটের মতো টপাং করে গিলে ফেলত। কিন্তু আমারই মামা তো—ভাঙেন তবু মচকান না। তক্ষুনি মহাভারত বগলদাবা করে এক লাফে একেবারে শিমুল গাছের মগডালে।

বাঘ এসে গাছের নিচে থাবা পেতে বসল। দু-চারবার থাবা দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁচড়ায়, আর ওপর দিকে তাকিয়ে

ডাকে : ঘঁর্—র, ঘুঁ—ঘুঁ ! বোধহয় বলতে চায়—তুমি তো দেখছি পয়লা নম্বরের ঘুঘু !

কিন্তু বাঘটা তখনো ঘুঘুই দেখেছে—ফাঁদ দেখেনি। দেখল একটু পরেই। কিছুক্ষণ পরে বাঘটা রেগে যেই ঘ্যাঁক করে একটা হাঁক দিয়েছে—অমনি দারুণ চম্‌কে উঠেছেন কুট্‌টিমামা, আর বগল থেকে কালীসিঙ্গির সেই জগঝম্প মহাভারত ধপাস্‌ করে নিচে পড়েছে। আর পড়বি তো পড় সোজা বাঘের মুখে। সেই মহাভারতের ওজন কম্‌সে কম পাক্কা বারো সের—তার ঘায়ে মানুষ খুন হয়—বাঘও তার ঘা খেয়ে উল্‌টে পড়ে গেল। তারপর গোঁ—গোঁ—ঘেয়াং—ঘেয়াং বলে বার-কয়েক ডেকেই—এক লাফে ঝর্ণা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাওয়া।

কুট্‌টিমামা আরো আধ ঘণ্টা গাছের ডালে বসে ঠক-ঠক করে কাঁপলেন। তারপর নিচে নেমে দেখলেন মহাভারত ঠিক তেমনি পড়ে আছে—তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। আর তার চারপাশে ছড়ানো আছে কেবল দাঁত—বাঘের দাঁত। একেবারে গোনা-গুন্‌তি বত্রিশটা দাঁত—মহাভারতের ঘায়ে একটি দাঁতও আর বাঘের থাকেনি। দাঁতগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, মহাভারতকে মাথায় ঠেকিয়ে, কুট্‌টিমামা এক দৌড়ে বাংলোতে। তারপর সায়েবরা ফিরে আসতেই কুট্‌টিমামা সেগুলো তাদের দেখিয়ে বললে, টাইগার টুথ !

ব্যাপার দেখে সায়েবরা তো থ !

তাই তো—বাঘের দাঁতই তো বটে ! পেলে কোথায় ?

কুট্‌টিমামা ডাঁট দেখিয়ে বুক চিতিয়ে বললে, আই গো টু ঝর্ণা। টাইগার কাম্‌। আই ডু বক্‌সিং—মানে ঘুসি মারলাম। অল্‌ টুথ ব্রেক। টাইগার কাট ডাউন মানে বাঘ কেটে পড়ল।

সায়েবরা বিশ্বাস করল কি না কে জানে, কিন্তু কুট্টিমামার ভীষণ খাতির বেড়ে গেল। রিয়্যালি, গাঁজা-গাবিণ্ডে ইজ এ হিরো! দেখতে কাঁকলাসের মতো হলে কী হয়—হি ইজ এ গ্রেট হিরো! সেদিন খাওয়ার টেবিলে একখানা আস্ত হরিণের ঠ্যাং মেরে দিলেন কুট্টিমামা।

পরদিন আবার সায়েবরা শিকারে যাওয়ার সময় ওঁকে ধরে টানাটানি: আজ তোমাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে। ইউ আর এ বিগ পালোয়ান!

মহা ফ্যাসাদ! শেষকালে কুট্টিমামা অনেক করে বোঝালেন, বাঘের সঙ্গে বক্সিং করে ওঁর গায়ে খুব ব্যথা হয়েছে। আজকের দিনটাও থাক।

সায়েবরা শুনে ভেবেচিন্তে বললে, অল্ রাইট—অল্ রাইট।

আজকে কুট্টিমামা হুঁসিয়ার হয়ে গেছেন—বাংলোর বাইরে আর বেরুলেনই না। বাংলোর বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে আবার সেই কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে বসলেন।

—ঘেঁয়াও—ঘুঙ্—

কুট্টিমামা আঁতকে উঠলেন। বাংলোর সামনে তারের বেড়া—তার ওপারে সেই বাঘ। কেমন যেন জোড়হাত করে বসেছে। কুট্টিমামার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বললে, ঘেঁয়াং—কুঁই!

আর হাঁ করে মুখটা দেখালো।

ঠিক সেইরকম। দাঁতগুলো তোলবার পরে কুট্টিমামার মুখের যে চেহারা হয়েছিল, অবিকল তা-ই। একেবারে পরিষ্কার —একটা দাঁত নেই। নির্ঘাৎ রামধনিয়ার মুখ!

বাঘটা হুবহু কান্নার সুরে বললে, ঘ্যাং—ঘ্যাং—ভ্যাঁও!

ভাবটা এই ঃ দাঁতগুলো তো সব গেল দাদা ! আমার খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ। এখন কী করি ?

কিন্তু তার আগেই এক লাফে কুট্‌টিমামা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছেন। বাঘটা আরো কিছুক্ষণ ঘ্যাঁং-ঘ্যাঁং—ভ্যাঁও ভ্যাঁও করে কেঁদে বনের মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে কুট্‌টিমামা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বাঁধানো দাঁতের পাটিদুটো খুলে নিয়ে বেশ করে মাজছিলেন। দিব্যি সকালের রোদ উঠেছে—সায়েবগুলো ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুচ্ছে তখনো, আর কুট্‌টিমামা দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ফ্যাক-ফ্যাকে গলায় গান গাইছিলেন ঃ 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সে-ও ভালো—'

সকালবেলায় চাঁদের আলোয় গান গাইতে গাইতে কুট্‌টি-মামার বোধহয় আর কোনদিকে খেয়ালই ছিল না। ওদিকে সেই ফোকলা বাঘ এসে জানলার বাইরে বসে রয়েছে ঝোপের ভেতরে। কুট্‌টিমামার দাঁত খোলা—বুরুশ দিয়ে মাজা—সব দেখেছে এক মনে। মাজা-টাজা শেষ করে যেই কুট্‌টিমামা দাঁত দু-পাটি মুখে পুরতে যাবেন—অমনি ঃ ঘোঁয়াৎ, ঘালুম !

অর্থাৎ, তোফা—এই তো পেলুম !

জানলা দিয়ে এক লাফে বাঘ ঘরের মধ্যে।

—টা—টাইগার—পর্যন্ত বলেই কুট্‌টিমামা ফ্ল্যাট।

বাঘ কিন্তু কিছুই করলে না। টপাৎ করে কুট্‌টিমামার দাঁত দু-পাটি নিজের মুখে পুরে নিলে—কুট্‌টিমামা তখনও অজ্ঞান হননি—জুলজুল করে দেখতে লাগলেন, সেই দাঁত বাঘের মুখে বেশ ফিট করেছে। দাঁত পরে বাঘ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বাঘা হাসি হাসল, তারপর টপ্

করে টেবিল থেকে টুথব্রাশ আর টুথপেস্টের টিউব মুখে তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে আবার—

কুট্টিমামার ভাষায়—একেবারে উইণ্ড ! মানে, হাওয়া হয়ে গেল।

টেনিদা থামল। আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্বিতভাবে বললে, তাই বলছিলুম, দাঁত বাঁধানোর গল্প আমার কাছে করিস নি ! হুঁ !

চামচিকে আর টিকিট চেকার

—বুঝলি প্যালা, চামচিকে ভীষণ ডেঞ্জারাস!···একটা ফুটো শালপাতায় করে পটলডাঙার টেনিদা ঘুগনি খাচ্ছিল। শালপাতার তলা দিয়ে হাতে খানিক ঘুগনির রস পড়েছিল, চট্ করে সেটা চেটে নিয়ে পাতাটা তালগোল পাকিয়ে ছুড়ে দিলে ক্যাবলার নাকের ওপর। তারপর আবার বললে, হুঁ-হুঁ, ভীষণ ডেঞ্জারাস চামচিকে!

—কী কইর‍্যা' বোঝলা—কও দেখি?—বিশুদ্ধ ঢাকাই ভাষায় জানতে চাইল হাবুল সেন।

—আচ্ছা, বল্ চামচিকের ইংরেজি কী?

আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

—বল্ না!

শেষকালে ভেবে-চিন্তে ক্যাবলা বললে, স্মল ব্যাট। মানে ছোট বাদুড়।

—তোর মুণ্ডু!

আমি বললাম, তবে ব্যাট্‌লেট্। তাও নয়? তাহলে ব্যাট্‌স্ সান? মানে, বাদুড়ের ছেলে? হল না? আচ্ছা, ব্রিক-ব্যাট্ কাকে বলে?

টেনিদা বললে, থাম্ উল্লুক! ব্রিক-ব্যাট হল থান ইট! এবার তা-ই একটা তোর মাথায় ভাঙব!

হাবুল সেন গম্ভীর মুখে বললে, হইছে!

—কী হল?

—স্কিন মোল।

—স্কিন মোল !···টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে মনুমেণ্টের মতো উঁচু করে ধরল ঃ সে আবার কী ?

—স্কিন মানে হইল চাম—অর্থাৎ কিনা চামড়া। আমাগো দ্যাশে ছুঁচারে কয় চিকা—মোল। দুইটা মিলাইয়া স্কিন মোল।

টেনিদা ক্ষেপে গেল ঃ দ্যাখ হাবুল, ইয়ার্কির একটা মাত্রা আছে, বুঝলি ? স্কিন মোল ! ইঃ—গবেষণার দৌড়টা দেখ একবার !

আমি বললাম, চামচিকের ইংরেজি কী তা নিয়ে আমাদের জ্বালাচ্ছ কেন ? ডিক্সনারি দ্যাখো গে।

—ডিক্সনারিতেও নেই।—টেনিদা জয়ের হাসি হাসল।

—তাহলে ?

—তাহলে এইটাই প্রমাণ হল, চামচিকে কী ভীষণ জিনিস ! অর্থাৎ এমন ভয়ানক, যে চামচিকেকে সাহেবরাও ভয় পায় ! মনে কর্ না—যারা আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে সিংহ আর গরিলা মারে, যারা যুদ্ধে গিয়ে দমাদম বোমা আর কামান ছোড়ে, তারা-শুদ্ধ চামচিকের নাম করতে ভয় পায়। আমি নিজের চোখেই সেই ভীষণ ব্যাপারটা দেখেছি।

—কী ভীষণ ব্যাপার ?—গল্পের গন্ধে আমরা তিনজনে টেনিদাকে চেপে ধরলাম ঃ বলো এক্ষুনি !

—ক্যাবলা, তাহলে চটপট যা। গলির মোড় থেকে আরো দু-আনার পাঁটার ঘুগনি নিয়ে আয়। রসদ না হলে গল্প জমবে না।

ব্যাজার মুখে ক্যাবলা ঘুগনি আনতে গেল।

দু-আনার ঘুগনি একাই সবটা চেটে-পুটে খেয়ে, মানে আমাদের একফোঁটাও ভাগ না দিয়ে, টেনিদা শুরু করলে ঃ তবে শোন্—

সেবার পাটনায় গেছি ছোটমামার ওখানে বেড়াতে। ছোট-মামা রেলে চাকরি করে—আসার সময় আমাকে বিনা টিকিটেই তুলে দিলে দিল্লী এক্সপ্রেসে। বললেঃ গাড়িতে চ্যাটার্জি যাচ্ছে ইন্‌চার্জ—আমার বন্ধু। কোন ভাবনা নেই—সেই-ই তোকে হাওড়া স্টেশনের গেট পর্যন্ত পার করে দেবে।

নিশ্চিন্ত মনে আমি একটা ফাঁকা সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় চড়ে লম্বা হয়ে পড়লাম।

শীতের রাত। তার ওপর পশ্চিমের ঠাণ্ডা—হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরায়।

কিন্তু কে জানত—সেদিন হঠাৎ মাঝপথেই চ্যাটার্জির ডিউটি বদলে যাবে! আর তার জায়গায় আসবে—কী নাম ওর—মিস্টার রাইনোসেরাস!

ক্যাবলা বললে, রাইনোসেরাস মানে গণ্ডার।

—থাম্‌, বেশি বিদ্যে ফলাসনি!···টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, যেন ডিক্সনারি একেবারে! সায়েবের বাপ-মা যদি ছেলের নাম গণ্ডার রাখে—তাতে তোর কী র‍্যা? তোর নাম যে কিশলয়কুমার না হয়ে ক্যাবলা হয়েছে, তাতে কার কী ক্ষেতি হয়েছে শুনি?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। পোলাপান!

—হুঁঃ, পোলাপান! আবার যদি বকবক করে তো জলপান করে ছাড়ব! যাক—শোন্‌। আমি তো বেশ করে গাড়ির দরজা এঁটে শুয়ে পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। একে দু-খানা কম্বলে শীত কাটছে না, তার ওপরে আবার খাওয়াটাও হয়ে গেছে বড্ড বেশি। মামাবাড়ির কালিয়ার পাঁটাটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে গাড়ির তালে তালে পেটের ভেতরে শিং দিয়ে ঢুঁ মারছে! লোভে পড়ে অতটা না খেয়ে ফেললেই চলত।

পেট গরম হয়ে গেলেই লোকে নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে—জানিস তো ? আমিও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, আমার পেটের ভেতরে সেই যে বাতাপী না ইল্বল কে একটা ছিল—সেইটে পাঁটা হয়ে ঢুকেছে। একটা রাক্ষস এসে হিন্দি করে বলছে ঃ এ ইল্বল—আভি ইস্‌কো পেট ফাটাকে জল্‌দি নিকাল আও—

—বাপরে—বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। চোখ চেয়ে দেখি গাড়ির ভেতরে বাতাপী ইল্বল কেউ নেই—শুধু ফর্‌-ফর্‌ করে একটা চামচিকে উড়ছে। একবার বোঁ করে আমার মুখের সামনে দিয়েই উড়ে গেল—নাকটাই খিমচে ধরে আর কি !

এ তো আচ্ছা উৎপাত !

কোন্ দিক দিয়ে এল কে জানে ? চারদিকে তো দরজা-জানলা সবই বন্ধ। তবে, চামচিকের পক্ষে সবই সম্ভব। মানে অসাধ্য কিছু নেই।

একবার ভাবলাম, উঠে ওটাকে তাড়াই। কিন্তু যা শীত—কম্বল ছেড়ে নড়ে কার সাধ্যি ! তা ছাড়া উঠতে গেলে পেট ফুঁড়ে শিং টিং শুদ্ধ পাঁঠাটাই বেরিয়ে আসবে হয়ত বা। তারপর আবার যখন শাঁ করে নাকের কাছে এল, তখন বসে পড়ে আর কি ! আমার খাড়া নাকটা দেখে মনুমেণ্টের ডগাই ভাবল বোধ-হয়।

আমি বিচ্ছিরি মুখ করে বললাম, ফর্‌-র্‌ ! ফুস্‌ !—মানে চাম-চিকেটিকে ভয় দেখালাম। তাইতেই আঁৎকে গেল কি না কে জানে—শাঁ করে গিয়ে ঝুলে রইল একটা কোট-হ্যাঙ্গারের সঙ্গে। ঠিক মনে হল ছোট একটা কালো পুঁটলি ঝুলছে।

ঠিক অমনি সময় ঘটাঘট শব্দে কামরার দরজা নড়ে উঠল।

এত রাত্তিরে কে আবার জ্বালাতে এল ? নিশ্চয় কোন

প্যাসেঞ্জার! প্রথমটায় ভাবলাম, পড়ে থাকি ঘাপ্‌টি মেরে। যতক্ষণ খুশি ঘট্‌ঘটিয়ে কেটে পড়ুক লোকটা। আমি কম্বলের ভেতর মুখ ঢোকালাম।

কিন্তু কী একটা যাচ্ছেতাই স্টেশনে যে গাড়ি থেমেছে কে জানে! সেই যে দাঁড়িয়ে আছে—একদম নট নড়ন-চড়ন! যেন নেমন্তন্ন খেতে বসেছে! এদিকে দরজায় ঘট্‌ঘটানি সমানে চলতে লাগল। ভেঙে ফেলে আর কি!

এমন বেআক্কেলে লোক তো কখনো দেখিনি! ট্রেনে কি আর কামরা নেই যে এখানে এসে মাথা খুঁড়ে মরছে! ভারি রাগ হল। দরজা না খুলেও উপায় নেই—রিজার্ভ গাড়ি তো নয় আর! খুব কড়া গলায় হিন্দীতে একটা গালাগাল দেব মনে করে উঠে পড়লাম।

ক্যাবলা হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে, তুমি মোটেই হিন্দী জানো না টেনিদা।

—মানে?

—তুমি যা বলো তা একেবারেই হিন্দী হয় না। আমি ছেলেবেলা থেকে পশ্চিমে ছিলাম—

—চুপ কর্‌ বলছি ক্যাব্‌লা!—টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল: ফের যদি ভুল ধরতে এসেছিস তো এক চাঁটিতে তোকে চাপাটি বানিয়ে ফেলব! আমার হিন্দী শুনে বাড়ির ঠাকুর পর্যন্ত ছাপ্‌রায় পালিয়ে গেল তা জানিস?

হাবুল বললে, ছাইড়া দাও—চ্যাংড়ার কথা কি ধরতে আছে?

—চ্যাংড়া? চিংড়ি মাছের মতো ভেজে খেয়ে ফেলব!

আমি বললাম, ওটা অখাদ্য জীব—খেলে পেট কামড়াবে, হজম করতে পারবে না। তার চেয়ে গল্পটা বলে যাও।

—হুঁ, শোন্‌!—টেনিদা ক্যাবলার ছ্যাবলামি দমন করে আবার বলে চলল :

উঠে দরজা খুলে যেই বলতে গেছি : এই, আপ কেইসা আদমি হ্যায়—সঙ্গে সঙ্গে গাঁক্‌-গাঁক্‌ করে আওয়াজ।

—গাঁক্‌-গাঁক্‌?

—মানে, সাহেব! মানে, টিকিট-চেকার!

—সেই রাইনোসেরাস?—বকুনি খেয়েও ক্যাবলা সামলাতে পারল না।

—আবার কে? একদম খাঁটি সাহেব—পা থেকে মাথা ইস্তক। সেই যে একরকম সাহেব আছে না? গায়ের রঙ মোষের মতো কালো, ঘামলে গা দিয়ে কালি বেরোয়—যাদের দেখলে সায়েবের ওপরে ঘেন্না ধরে যায়—মোটেই সে রকমটি নয়। চুনকাম করা ফর্সা রঙ—হাঁড়ির মতো মুখ, মোটা নাকের ছ্যাঁদায় বড় বড় লালচে লোম—হাসলে মুখ-ভর্তি মুলো দেখা যায়, আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় ষাঁড় ডাকছে—একেবারে সেই জিনিসটি!

ঢুকেই চোস্ত ইংরেজিতে আমাকে বললে, এই সন্ধেবেলাতেই এমন করে ঘুমুচ্ছ কেন? এইটেই সবচেয়ে বিচ্ছিরি হ্যাবিট!

—কী রকম চোস্ত ইংরেজি টেনিদা?—আমি জানতে চাইলাম।

—সে সব শুনে কী করবি?···টেনিদা উঁচুদরের হাসি হাসল : শুনেও কিছু বুঝতে পারবি না—সায়েবের ইংরেজি কিনা! সে যাক। সায়েবের কথা শুনে আমার তো চোখ কপালে উঠল। রাত বারোটাকে বলছে সন্ধেবেলা! তাহলে ওদের রাত্তির হয় কখন? সকালে নাকি?

তারপরেই সায়েব বললে, তোমার টিকিট কই ?

আমার তো তৈরি জবাব ছিলই। বললাম, আমি পাটনার বাঁড়ুজ্জে মশাইয়ের ভাগনে। আমার কথা ক্রু-ইন-চার্জ চাটুজ্জেকে বলা আছে।

তাই শুনে সায়েবটা এমনি দাঁত খিচোলো যে, মনে হল মুলোর দোকান খুলে বসেছে। নাকের লোমের ভেতরে যেন ঝড় উঠল, আর বেরিয়ে এল খানিকটা গর্‌গরে আওয়াজ।

যা বললে, শুনে তো আমার চোখ চড়কগাছ !

—তোমার বাঁড়ুজ্জেমামাকে আমি থোড়াই পরোয়া করি ! এসব ডাব্‌লুটিরা ওরকম ঢের মামা পাতায় ! তা ছাড়া চাটুজ্জের ডিউটি বদল হয়ে গেছে—আমিই এই ট্রেনের ক্রু-ইনচার্জ। অতএব চালাকি রেখে পাটনা টু হাওড়া সেকেণ্ড ক্লাস ফেয়ার, আর বাড়তি জরিমানা বের করো !

পকেটে সবশুদ্ধ পাঁচটা টাকা আছে—সেকেণ্ড ক্লাস দূরে থাক, থার্ড ক্লাসের ভাড়াও হয় না। সর্ষের ফুল এর আগে দেখিনি—এবার দেখতে পেলাম। আর আমার গা দিয়ে সেই শীতেও দরদর করে সর্ষের তেল পড়তে লাগল।

আমি বলতে গেলাম, দ্যাখো সাহেব—

—সায়েব সায়েব বোলো না। আমার নাম মিস্টার রাইনো-সেরাস। আমার গণ্ডারের মতো গোঁ ! ভাড়া যদি না দাও—হাওড়ায় নেমে তোমায় পুলিশে দেব। ততক্ষণ আমি গাড়িতে চাবিবন্ধ করে রেখে যাচ্ছি।

কি বলব জানিস প্যালা—আমি পটলডাঙার টেনিরাম—অমন ঢের সায়েব দেখেছি। ইচ্ছে করলেই সায়েবকে ধরে চলতি গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা বোষ্টম—

জীবহিংসা করতে নেই, তাই অনেক কষ্টে রাগটা সামলে নিলাম।

হাবুল সেন বলে বসল : জীবহিংসা কর না, তবে পাঁঠা খাও ক্যান ?

—আরে পাঁটার কথা আলাদা। ওরা হল অবোলা জীব, বামুনের পেটে গেলে স্বর্গে যায়। পাঁটা খাওয়া মানেই জীবে দয়া করা। সে যাক। কিন্তু সাহেবকে নিয়ে এখন আমি করি কী ! এ তো আচ্ছা প্যাঁচ করে বসেছে ! শেষকালে সত্যিই জেলে যেতে না হয় !

কিন্তু ভগবান ভরসা !

পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করে সায়েব কী যেন লিখতে যাচ্ছিল পেনসিল দিয়ে, হঠাৎ সেই শব্দ—ফর্—ফর্ ফরাৎ !

চামচিকেটা আবার উড়তে শুরু করেছে। আমার মতোই তো বিনা টিকিটের যাত্রী—চেকার দেখে ভয় পেয়েছে নিশ্চয়। আর সঙ্গে-সঙ্গেই সায়েব ভয়ানক চমকে উঠল। বললে, কী পাখি ?

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম—চামচিকে—কিন্তু তার আগেই সায়েব হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল। নাকের দিকে চামচিকের এত নজর কেন কে জানে—ঠিক সায়েবের নাকেই একটা ঝাপটা মেরে চলে গেল।

—ওটা কী পাখি ? কী বদখৎ দেখতে !—সায়েব কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। চুনকাম-করা মুখটা তার ভয়ে পানসে হয়ে গেছে।

আমি বুঝলাম, এই মওকা ! বললাম, তুমি কি ও পাখি কখনো দ্যাখোনি ?

—নো, নেভার ! আমি মাত্র দু-মাস আগে আফ্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ায় এসেছি। সিংহ দেখেছি—গণ্ডার দেখেছি—কিন্তু—

সায়েব শেষ করতে পারল না।

চামচিকেটা আর একবার পাক খেয়ে গেল। একটু হলেই প্রায় খিমচে ধরেছিল সায়েবের মুখ। বোধহয় ভেবেছিল ওটা চালকুমড়ো।

সায়েব বললে, মিস্টার—ও কি কামড়ায় ?

আমি বললাম, মোক্ষম ! ভীষণ বিষাক্ত ! এক কামড়েই লোক মারা যায় ! এক মিনিটের মধ্যেই !

—হোয়াট !—বলে সায়েব লাফিয়ে উঠল। তারপরে আমার কম্বল ধরে টানাটানি করতে লাগল ঃ—মিস্টার, প্লীজ—ফর গডস্ সেক—আমাকে একটা কম্বল দাও !

—তারপর আমি ওর কামড়ে মারা যাই আর কি ! ও সব চলবে না।—আমি শক্ত করে কম্বল চেপে রইলাম।

—অ্যাঁ ! তাহলে !—বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল সায়েব। বোঁ করে একেবারে চেন ধরে ঝুলে পড়ল প্রাণপণে। তারপর জানলা খুলে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল ঃ হেল্প্—হেল্প্—আর খোলা জানলা পেয়েই সায়েবের কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চামচিকে ভ্যানিশ।

সায়েব খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। একটু দম নিয়ে মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক—স্যাম্সিকেটা বাইরে চলে গেছে ! এখন আর ভয় নেই—কী বলো ?

আমি বললাম, না, তা নেই। তবে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেবার জন্যে তৈরি থাকো।

সায়েবের মুখ হাঁ হয়ে গেল।—কেন ?

—বিনা কারণে চেন টেনেছ, গাড়ি থামল বলে। আর শোন সায়েব—চামচিকে খুব লক্ষ্মী পাখি। কাউকে কামড়ায় না—কাউকে কিছু বলে না। তুমি রেলের কর্মচারী হয়ে চামচিকে দেখে চেন টেনেছ—এজন্যে তোমার শুধু ফাইন নয়—চাকরিও যেতে পারে।

ওদিকে গাড়ি আস্তে আস্তে থেমে আসছে তখন। মিস্টার রাইনোসেরাস কেমন মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ভয়ে এখন প্রায় মিস্টার হেয়ার—মানে খরগোস হয়ে গেছে।

তারপরই আমার ডান হাত চেপে ধরল দু-হাতেঃ

—শোন মিস্টার, আজ থেকে তুমি আমার বুজম ফ্রেণ্ড! মানে প্রাণের বন্ধু! তোমাকে আমি ফার্স্ট ক্লাস সেলুনে নিয়ে যাচ্ছি—দেখবে তোফা ঘুম হবে। হাওড়ায় নিয়ে গিয়ে কেলনারের ওখানে তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দেব। শুধু গার্ড এলে বলতে হবে, গাড়িতে একটা গুণ্ডা পিস্তল নিয়ে ঢুকেছিল, তাই আমরা চেন টেনেছি। বল—রাজি?

রাজি না হয়ে আর কী করি! এত কষ্ট করে অনুরোধ করছে যখন!

বিজয়গর্বে হাসল টেনিদাঃ যা ক্যাবলা—আরো চার পয়সার পাঁটার ঘুগনি নিয়ে আয়—

চাউস

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললে, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফি-স্টোকিলিস ইয়াক্ ইয়াক্ !

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তার মানে কী ?

টেনিদা টক-টক করে আমার মাথার ওপর দুটো টোকা মারল। বললে, তোর মগজ-ভর্তি খালি শুকনো ঘুঁটে—তুই এ-সব বুঝবিনি। এ হচ্ছে ফরাসী ভাষা।

আমার ভারি অপমান বোধ হল।

—ফরাসী ভাষা ? চালিয়াতির জায়গা পাওনি ? তুমি ফরাসী ভাষা কী করে জানলে ?

টেনিদা বললে, আমি সব জানি।

—বটে ?—আমি চটে বললুম, আমিও তাহলে জার্মান ভাষা জানি।

—জার্মান ভাষা ?—টেনিদা নাক কুঁচকে বললে, বল্ তো ?

আমি তক্ষুনি বললুম, হিটলার—নাৎসী—বার্লিন—কটাকট্ !

হাবুল সেন বসে বসে বেলের আটা দিয়ে একমনে একটা ছেঁড়া ঘুড়িতে পট্টি লাগাচ্ছিল। এইবারে মুখ তুলে ঢাকাই ভাষায় বললে, হঃ, কী জার্মান ভাষাডাই কইলি রে প্যালা ! খবরের কাগজের কতগুলিন্ নাম—তার লগে একটা 'কটাকট্' জুইড়্যা দিয়া খুব ওস্তাদি কোরতে আছস্ ! আমি একটা ভাষা কমু ? ক দেখি—'মেকুরে হুড়ুম খাইয়া হক্কৈড় করছে'—এইডার মানে কী ?

টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে আবার কী রে! ম্যাডাগাস্কারের ভাষা বলছিস বুঝি ?

—ম্যাডাগাস্কার না হাতি!—বিজয়গর্বে হেসে হাবুল বললে, মেকুর কিনা বিড়াল, হুড়ুম খাইয়া কি না মুড়ি খাইয়া—হক্কৈড় করছে—মানে এঁটো করেছে।

হেরে গিয়ে টেনিদা ভীষণ বিরক্ত হল।

—রাখ্ বাপু তোর হুড়ুম দুড়ুম্—শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়! এর চাইতে প্যালার জার্মান 'কটাকট্'ও ঢের ভালো!

বলতে বলতে ক্যাবলা এসে হাজির। চোখ প্রায় আদ্ধেকটা বুজে খুব মন দিয়ে কি যেন চিবুচ্ছে। দেখেই টেনিদার চোখদুটো জুল-জুল করে উঠল।

—অ্যাই, খাচ্ছিস কী রে ?

আরো দরদ দিয়ে চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা বললে, চুয়িং গাম।

—চুয়িং গাম!—টেনিদা মুখ বিচ্ছিরি করে বললে, দুনিয়ায় এত খাবার জিনিস থাকতে শেষে রবার চিবুচ্ছিস বসে বসে! এর পরে জুতোর সুখতলা খাবি এই তোকে বলে দিলুম। ছ্যাঃ!

আমি বললুম, চুয়িং গাম থাক। কাল যে বিশ্বকর্মা পুজো —সেটা খেয়াল নেই বুঝি ?

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে না কেন ? সেইজন্যেই তো বলছিলুম, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

ক্যাবলা পট করে বললে, মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।

—শয়তান!—চটে গিয়ে টেনিদা বললে, থাম থাম, বেশি পণ্ডিতি করিসনি! সব সময় এই ক্যাবলাটা মাস্টারি করতে আসে! কাল যখন মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্ করে আকাশে উড়বে—তখন টের পাবি।

—তার মানে ?—আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম।

—মানে ? মানে জানবি পরে—টেনিদা বললে, এখন বল দিকি, কাল বিশ্বকর্মা পুজোর কী রকম আয়োজন হল তোদের ?

আমি বললুম, আমি দু-ডজন ঘুড়ি কিনেছি।

হাবুল সেন বললে, আমি তিন ডজন।

ক্যাবলা চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে বললে, আমি একটাও কিনিনি। তোদের ঘুড়িগুলো কাটা গেলে আমি সেইগুলো ধরে ওড়াব।

টেনিদা মিট্‌মিট্‌ করে হেসে বললে, হয়েছে, বোঝা গেছে তোদের দৌড়! আর আমি কী ওড়াব জানিস ? আমি—এই টেনি শর্মা ?—টেনিদা খাড়া নাকটাকে খাঁড়ার মতো উঁচু করে নিজের বুকে দুটো টোকা মেরে বললে, আমি যা ওড়াব—তা আকাশে বোঁ-বোঁ করে উড়বে, গোঁ গোঁ করে এরোপ্লেনের মতো ডাক ছাড়বে—হুঁ-হুঁ! ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

বাকিটা ক্যাবলা আর বলতে দিলে না। ফস্‌ করে বলে বসল : ঢাউস ঘুড়ি বানিয়েছ বুঝি ?

—বানিয়েছ বুঝি ?—টেনিদা রেগে ভেংচে বললে, তুই আগে থেকে বলে দিলি কেন ? তোকে আমি বলতে বারণ করিনি ?

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি আমাকে ঢাউস ঘুড়ির কথা বললেই বা কখন, বারণই বা করলে কবে ? আমি তো নিজেই ভেবে বললুম।

—কেন ভাবলি ?—টেনিদা রকে একটা কিল মেরেই উঃ উঃ করে উঠল : বলি, আগ বাড়িয়ে তোকে এ-সব ভাবতে বলেছে কে র‍্যা ? প্যালা ভাবেনি, হাবলা ভাবেনি—তুই কেন ভাবতে গেলি ?

হাবুল সেন বললে, হ, ওইটাই ক্যাবলার দোষ ! এত ভাইব্যা-ভাইব্যা শ্যাষে একদিন ও কবি হইবো।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হুঁ, কবি হওয়া খুব খারাপ ! আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা একবার কবি হয়েছিল। দিনরাত কবিতা লিখত। একদিন রামধন ধোপার খাতায় কবিতা করে লিখল ঃ

পাঁচখানা ধুতি, সাতখানা শাড়ি
এ-সব হিসাবে হইবে কিবা ?
এ জগতে জীব কত ব্যথা পায়
তাই ভাবি আমি রাত্রি দিবা।
রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা
মনটি তাহার বড়ই সাদা—
সে-বেচারা তার পিঠেতে চাপায়ে
কত শাড়ি ধুতি প্যাণ্ট লইয়া যায়—
মনোছুখে খালি বোঝা টেনে ফেরে গাধা
একখানা ধুতি-প্যাণ্ট পরিতে না পায় !

টেনিদা বললে, আহা-হা, বেশ লিখেছিল তো ! শুনে চোখে জল আসে !

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, খুবই করুণ।

আমি বললুম, কবিতাটা পড়ে আমারও খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পিসিমা ধোপার হিসেবের খাতায় এইসব দেখে ভীষণ রেগে গেল। রেগে গিয়ে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা চালকুমড়ো নিয়ে ফুচুদাকে তাড়া করলে। ঠিক যেন গদা হাতে নিয়ে শাড়িপরা ভীম দৌড়চ্ছে !

টেনিদা বললে, তোর পিসিমার কথা ছেড়ে দে—ভারি

বেরসিক। কিন্তু কী প্যাথেটিক কবিতা যে শোনালি প্যালা—মনটা একেবারে মজে গেল! ঈস্—সত্যিই তো! গাধা কত ধুতি-প্যাণ্ট-শাড়ি টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু একখানা পরিতে না পায়!—বলে টেনিদা উদাস হয়ে দূরের একটা শালপাতার ঠোঙার দিকে তাকিয়ে রইল।

সান্ত্বনা দিয়ে হাবুল বললে, মন খারাপ কইর‍্যা আর করবা কী। এইরকম হয়। ছ্যাখ না—গোবর হইল গিয়া গোরুর নিজের জিনিস, অন্য লোকে তাই দিয়া ঘুঁইট্যা দেয়। গোরু একখানা ঘুঁইট্যা দিতে পারে না।

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, দিলে সব মাটি করে! এমন একটা ভাবের জিনিস—ধাঁ করে তার ভেতর গোবর আর ঘুঁটে নিয়ে এল! নে—ওঠ্ এখন, ঢাউস ঘুড়ি দেখবি চল্!

—ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্ ইয়াক ইয়াক—

বলতে বলতে আমরা যখন গড়ের মাঠে পৌছুলুম তখন সবে সকাল হচ্ছে। চৌরঙ্গির এদিকে সূর্য উঠছে আর গঙ্গার দিকটা লালে লাল হয়ে গেছে। দিব্যি ঝির্-ঝির্ করে হাওয়া দিচ্ছে—কখনো কখনো বাতাসটা বেশ জোরালো। চারদিকে নতুন ঘাসে যেন ঢেউ খেলছে। সত্যি বলছি—আমি পটলডাঙার প্যালা-রাম, পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল খাই—আমারই ফুচুদার মতো কবি হতে ইচ্ছে হল।

কখন যে সুর করে গাইতে শুরু করেছি—রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই,—সে আমি নিজেই জানিনে। হঠাৎ মাথার ওপর কটাং করে গাঁট্টা মারল টেনিদা।

—অ্যাই সেরেছে! এটা যে আবার গান গায়!

—তাই বলে তুমি আমার মাথার ওপর তাল দেবে নাকি —আমি চটে গেলুম।

—তাল বলে তাল! আবার যদি চামচিকের মতো চিঁ চিঁ করবি, তাহলে তোর পিঠে গোটা-কয়েক ঝাঁপতাল বসিয়ে দেব সে বলে দিচ্ছি! এসেছি ঘুড়ি ওড়াতে—উনি আবার সুর ধরেছেন!

আমার মনটা বেজায় বিগড়ে গেল। খামোকা সকালবেলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ-সন্তানের মাথায় গাঁট্টা মারলে! মনে-মনে অভিশাপ দিয়ে বললুম, হে ভগবান, তুমি ওড়বার আগেই একটা খোঁচা-টোঁচা দিয়ে টেনিদার ঢাউস ঘুড়ির ঢাউস পেটটা ফাঁসিয়ে দাও! ওকে বেশ করে আক্কেল পাইয়ে দাও একবার!

ভগবান বোধহয় সকালে দাঁতন করতে করতে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার প্রার্থনা যে এমন করে তাঁর কানে যাবে—তা কে জানত!

ওদিকে বিরাট ঢাউসকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা চলছে তখন। টেনিদা দড়ির মস্ত লাটাইটা ধরে আছে—আর হাবুল সেন হাঁপাতে হাঁপাতে প্রকাণ্ড ঢাউসটাকে ওপরে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু ঢাউস উড়ছে না—ধপাৎ করে নিচে পড়ে যাচ্ছে।

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, এ কেমন ঢাউস রে! উড়ছে না যে!

হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, হ, এইখান উড়বো না। এইটার থিক্যা মনুমেণ্ট উড়ান সহজ!

শুনে আমার যে কী ভালো লাগল! খামোকা ব্রাহ্মণের চাঁদিতে গাঁট্টা মারা! হুঁ-হুঁ! যতই পটোল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল খাই, ব্রাহ্মতেজ যাবে কোথায়! ও ঘুড়ি আর উড়ছে না —দেখে নিয়ো!

খালি ক্যাবলা মিট-মিট করে হাসল। বললে, ওড়াতে জানলে সব ঘুড়িই ওড়ে।

—ওড়ে নাকি? টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তবে দে না উড়িয়ে!

ক্যাবলা বললে, তোমার ঘুড়ি তুমি ওড়াবে, আমি ও-সবের মধ্যে নেই। তবে, বুদ্ধিটা বাতলে দিতে পারি। অত নিচ থেকে অত বড় ঘুড়ি ওড়ে? ওপর থেকে ছাড়লে তবে তো হাওয়া পাবে। ওই বটগাছটার ডাল দেখছ? ওখানে উঠে ঘুড়িটা ছেড়ে দাও। ডালটা অনেকখানি এদিকে বেরিয়ে এসেছে—ঘুড়ি গাছে আটকাবে না—ঠিক বোঁ করে উঠে যাবে আকাশে।

টেনিদা বললে, ঠিক। এ-কথাটা আমিই তো ভাবতে যাচ্ছিলুম। তুমি আগে থেকে ভাবলি কেন র‍্যা? ভারি বাড় বেড়েছে—না? তোকে পানিশ্‌মেণ্ট দিলুম। যা গাছে ওঠ্‌—

ক্যাবলা বললে, বা-রে! লোকের ভালো করলে বুঝি এমনিই হয়?

দাঁত খিচিয়ে টেনিদা বললে, তোকে ভালো করতে কে বলেছিল—শুনি? দুনিয়ায় কারো ভালো করেছিস কি মরেছিস। যা—গাছে ওঠ্‌—

—যদি কাঠপিঁপড়ে কামড়ায়?

—কামড়াবে। আমাদের বেশ ভালোই লাগবে।

—যদি ঘুড়ি ছিঁড়ে যায়?

—তোর কান ছিঁড়বে। যা ওঠ্‌ বলছি—

কী আর করে—যেতেই হল ক্যাবলাকে। যাওয়ার সময় বললে, ঘুড়ির দড়িটা ওই গোলপোস্টে বেঁধে দিয়ো টেনিদা। অত বড় ঢাউস—খুব জোর টান দেবে কিন্তু।

টেনিদা নাক কুঁচকে মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা—যা—বেশি বকিসনি! ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম—তুই এসেছিস ওস্তাদি করতে! নিজের কাজ কর—

ক্যাবলা বললে, বহুৎ আচ্ছা।

হু-হু করে হাওয়া বইছে তখন। ডালের ডগায় উঠে ক্যাবলা ঢাউসকে ছেড়ে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে গোঁ-গোঁ করে ডাক ছেড়ে সেই পেল্লায় ঢাউস আকাশে উড়ল।

টেনিদার ওপর সব রাগ ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে ঢাউসকে! মাথার দুধারে দুটো পতাকা যেন বিজয়গর্বে পত্-পত্ উড়ছে—গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে ঘুড়ি ওপরে উঠে যাচ্ছে। টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

কিন্তু আচমকা টেনিদার চ্যাঁচানি বন্ধ হয়ে গেল। আর হাঁউ-মাউ করে ডাক ছাড়ল হাবুল।

—গেল—গেল—

কে গেল? কোথায় গেল?

কে আর যাবে! অমন করে কেই বা যেতে পারে টেনিদা ছাড়া? তাকিয়ে দেখে আমার চোখ চড়াৎ করে কপালে উঠে গেল! কপালে বললেও ঠিক হয় না, সোজা ব্রহ্মতালুতে!

শুধু ঢাউসই ওড়েনি। সেইসঙ্গে টেনিদাও উড়ছে। চালিয়াতি করে লাটাই ধরে রেখেছিল হাতে, বাঘা ঢাউসের টানে সোজা হাত-দশেক উঠে গেছে ওপরে।

এক লাফে গাছ থেকে নেমে পড়ল ক্যাবলা। বললে, পাকড়ো—পাকড়ো—

কিন্তু কে কাকে পাকড়ায়! ততক্ষণে টেনিদা পনেরো হাত

ওপরে। সেখান থেকে তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে ঃ হাবুল রে
—প্যালা রে—ক্যাবলা রে—

আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম ঃ—ছেড়ে দাও—লাটাই ছেড়ে দাও—

টেনিদা কাঁউ-কাঁউ করে বললে, পড়ে যে হাত-পা ভাঙব !

হাবুল বললে, তবে আর কী করবা ! উইড়্যা যাও—

ঢাউস তখন আরো ওপরে উঠেছে। জোরালো পুবের হাওয়ায় সোজা পশ্চিম-মুখো ছুটেছে গোঁ-গোঁ করতে করতে। আর জালের সঙ্গে মাকড়সা যেমন করে ঝোলে, তেমনি করে মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে টেনিদা।

পেছনে পেছনে আমরাও ছুটলুম। সে কী দৃশ্য ! তোমরা কোনো রোমাঞ্চকর সিনেমাতেও তা দ্যাখোনি !

ওপর থেকে তারস্বরে টেনিদা বললে, কোথায় উড়ে যাচ্ছি বল তো ?

ছুটতে ছুটতে আমরা বললুম, গঙ্গার দিকে।

—অ্যাঁ !—ত্রিশূন্য থেকে টেনিদা কেঁউ-কেঁউ করে বললে, গঙ্গায় পড়ব নাকি ?

হাবুল বললে, হাওড়া স্টেশনেও যাইতে পারো !

—অ্যাঁ !

আমি বললুম, বর্ধমানেও নিয়ে যেতে পারে !

—বর্ধমান ! বলতে বলতে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, দিল্লী গেলেই বা আপত্তি কী ? সোজা কুতুব মিনারের চুড়োয় নামিয়ে দেবে এখন।

টেনিদা তখন প্রায় পঁচিশ হাত ওপার। সেখান থেকে

গোঙাতে গোঙাতে বললে, এ যে আরো উঠছে! দিল্লী গিয়ে থামবে তো? ঠিক বলছিস?

আমি ভরসা দিয়ে বললুম, না থামলেই বা ভাবনা কী? হয়ত মঙ্গল-গ্রহেও নিয়ে যেতে পারে।

—মঙ্গল-গ্রহ!—আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে টেনিদা বললে, আমি মঙ্গল-গ্রহে এখন যেতে চাচ্ছি না। যাওয়ার কোনো দরকার দেখছি না!

ক্যাবলা বললে, তবু যেতেই হচ্ছে। যাওয়াই তো ভালো টেনিদা! তুমিই বোধহয় প্রথম মানুষ যে মঙ্গল-গ্রহে যাচ্ছ। আমাদের পটলডাঙার কত বড় গৌরব সেটা ভেবে দ্যাখো!

—চুলোয় যাক পটলডাঙা! আমি—কিন্তু টেনিদা আর বলতে পারলে না, তক্ষুনি শূন্যে আর একটা ডিগবাজি খেলে। খেয়েই আবার কাঁউ-কাঁউ করে বললে, ঘুরপাক খাচ্ছি যে। আমি মোটেই ঘুরতে চাচ্ছি না—তবু বোঁ-বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছি!

ঘুড়ি তখন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের কাছাকাছি। আমরা সমানে পেছনে ছুটছি। ছুটতে ছুটতে আমি বললুম, ও-রকম ঘুরতে হয়। ওকে মাধ্যাকর্ষণ বলে! সায়েন্স পড়োনি?

অনেক ওপর থেকে টেনিদা যেন কী বললে। আমরা শুনতে পেলুম না। কেবল কাঁউ-কাঁউ করে খানিকটা আওয়াজ আকাশ থেকে ভেসে এল।

কিন্তু ওদিকে ঢাউস যত গঙ্গার দিকে এগোচ্ছে তত হাওয়ার জোরও বাড়ছে। পেছনে ছুটে আমরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। টেনিদা উড়ছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে আর উড়ছে।

স্ট্র্যাণ্ড রোড এসে পড়ল প্রায়। ঘুড়ি সমানে ছুটে চলেছে।

এখুনি গঙ্গার ওপারে চলে যাবে। আমাদের লীডার যে সত্যিই —গঙ্গা পেরিয়ে—বর্ধমান হয়ে—দিল্লী ছাড়িয়ে মঙ্গল-গ্রহেই চলল! আমরা যে অনাথ হয়ে গেলুম!

আকাশ থেকে টেনিদা আবার আর্তস্বরে বললেঃ সত্যি বলছি—আমি মঙ্গল-গ্রহে যেতে চাই না—কিছুতেই যেতে চাই না—

আমরা এইবারে একবাক্যে বললুম, না—তুমি যেয়ো না!

—কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে যে!

—তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!—ক্যাবলা জানিয়ে দিলে।

—আর পৌঁছেই একটা চিঠি লিখো—আমি আরো মনে করিয়ে দিলুমঃ চিঠি লেখাটা খুব দরকার।

টেনিদা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই চিঠি লিখবে, কিন্তু পুরোটা আর বলতে পারল না! একবার কাঁউ করে উঠেই কোঁক্ করে থেমে গেল। আমরা দেখলুম, ঢাউস গোঁত্তা খাচ্ছে।

সে কী গোঁত্তা! মাথা নিচু করে বোঁ-বোঁ শব্দে নামছে তো নামছেই। নামতে নামতে একেবারে—ঝপাস করে সোজা গঙ্গায়। মঙ্গল-গ্রহে আর গেল না—মত বদলে পাতালের দিকেই রওনা হল।

আর টেনিদা? টেনিদা কোথায়? সেও কি ঘুড়ির সঙ্গে গঙ্গায় নামল?

না—গঙ্গায় নামে নি। টেনিদা আটকে আছে। আটকে আছে আউটরাম ঘাটের একটা মস্ত গাছের মগডালে। আর বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে একদল কাক কা-কা করে টেনিদার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে আমরা গাছতলায় এসে হাজির হলুম। কেবল আমরাই নই। চারদিক থেকে তখন প্রায় শ-তুই লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। পোর্ট কমিশনারের খালাসি, নৌকোর মাঝি, দুটো সাহেব—তিনটে মেম।

—ওঃ মাই—হোয়াজ্ জ্যাট্ (হোয়াট্স্ দ্যাট্)?—বলেই একটা মেম ভিরমি গেল।

কিন্তু তখন আর মেমের দিকে কে তাকায়? আমি চেঁচিয়ে বললুম, টেনিদা, তাহলে মঙ্গল-গ্রহে গেলে না শেষ পর্যন্ত?

টেনিদা ঢাউস ঘুড়ির মতো গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে বললে, কাকে ঠোকরাচ্ছে!

—নেমে এস তাহলে।

টেনিদা গাঁ-গাঁ করে বললে, পারছি না! ওফ্—কাকে মাথা ফুটো করে দিলে রে প্যালা!

পোর্ট কমিশনারের একজন কুলি তখুনি ফায়ার-বিগ্রেডে টেলিফোন করতে ছুটল। ওরাই এসে মই বেয়ে নামিয়ে আনবে।

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি বললুম, ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি—

সারা গায়ে আইডিন-মাখানো টেনিদা কাতর স্বরে বললে, থাক, ও আর বলিসনি! তার চাইতে একটা করুণ কিছু বল্। তোর ফুচুদার লেখা 'রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা'র কবিতাটাই শোনা। ভারি প্যাথেটিক! ভারি প্যাথেটিক!

চিড়িয়াখানার কালো ভালুকটার নাকে একদিক থেকে খানিকটা রোঁয়া উঠে গেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের পটলডাঙার টেনিদা বললে, বল তো প্যালা—ভালুকটার নাকের ও দশা কী করে হল ?

আমি বললাম, বোধহয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, তাই—

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু !

—তাহলে বোধহয় চিড়িয়াখানার লোকেরা নাপিত ডেকে কামিয়ে দিয়েছে। মানুষ যদি গোঁফ কামায়, তাহলে ভালুকের আর দোষ কী ?

—থাম্ থাম্—বাজে ফ্যাক্-ফ্যাক্ করিসনি ! টেনিদা চটে গিয়ে বললে, যদি এখন এখানে কুট্টিমামা থাকত, তাহলে বুঝতিস, সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি চলে না।

—কে কুট্টিমামা ?

—কে কুট্টিমামা !—টেনিদা চোখদুটোকে পাটনাই পেঁয়াজের মতো বড় বড় করে বললে, তুই গজগোবিন্দ হালদারের নাম শুনিসনি ?

—কক্ষনো না—আমি জোরে মাথা নাড়লাম : কোনদিনই না ! গজগোবিন্দ ! অমন বিচ্ছিরি নাম শুনতে বয়ে গেছে আমার !

—বটে ! খুব যে তড়পাচ্ছিস দেখছি ! জানিস, আমার

কুট্টিমামা আস্ত একটা পাঁটা খায় ? তিন সের রসগোল্লা ফুঁকে দেয় তিন মিনিটে ?

—তাতে আমার কী ! আমি তো তোমার কুট্টিমামাকে কোনদিন নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি না ! প্রাণ গেলেও না ।

—তা করবি কেন ! এমন একটা জাঁদরেল লোকের পায়ের ধুলো পড়বে তোর বাড়িতে—অমন কপাল করেছিস নাকি তুই ? পালা জ্বরে ভুগিস আর সিঙ্গি মাছের ঝোল খাস—কুট্টিমামার মর্ম তুই কী বুঝবি র‍্যা ? জানিস, কুট্টিমামার জন্যেই ভালুকটার ওই অবস্থা ?

এবারে চিন্তিত হলাম ।

—তা তোমার কুট্টিমামার এসব বদ্ খেয়াল হল কেন ? কেন ভালুকের নাক কামিয়ে দিতে গেল খামোকা ? তার চাইতে নিজের মুখ কামালেই তো ঢের বেশি কাজ দিত ।

—চুপ কর্ প্যালা, আর বাজে বকালে রদ্দা খাবি—টেনিদা সিংহনাদ করল । আর তাই শুনে ভালুকটা বিচ্ছিরি রকম মুখ করে আমাদের ভেংচে দিলে ।

টেনিদা বললে, দেখলি তো ! কুট্টিমামার নিন্দে শুনে ভালুকটা পর্যন্ত কেমন চটে গেল !

এবার আমার কৌতূহল ঘন হতে লাগল ।

—তা ভালুকটার সঙ্গে তোমার কুট্টিমামার আলাপ হল কী করে ?

—আরে সেইটেই তো গল্প । দারুণ ইন্‌টারেস্টিং !—হুঁ-হুঁ বাবা, এসব গল্প এমনি শোনা যায় না—কিছু রেস্ত খরচ করতে হয় । গল্প শুনতে চাস—আইসক্রীম খাওয়া ।

অগত্যা কিনতেই হল আইসক্রীম ।

চিড়িয়াখানার যেদিকটায় অ্যাট্‌লাসের মূর্তিটা রয়েছে, সেদিকে বেশ একটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা এসে বসলাম। তারপর সারসগুলোর দিকে তাকিয়ে আইসক্রীম খেতে খেতে গল্প শুরু করল টেনিদা ঃ

আমার মামার নাম গজগোবিন্দ হালদার। শুনেই তো বুঝতে পারছিস ক্যায়সা লোক একখানা! খুব তাগড়া জোয়ান ভেবেছিস বুঝি? ইয়া ইয়া ছাতি—অ্যায়সা হাতের গুল? উঁহু, মোটেই নয়। মামা একেবারে প্যাঁকাটির মতো রোগা—দেখলে মনে হয় হাওয়ায় উল্‌টে পড়ে যাবে। তার ওপর প্রায় ছ-হাত লম্বা—মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, দূর থেকে ভুল হয়, বুঝি একটা তালগাছ হেঁটে আসছে। আর রঙ! তিন পোঁচ আলকাতরা মাখলেও অমন খোলতাই হয় না। আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে করবি—ডজন-খানেক নেংটি ইঁদুর ফাঁদে পড়ে চিঁ-চিঁ করছে সেখানে।

সেবার কুট্‌টিমামা শিলিগুড়ি ইস্টিশনের রেলেওয়ে রেস্তোরাঁয় বসে সবে দশ প্লেট ফাউল কারি আর সের-তিনেক চালের ভাত খেয়েছে, এমন সময় গোঁ গোঁ করে একটা গোঙানি। তারপরেই চেয়ার-ফেয়ার উল্‌টে একটা মেমসায়েব ধপাৎ করে পড়ে গেল কাটা কুমড়োর মতো।

হৈ—হৈ—রৈ—রৈ! হয়েছে কী, জানিস? চা-বাগানের এক দঙ্গল সাহেব-মেম রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছিল তখন। মামার খাওয়ার বহর দেখে তাদের চোখ তো উল্‌টে গেছে আগেই, তারপর আবার দশ প্লেট খাওয়ার পরে মামা যখন আরো দু প্লেটের অর্ডার দিয়েছে, তখন আর সইতে পারেনি।

—ও গড হেল্‌প মি, হেল্‌প মি—বলে তো একটা মেম ঠায়

অজ্ঞান। আর তোকে তো আগেই বলেছি—মামার চেহারাখানা, কী বলে—তেমন ইয়ে নয়!

মামার চক্ষুস্থির!

দলে গোটা-চারেক সাহেব—কাশীর ষাঁড়ের মতো তারা ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। কুট্টিমামা ভাবলে, ওরা সবাই মিলে পিটিয়ে বুঝি পাটকেল বানিয়ে দেবে! মামা জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে পৈতে খুঁজতে লাগল—দুর্গা নাম জপ করবে। কিন্তু সে পৈতে কি আর আছে? পিট চুলকোতে গিয়ে কবে তার বারোটা বেজে গেছে।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে দুটো সাহেব তখন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রাণপণে দেঁতো হাসি হেসে মামা বললে, ইট ইজ নট মাই দোষ স্যার—আই একটু বেশি ইট স্যার—

কুট্টিমামার বিদ্যে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিনা, তাও তিনবার ফেল। তাই ইংরেজি এর বেশি এগুলো না।

তাই শুনে সায়েবগুলো ঘোঁ—ঘোঁ—ঘুঁক্—ঘুঁক্—হোয়া হোয়া করে হাসল। আর মেমেরা খিঁ—খিঁ—পিঁ—পিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ করে হেসে উঠল। ব্যাপার দেখে শুনে তাজ্জব লেগে গেল কুট্টিমামার।

অনেকক্ষণ হোয়া—হোয়া করবার পরে একটা সায়েব এসে কুট্টিমামার হাত ধরল। কুট্টিমামা তো ভয়ে কাঠ—এই বুঝি হ্যাঁচকা মেরে চিৎ করে ফেলে দিলে! কিন্তু মোটেই তা নয়, সায়েব কুট্টিমামার হ্যাণ্ডশেক করে বললে, মিস্টার বেঙ্গালী, কী নাম তোমার?

কুট্টিমামার ধড়ে সাহস ফিরে এল। যা থাকে কপালে ভেবে বলে ফেলল নামটা।

—গাঁজা-গাবিণ্ডে হ্যালডার? বাঃ, খাসা নাম। মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, তুমি চাকুরি করবে?

চাকরি! এ যে মেঘ না চাইতেই জল! কুট্‌টিমামা তখন টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার—বাপের, অর্থাৎ আমার দাদুর বিনা পয়সার হোটেলে রেগুলার খাওয়া-দাওয়া চলছে। কুট্‌টিমামা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল।

সায়েবটা তাই দেখে হঠাৎ পকেট থেকে একটা বিস্কুট বের করে কুট্‌টিমামার হাঁ-করা মুখের মধ্যে গুঁজে দিল। মামা তো কেসে বিষম খেয়ে অস্থির! তাই দেখে আবার শুরু হল ঘোঁ—ঘোঁ—হোঁয়া—হোঁয়া—পিঁ—পিঁ—চিঁ—হিঁ—হিঁ! এবারে মেম পড়ে গেল চেয়ার থেকে!

হাসি-টাসি থামলে সেই সায়েবটা আবার বললে, হ্যালো মিস্টার বেঙ্গালী, আমরা আফ্রিকায় গেছি, নিউগিনিতে গেছি, পাপুয়াতেও গেছি। গরিলা, ওরাং, শিম্পাঞ্জি সবই দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো এমন একটি চিজ কোথাও চোখে পড়েনি। তুমি যদি আমাদের চা-বাগানে চাকরি নাও—তাহলে এক্ষুনি তোমায় দেড়শো টাকা মাইনে দেব। খাটনি বিশেষ কিছু নয়—শুধু বাগানের কুলিদের একটু দেখবে আর আমাদের মাঝে মাঝে খাওয়া দেখাবে।

এমন চাকরি পেলে কে ছাড়ে? কুট্‌টিমামা তক্ষুনি এক পায়ে খাড়া।

সায়েবরা মামাকে যেখানে নিয়ে গেল, তার নাম জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট। মংপুর নাম শুনেছিস—মংপু? আরে, সেই যেখানে কুইনিন তৈরি হয় আর রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে কবিতা-টবিতা লিখতেন? জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট তারই কাছাকাছি।

মামা তো দিব্যি আছে সেখানে। অসুবিধের মধ্যে মেশবার মতো লোকজন একেবারে নেই, তা ছাড়া চারদিকেই ঘন পাইনের জঙ্গল। নানারকম জানোয়ার আছে সেখানে, বিশেষ করে ভালুকের আস্তানা।

তা মামার দিন ভালোই কাটছিল। শস্তা মাখন, দিব্যি দুধ —অঢেল মুরগি। তা ছাড়া সায়েবরা মাঝে মাঝে হরিণ শিকার করে আনত, সেদিন মামার ডাক পড়ত খাওয়ার টেবিলে। একাই হয়ত একটা সম্বরের তিন সের মাংস মামা সাবাড় করে দিত, তাই দেখে টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিত সায়েবরা—হোঁয়া—হোঁয়া —হিঁ—হিঁ করে হাসত।

জঙ্গলঝোরা থেকে মাইল তিনেক হাঁটলে একটা বড় রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে দার্জিলিঙে—বাসও পাওয়া যায় এখান থেকে। কুট্‌টিমামাকে বাগানে ফুট-ফরমাস খাটবার জন্যে প্রায়ই দার্জিলিঙে যেতে হত।

সেদিনও মামা দার্জিলিঙ থেকে বাজার নিয়ে ফিরছিল। কাঁধে একটা বস্তায় সের-তিনেক শুঁটকি মাছ, হাতে একরাশ জিনিস-পত্তর। কিন্তু বাস থেকে নেমেই মামার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

প্রথম কারণ, সন্ধে ঘোর হয়ে এসেছে—সামনে তিন মাইল পাহাড়ী রাস্তা। এই তিন মাইলের দু মাইলই আবার ঘন জঙ্গল। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানী চাকর রামভরসার বাস স্ট্যাণ্ডে লণ্ঠন নিয়ে আসার কথা ছিল, সেও আসেনি। মামা একটু ফাঁপরেই পড়ে গেল বই কি।

কিন্তু আমার মামা গজগোবিন্দ হালদার অত সহজেই দমবার পাত্র নন। শুঁটকি মাছের বস্তা কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে

হাঁটতে শুরু করে দিলে। মামার আবার আফিং খাওয়ার অভ্যেস ছিল, তারই একটা গুলি মুখে পুরে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পথ চলতে লাগল।

দু-ধারে পাইনের নিবিড় জঙ্গল আরো কালো হয়ে গেছে অন্ধকারে। রাশি-রাশি ফার্নের ভেতরে ভুতের হাজার হাজার চোখের মতো জোনাক জ্বলছে। ঝিঁ-ঝিঁ করে ঝিঁঝিঁর ডাক উঠছে। নিজের মনে রামপ্রসাদী সুরে গাইতে গাইতে কুট্টিমামা পথ চলেছে :

নেচে নেচে আয় মা কালী
আমি যে তোর সঙ্গে যাব—
তুই খাবি মা পাঁটার মুড়ো
আমি যে তোর প্রসাদ পাব !

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিল তখন। হঠাৎ মামার চোখে পড়ল, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক সেই বনের ভেতরে বসে কোঁ-কোঁ করছে। !

আর কে ! ওটা নির্ঘাৎ রামভরসা।

রামভরসার ম্যালেরিয়া ছিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জ্বর এসে পড়ত। কিন্তু ওষুধ খেত না—এমনকি, এই কুইনিনের দেশে এসেও তার রোগ সারাবায় ইচ্ছে ছিল না। রামভরসা তার ম্যালেরিয়াকে বড্ড ভালোবাসত। বলত, উ আমার বাপ-দাদার ব্যারাম আছেন। ওকে তাড়াইতে হামার মায়া লাগে।

কুট্টিমামার মেজাজ যদিও আফিংয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল তবু রামভরসাকে দেখে চিনতে দেরি হল না। রেগে বললে, তোকে না আমি বাস স্ট্যাণ্ডে যেতে বলেছিলুম ? আর তুই এই জঙ্গলের মধ্যে বসে কোঁ-কোঁ করছিস ? নে—চল্—

গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে রামভরসা উঠে দাঁড়াল।

কুট্‌টিমামা নাক কুঁচকে বললে, ইঃ, গায়ের কম্বলটা দেখ একবার! কী বদখৎ গন্ধ! কোনোদিন ধুসনি বুঝি? শেষে সে উকুন হবে ওতে! নে—চল্‌ ব্যাটা গাড়োল! আর এই শুঁট্‌কি মাছের পুঁটলিটাও নে। তুই থাকতে ওটা আমি বয়ে বেড়াব নাকি?

এই বলে মামা পুঁটুলিটা এগিয়ে দিলে রামভরসার দিকে।

—এঃ, হাত তো নয়, যেন নুলো বের করছে! থাক, ওতেই হবে।—মামা রামভরসার হাতে পুঁটলিটা গুঁজে দিলে জোর করে।

রামভরসা বললে, গোঁ—গোঁ—ঘোঁক্‌!

—ইস্‌-স্‌! সাহেবদের সঙ্গে থেকে খুব যে সায়েবি বুলি শিখেছিস দেখছি! চল্‌—এবার বাসামে ফিরে কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে তোর ম্যালেরিয়া তাড়াব। দেখব কেমন সায়েব হয়েছিস তুই!

রামভরসা বললে, ঘুঁক্‌ ঘুঁক্‌।

—ঘুঁক্‌ ঘুঁক্‌? বাংলা-হিন্দী বলতে বুঝি আর ইচ্ছে করে না? চল্‌—পা চালা—

কুট্‌টিমামা আগে আগে, পিছে পিছে শুঁটকে মাছের পুঁটলি নিয়ে রামভরসা। মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলে কেমন থপাস্‌ থপাস্‌ হাঁটছে রামভরসা।

—ওঃ—খুব যে কায়দা করে হাঁটছিস! যেন বুট পরে বড় সায়েব হাঁটছেন!

রামভরসা বলল, ঘঁচাৎ।

—ঘঁচাৎ?—চল বাড়িতে, তোর কান যদি কচাৎ করে কেটে না নিয়েছি, তবে আমার নাম গজগোবিন্দ হালদারই নয়!

মাইল-খানেক হাঁটবার পরে কুট্টিমামার কেমন সন্দেহ হতে লাগল। পেছনে পেছনে থপ-থপ করে রামভরসা ঠিকই আসছে, কিন্তু কেমন কচর-মচর করে আওয়াজ হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, কেউ যেন বেশ দরদ দিয়ে তেলেভাজা আর পাঁপড় চিবুচ্ছে। রামভরসা শুঁটকি মাছ খাচ্ছে নাকি? তা কী করে সম্ভব? রামভরসা রান্না-করা শুঁটকির গন্ধেই পালিয়ে যায়—কাঁচা শুঁটকি সে খাবে কী করে!

মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল—কিন্তু বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। একে তো নেশায় চোখ প্রায় বুজে এসেছে, তারপর এদিকে একেবারে চাঁদের আলো নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু দেখা গেল, পেছনে পেছনে সমানে থপ্‌থপিয়ে আসছে রামভরসা—ঠিক তেমনি গদাইলস্করী চালে।

পায়ের নিচে পাইনের অজস্র শুকনো কাঁটাওয়ালা পাতা ঝরে রয়েছে। মামা ভাবলে হয়ত তাই থেকেই আওয়াজ উঠছে এইরকম।

তবু মামা জিজ্ঞেস করলে, কিরে রামভরসা, শুঁটকি মাছগুলো ঠিক আছে তো?

রামভরসা জবাব দিলে, ঘুঁ—ঘুঁ!

—ঘুঁ—ঘুঁ? ইস্—আজ যে খুব ডাঁটে রয়েছিস দেখছি, যেন আদত বাস্তুঘুঘু!

রামভরসা বললে, হুঁ—হু!

কুট্টিমামা বললে, সে তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা চল্ তো বাড়িতে, তারপর তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

আরো খানিকটা হাঁটবার পরে মামার বড্ড তামাকের তেষ্টা পেল। সামনে এখনো একটা খাড়া চড়াই, তার পর প্রায়

আধ মাইল নামতে হবে। একটু তামাক না খেয়ে নিলে আর চলছে না।

মামার বাঁ কাঁধে একটা চৌকিদারী গোছের ঝোলা ঝুলত সব সময়ে, তাতে জুতোর কালি, দাঁতের মাজন থেকে শুরু করে টিকে-তামাক পর্যন্ত সব থাকত। মামা জুত করে একখানা পাথরের ওপরে বসে পড়ল, তারপর কলকে ধরাতে লেগে গেল। রামভরসাও একটু দূরে ওত পেতে বসে পড়ল—আর ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।

—হুঁ—হুঁ!

—সে তো জানি, তামাকে আর তোমার অরুচি আছে কবে! আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটু খেয়ে নিই, তারপর প্রসাদ দেব তোকে।

চোখ বুজে গোটা-কয়েক সুখ-টান দিয়েছে কুট্‌টিমামা—হঠাৎ আবার সেই কচর-মচর শব্দ। শুঁটকি মাছ চিবোনোর আওয়াজ—নির্ঘাত!

কুট্‌টিমামা এবারে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রাগে ফেটে পড়ল।

—তবে রে বেল্লিক, এই তোর ভণ্ডামি? 'শুঁটকি মাছ আমি ছুঁতা নেহি—রাম রাম?' দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে—

বলেই হুঁকো-টুকো নিয়ে মামা তেড়ে গেল তার দিকে।

তখন হঠাৎ আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, জ্বলজ্বলে একটা চাঁদ দেখা গেল সেখানে। একরাশ ঝকঝকে দাঁত বের করে রামভরসা বললে, ঘোঁক—ঘঁর্‌র্‌—ঘঁর্‌র্‌—

আর যাবে কোথায়! হাতের আগুনশুদ্ধ হুঁকোটা রামভরসার নাকের ওপর ছুড়ে দিয়ে 'বাপরে—গেছিরে'—বলে কুট্‌টিমামার চিৎকার। তারপরেই ফ্ল্যাট—একদম অজ্ঞান।

রামভরসা নয়, ভালুক। আফিঙের ঘোরে মামা কিচ্ছুটি বুঝতে পারেনি। ভালুকের জ্বর হয়, জানিস তো? তাই দেখে মামা ওকে রামভরসা ভেবেছিল। গায়ের কালো রোঁয়াগুলোকে ভেবেছিল কম্বল। আর শুঁটকি মাছের পুঁটলিটা পেয়ে ভালুক বোধহয় ভেবেছিল, এও তো মজা মন্দ নয়! সঙ্গে সঙ্গে গেলে আরো বোধহয় পাওয়া যাবে। তাই খেতে খেতে পেছনে পেছনে আসছিল। খাওয়া শেষ হলেই মামার ঘাড় মটকাত।

কিন্তু ঘাড়ে পড়বার আগেই নাকে পড়ল টিকের আগুন। ঘোঁৎ—ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে ভালুক তিন লাফে পগার পার।

বুঝলি প্যালা—ওইটেই হচ্ছে সেই ভালুক।

গল্প শুনে আমি ঘাড় চুলকোতে লাগলাম:

—কিন্তু ওইটেই যে সেই ভালুক—সেটা বুঝলে কী করে?

—হুঁ-হুঁ, কুট্টিমামার হাতের কাজ, দেখলে কি ভুল হওয়ার জো আছে! আরে—আরে, ওই যে ডালমুট যাচ্ছে! ডাক—ডাক, শিগগির ডাক—

কাঁকড়াবিছে

চাটুজ্জেদের রকে আমি, টেনিদা আর হাবুল সেন বসে মোড়ের বুড়ো হিন্দুস্থানীর কাছ থেকে কিনে আনা তিনটে ভুট্টাপোড়া খুব তরিবত করে খাচ্ছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে লাফাতে লাফাতে ক্যাবলা এসে হাজির।

—ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস! মেরেছি একটাকে!

কচর-কচর করে ভুট্টার দানা চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, হঠাৎ এত লম্ফঝম্ফ যে? কী মেরেছিস? মাছি, না ছারপোকা?

—একটা মস্ত কাঁকড়াবিছে। দেওয়ালের ফুটো থেকে বেরিয়ে দিব্যি ল্যাজ তুলে আমাদের ছেদিলালকে কামড়াতে যাচ্ছিল। ছেদিলাল আপন মনে গান গাইতে গাইতে গোরু দোয়াচ্ছে, কিচ্ছু টের পায়নি। আমি দেখেই একটা ইট তুলে ঝাঁ করে মেরে দিলুম—ব্যস—ঠাণ্ডা!

টেনিদা মুখটাকে কুচোচিংড়ির মত সরু আর বিচ্ছিরি করে বললে, ফুঃ!

—ফুঃ মানে?—ক্যাবলা চটে গেল: কাঁকড়াবিছের সঙ্গে চালাকি নাকি? একবার কামড়ালেই বুঝতে পারবে!

—কাঁকড়াবিছের সঙ্গে চালাকি কে করতে যাচ্ছে? কিন্তু কলকাতায় কাঁকড়াবিছে? রাম রাম! ওরা তো ডেঁয়ো পিঁপড়ের বড়দা ছাড়া কিছু নয়! আসল কাঁকড়াবিছের কথা জানতে চাস তো আমার পচামামার গল্প শুনতে হবে।

গল্পের গন্ধে ক্যাবলা তড়াক করে রকে উঠে বসল।

হাবুল বললে, পচা মামা? এই নামটা এইবারে য্যান্ নূতন শুনতে আছি।

—কত শুনবি আরো, এখুনি হয়েছে কী!—ভুট্টার দানাগুলো শেষ করে টেনিদা এবার সবটা বেশ করে চেটে নিলে: আর যত শুনবি ততই চমকে যাবি!

আমি একবার মাথাটা চুলকে নিয়ে বললুম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব টেনিদা?

ভুট্টার গোঁজটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে টেনিদা মোটা গলায় বললে, ইয়েস, পারমিশন দিচ্ছি।

—তোমার ক-টি মামা আছে সবশুদ্ধ্?

টেনিদা বললে, ফাইভ ফিফ্‌টিফাইভ। মানে পাঁচশো পঞ্চাশ জন।

আমি কাকের মতো হাঁ করে রইলুম, ক্যাবলা একটা খাবি খেল, আর হাবুল সেন ডুকরে উঠল: খাইছে!

—ইউ শাট্ আপ হাবলা, চিল্লাসনি! মামা কী রকম জানিস? ঠিক রেকারিং ডেসিমেলের মতো—মানে, শেষ নেই। মনে কর্ মা-র পিসতুতো ভাইয়ের বড়ো শালার মেজো ভায়রা—তাকে কী বলে ডাকব?

আমরা একবাক্যে বললুম, মামা।

—কিংবা মনে কর্, আমার কাকিমার মাসতুতো বোনের খুড়তুতো ভাইয়ের—

ক্যাবলা বললে, থাক, আর বলতে হবে না। মানে, মামা। বিশ্বময় মামা।

—রাইট! পচামামা সেই বিশ্বময় মামার একজন।

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, সে তো হল। কিন্তু কাঁকড়াবিছে—

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, দাঁড়া না ঘোড়াডিম ! আগে সব জিনিসটা ক্লীয়ার করে নিতে হবে না ? কুরুবকের মতো বেশি বকবক করবি তো তোর কানের ওপর এখুনি একটা কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেব !

হাবুল বললে, ছ্যাইড়া দাও—প্যালার কথা ছ্যাইড়া দাও ! ওইটা একটা দুগ্ধপোইষ্য শিশু !

—কী আমার ঠাকুর্দা এলেন রে—আমি হাবুলকে ভেংচি কাটলুম।

টেনিদা আমার মাথায় টকাং করে একটা টোকা মেরে বললে, ইউ স্টপ ! নাউ নো ঝগড়া ! তাহলে দুই থাপ্পড় দিয়ে দুটোকেই তাড়িয়ে দেব এখান থেকে। এখন পচামামার গপ্প শুনে যা। খবরদার, ডিস্টার্ব করবিনে।

আমরা একবাক্যে বললুম, না—না।

—পচামামা, বুঝলি—একটা গলাখাঁকারি দিয়ে টেনিদা শুরু করলেঃ স্কুলে সাতবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল। আটবারের বার টেস্টেও যখন অ্যালাও হতে পারল না, তখন দাদু—মানে পচামামার বাবা তাকে পেল্লায় একটা চড় মেরে বললে, নিকালো আমার বাড়ি থেকে হতভাগা মুখ্যু, কুপুত্তুর, বোম্বেটে, অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার !

একসঙ্গে চার চারটে ওইরকম জবরদস্ত গাল, আর গালের ওপর অমনি একখানা, কী বলে—জাড্যাপহ চাঁটি—

আমি জিজ্ঞেস করলুমঃ জাড্যাপহ মানে কী ?

—আমি কোত্থেকে জানব ? শুনতে বেশ জাঁদরেল লাগে, তাই বললুম।

ক্যাবলা বলতে গেল ঃ জাড্যাপহ, অর্থাৎ কিনা, যা জড়তা অপহরণ—

—চুপ কর্ ক্যাবলা—টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল ঃ তুই আর পণ্ডিতের মতো টিকটিক করিসনি ! ফের যদি বিদ্যে ফলাবি—আমি আর গল্প বলবই না। মুখে বলটু এঁটে বসে থাকব।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, না—না, আমরা আর কথা বলব না। গল্পটাই চলুক।

টেনিদা আবার শুরু করল ঃ সেই জাড্যাপহ চাঁটি খেয়ে পচা-মামার মন উদাস হল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার নিকুচি করেছে—এমন অপমান সহ্য করা যায় ! পচামামা সেই রাতেই দেশান্তরী হল।

মানে বিদেশে আর যাবে কোথায়, তখনো পাকিস্তান হয়নি—সোজা দার্জিলিং মেলে উঠে পড়ল। নামল গিয়ে শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড় জঙ্গল ভেঙে, বাঙলা দেশের চৌহদ্দি পেরিয়ে একেবারে চলে গেল ভুটানে।

ইচ্ছে ছিল তিব্বতে গিয়ে অতীশ-দীপঙ্কর-টর হবে, কিন্তু একে বেজায় শীত, তায় ভুটান তখন লালে লাল।

—লালে লাল ?—ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে ঃ ভুটানীরা খুব দোল খেলে বুঝি ?

—তোর মুণ্ডু ! লেবু—লেবু, কমলালেবু ! ভুটানী কমলা বিখ্যাত, জানিস তো ? আর পাহাড় আলো করে সব বাগান, তাতে হাজারে হাজারে ফল পেকে টুকটুক করছে, ঝরে পড়ছে গাছতলায়। যত খুশি কুড়িয়ে খাও, কেউ কিচ্ছুটি বলবে না। এমনকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুটো-চারটে ছিঁড়ে নিতে পারো—কে আর অত লক্ষ্য করতে যাচ্ছে !

মোদ্দা, ওই কমলালেবুর টানেই পচামামা ভুটানে আটকে

গেল। যেখানে সেখানে পড়ে থাকে আর পেটভরতি লেবু খায়। দেখতে দেখতে পচামামার ছিবড়ে বাদুড়চোষা চেহারাই পালটে গেল একদম। দাদু কিপটে লোক, তাঁর বাড়িতে পুঁইডাঁটা চচ্চড়ি কড়াইয়ের ডাল আর থলসে মাছের ঝাল খেয়ে খেয়ে পচামামার বুদ্ধি-টুদ্ধিগুলোতে মরচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কমলালেবুর রসে হঠাৎ সেগুলো চাঙা হয়ে উঠল।

ওদিকের সবচাইতে বুড়ো বাগানের মালিক হল পেম্বা-দোরজী-শিরিং। নামটা, কী বলে—একটু ইয়ে হলেও লোকটি বেশ ভালমানুষ। গোলগাল চেহারা, গায়ে ওদের সেই কালো আলখাল্লা, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের লম্বা বিনুনি। মুখে পাঁচ-সাত গাছা দাড়ি, সব সময় মিঠে মিঠে হাসি, আর রাতদিন চমরী গাইয়ের জমাট দুধের টুকরো চুষছে। পচামামা তাকে গিয়ে মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, শিরিং সাহেব, আমি একজন বিদেশী।

শিরিং হেসে বললে, সে জানি। আজ পনেরো দিন ধরে তুমি আমার বাগানের লেবু খেয়ে আধাসাট করছ। কিন্তু আমরা অতিথিবৎসল বলে তোমায় কিছু বলিনি। ভুটিয়া হলে আমার এই কুকরি দিয়ে মুণ্ডুটি কচাৎ করে কেটে নিতুম।

শুনে পচামামার রক্ত জল হয়ে গেল। বললে, সাহেব, আমি খুব হাংগ্রি বলেই—

শিরিং চমরী গাইয়ের দুধের টুকরো মুখে পুরে বললে, ঠিক আছে, আমি কিছু মাইণ্ড করিনি। ওই তো তোমার বাঙালীর পেট, কীই বা তুমি খেতে পারো! এখন বলো, কী চাও?

—শিরিং সাহেব—পচামামা হাত কচলাতে কচলাতে বললে, শুধু কমলালেবু চালান দিয়ে কীই বা লাভ হয় আপনার?

—কম কী ? লাখ খানেক।

—আজ্ঞে, এই লাখ টাকা যদি পাঁচ লাখ হয় ?

শুনে শিরিং সাহেব নড়ে বসল ঃ তা কী করে হতে পারে ?

—আপনি অরেঞ্জ স্কোয়াশ, অর্থাৎ বোতল-ভরতি করে কমলালেবুর রস বিক্রি করুন। তাতে লাভ অনেক বেশি হবে।

শিরিং হাসল ঃ এ আর নতুন কথা কী ? এই তো মাইল-পাঁচেক দূরে ডিক্রুজ-বলে এক সায়েব একটা কারখানা করেছে। সে তো জুত করতে পারছে না। বাজারে দারুণ কম্পিটিশন—কলকাতা বোম্বাইতে অনেক বড়ো বড়ো কোম্পানি, আমরা সুবিধে করতে পারব কেন ?

পচামামা আবার একটা লম্বা সেলাম ঠুকল ঃ যদি এমন অরেঞ্জ স্কোয়াশ তৈরি করতে পারি যা স্বাদে গন্ধে, যাকে বলে অতুলনীয় ? মানে যা খেলে লোকে আর ভুলতে পারে না, একবার খেলে বার বার খেতে চায় ?

—সে জিনিস তৈরি করবে কে ? তুমি ?

—চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি কি কেমিস্ট ?

—আমি এম্. এস্ সি.।

পচামামা চাল মারল, বুঝতেই পারছিস। কিন্তু বিদেশে-বিভুঁয়ে এক আধটু ও-সব করতেই হয়, নইলে কাজ চলে না। পচামামা ভাবল, হুঁ-হুঁ—বাঙালীর ব্রেন—একটা কিছু করে ফেলবই।

শিরিং খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে কি ভাবল। তারপর বললে, বেশ, চেষ্টা করে দেখ।

—কিন্তু দিন পনেরো সময় দিতে হবে।

—পনেরো দিন কেন ?—শিরিং উৎসাহ দিয়ে বললে, এক মাস সময় দিচ্ছি। তুমি আমার আউস-হাউসে থাকো। এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের জন্যে যা যা চাও সব দেব। যদি সাক্‌সেসফুল হতে পারো, তোমাকে কারখানার চীফ কেমিস্ট করে দেব, আর মাসে দু-হাজার টাকা করে মাইনে।

পচামামা এসে শিরিং সাহেবের আউট-হাউসে উঠল। সে কী রাজকীয় আয়োজন! এমন গদি-আঁটা বিছানায় পচা-মামাদের কেউ সাত জন্মেও শোয়নি। দুবেলা এমন ভালো ভালো খাবার খেতে লাগল যে তিন দিন পরে একবার করে পেটের অসুখে ভুগতে লাগল। আর সেইসঙ্গে চলল তার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট।

কখনো কমলালেবুর রসে আদা মেশাচ্ছে, কখনো মধু, কখনো চায়ের লিকার, কখনো ঝোলা গুড়, কখনো বা এক-আধ শিশি হোমিওপ্যাথিক ওষুধই ঢেলে দিচ্ছে—মানে, প্রাণে যা চায়। আর খেয়ে খেয়ে দেখছে। কোনদিন বা এক চামচে খেয়েই বমি করে ফেলল, কোনদিন মুখে দিতে না দিতেই তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, কোনদিন নেহাত মন্দ লাগল না, আর কোনদিন মুখ এমন টকে গেল—যে ঝাড়া আটচল্লিশ ঘণ্টা কিছু আর দাঁতে কাটতে পারে না।

এদিকে এক মাস যায়-যায়। শিরিং সাহেব মাঝে মাঝে খবর নেয়, কদ্দুর হল। পচামামা বুঝতে পারল, এভাবে পরস্মৈপদী রাজভোগ আর বেশিদিন চলবে না। এক মাসের ভেতর কিছু একটা করতে না পারলে এই খাওয়ার সুখ সুদে আসলে আদায় করে নেবে ; পিটিয়ে তক্তা তো করে দেবেই, চাই কি কচাং করে মুণ্ডুটিও কেটে নিতে পারে।

পচামামা রাত জেগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, আর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট চালায়। তারপর একদিন মধু, আদা, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর পিঁপড়ের ডিম মিশিয়ে যেই এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করেছে—

ওঃ, কী বলব তোদের, কী তার স্বাদ, কী সুতার! এক চামচে খেয়ে মনে হল যেন পোলাও, পায়েস, ছানার ডালনা, আলুকাবলি, বেলের মোরব্বা, দরবেশ, রাবড়ি—মানে যত ভালো ভালো খাবার জিনিস রয়েছে, সব যেন কে একসঙ্গে তার মুখে পুরে দিলে। এমন অপূর্ব, এমন আশ্চর্য অরেঞ্জ স্কোয়াশ পৃথিবীতে কেউ কখনো খায়নি!

পচামামা তখনই গিয়ে শিরিং সাহেবকে সেলাম ঠুকল। বললে, আমি রেডি।

—এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট সাক্‌সেসফুল?

—ভেরি সাক্‌সেসফুল!

শিরিং সাহেব খুশি হয়ে বললে, বেশ, তাহলে কালকে আমি আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার ম্যানেজার, আর আমার তিনজন বন্ধু—আমরা তোমার অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেয়ে দেখব। যদি ভালো লাগে, কালই কলকাতায় মেশিনের জন্যে অর্ডার দেব, আর তুমি হবে আমার কারখানার চীফ কেমিস্ট, মাসে দু-হাজার টাকা মাইনে।

কেল্লা ফতে! পচামামা নাচতে নাচতে চলে এল। সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখল সে একটা মস্ত মোটরগাড়ি চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর দু-ধারের লোক তাকে সেলাম ঠুকছে।

কিন্তু বরাত কি আর অত সহজেই খোলে রে? তাহলে কি আর আজ পচামামাকে লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে গাঁয়ে

মুদিখানার দোকান করতে হয়? না—পেঁয়াজ আর মুসুরির ডালের ওজন নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়?

যা হল, তা বলি।

পচামামা বুঝতে পেরেছিল, নিশ্চয় পিঁপড়ের ডিমের গুণেই তার তৈরি অরেঞ্জ স্কোয়াশ তখন স্বর্গের সুধা হয়ে উঠেছে। প্রাণ খুলে সে আট বোতল সুধা তৈরি করল, তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে গেল। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী সুখের স্বপ্ন যে দেখল সে তো আগেই বলেছি।

পরের দিন শিরিং সাহেব তো দলবল নিয়ে পচামামার এক্সপেরিমেণ্ট চাখতে বসেছে। সবটা মিলে বেশ একটা চমৎকার মোচ্ছবের আবহাওয়া। মস্ত টেবিলে দামী টেবিল-ক্লথ পেতে দেওয়া হয়েছে, ফুলদানিতে ফুল সাজানো হয়েছে, গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড বাজছে, আর সাতজনের সামনে সাতটি রুপোর গ্লাস চকচক করছে।

পচামামা আহ্লাদে-আহ্লাদে মুখ করে গেলাসে গেলাসে তার এক্সপেরিমেণ্ট ঢেলে দিলে।

প্রথমে শিরিং সাহেব একটা চুমুক দিল, তারপরেই আর সবাই।

তোদের বলব কি—তক্ষুনি যেন একটা বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। প্রথমেই 'অঁাক' করে শিরিং সাহেব চেয়ারশুদ্ধ উলটে পড়ে গেল, শিরিং সাহেবের গিন্নী টেবিলে বমি করে ফেলল, তাদের ছেলে 'অঁাই' করে একটা আওয়াজ তুলে সেই যে ঘর থেকে দৌড় লাগাল—পাক্কা তিন মাইল গিয়ে তারপরে বোধহয় সে থামল। ম্যানেজার হাত-পা ছুড়ে পাগলের মতো নাচতে লাগল—একজন অতিথি আর একজনকে জড়িয়ে ধরে ঘরের

মেঝেয় কুস্তি লড়তে লাগল, আর তিন নম্বর অতিথি হঠাৎ তেড়ে গিয়ে শিরিং সাহেবের কুকুরটার ল্যাজে ঘ্যাঁক্ করে কামড় দিলে।

পচামামা বুঝতে পারল, গতিক সুবিধের নয়! তার সুধা যেমনই হোক—খেয়ে এদের খুব আরাম লাগেনি। আর মনে পড়ল, শিরিং সাহেবের কুকুরিটাও নেহাত চালাকি নয়। কাজেই—

'থাকিতে চরণ, মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা—' পচামামা দে-দৌড়! সারাদিন দৌড়োল, তারপর সন্ধেবেলা এক গভীর বনের ভেতর একটা ভাঙা মন্দিরে বসে হাঁপাতে লাগল। ভাবল, খুব বেঁচে গেছি এ যাত্রা!

ওদিকে ঘণ্টাতিনেক বাদে মাথা-ফাথা একটু ঠাণ্ডা হলে শিরিং সায়েব হাঁক ছাড়ল: কোথায় সেই জোচ্চোর কেমিস্ট? বিষ খাইয়ে আমাদের মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল! শিগগির তার কান ধরে টেনে নিয়ে আয় এখানে, আমি নিজের হাতে তার মুণ্ডু কাটব!

তক্ষুনি লোক ছুটল চারদিকে।

ওদিকে পচামামা মন্দিরে বসে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা কী হল! সে নিজে বার বার তার আবিষ্কার চেখে দেখেছে, কী তার সোয়াদ—কী তার গন্ধ! রাতারাতি অমন করে সব বদলে গেল কী করে?

হয়েছিল কী, জানিস? পচামারার বাবুর্চিটা ছিল ভীষণ লোভী। সে এক ফাঁকে একটা বোতল থেকে একটু খেয়েই এমন মজে গেছে যে চুপি-চুপি আটটা বোতলই সাফ করে ফেলেছে। তারপরেই তার খেয়াল হয়েছে, সকালে তো শিরিং সাহেব তার গর্দান নেবে! তখন করেছে কী, পচামামার এক্সপেরিমেণ্ট টেবিলে যা ছিল—মানে লেবুর রস, চাল-ধোয়া জল, টিংচার

আইডিন, এক শিশি লাল কালি, খানিক ঝোলা গুড় আর বেশ কিছু গঁদের আঠা ঢেলে আটটি বোতল আবার তৈরি করে রেখেছে। আর তাই খেয়েই—

আর পচামামা কিচ্ছুটি বুঝতে পারছে না। সমানে সেই ভাঙা মন্দিরটার ভেতরে বসে মশার কামড় খাচ্ছে, ভয়ে আর শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ভাবছে, রাত্তিরটা কোনমতে কাটলে হয়, তারপর আবার এক দৌড়, মাইল-দশেক পেরুতে পারলেই ভুটান বর্ডার ছাড়িয়ে লঙ্কাপাড়া চা-বাগান—তখন আর তাকে কে পায়!

পচামামা যেখানে বসে আছে, তার দুপাশে ভাঙা মেঝেতে বিস্তর ফুটোফাটা। সেই ফুটো দিয়ে ধীরে ধীরে কয়েকটি প্রাণী মুখ বের করল। কালো কটকটে তাদের রঙ, লম্বা লম্বা ল্যাজের আগা বঁড়শির মতো বাঁকানো, চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। শীতের দিন, ভালো খাওয়া-দাওয়া জোটে না—পেটে বেশ খিদে ছিল তাদের। ওদিকে পচামামার কোটের পকেট থেকে কেক ডিম ভাজা—এ-সবের বেশ মনোরম গন্ধ বেরুচ্ছে। পালাবার সময় পচামামা টেবিল থেকে যা পেয়েছে দু-পকেট বোঝাই করে নিয়েছিল—বুঝেছিল পরে এসব কাজে লাগবে।

সুড়সুড় করে দু-দিকের পকেটে তারা একে একে ঢুকে পড়ল। খাবারের ধ্বংসাবশেষ কিছু ছিল, তাই খেতে লাগল একমনে। পচামামা উদাস হয়ে বসে ছিল, এসব ব্যাপার সে কিচ্ছুই টের পেল না।

হঠাৎ তার মুখের ওপর টর্চের আলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়া ভাষায় কে যেন বললে, এই যে, পাওয়া গেছে!

আর একজন বললে, এবার কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল। সকালে শিরিং সাহেব ওর মুণ্ডু কাটবে!

পচামামার রক্ত জল হয়ে গেল! সামনে দৈত্যের মতো জোয়ান দুই ভুটিয়া। কোমরে চকচকে কুকৃরির খাপ। অন্ধকারেও পচামামা দেখল, তার মুখের ওপর টর্চ ফেলে ঝকঝকে দাঁতে হাসতে হাসতে তারা তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

পচামামা দাঁড়িয়ে পড়ল। পালাবার পথ বন্ধ। তবু মরিয়া হয়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল: সাবধান—এগিয়ো না, আমার দুই পকেটেই রিভলভার আছে!

—হাঃ—হাঃ—রিভলভার!—দুই মূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল পচামামার ওপর। পচামামা কিছু বলবার আগেই দু-জনের দুটো ডান হাত তাকে জাপটে ধরল, আর দুটো বাঁ হাত তার দু-পকেটে রিভলভার খুঁজতে লাগল।

আর—তক্ষুনি দুই জোয়ানের গগনভেদী আর্তনাদ! পচামামাকে ছেড়ে দিয়ে তারা সোজা মেঝের ওপর গড়াতে লাগল: ওরে বাপরে, মেরে ফেলেছে রে—গেলুম—গেলুম—

ঠিক তখন বনের ভেতর দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ল। সেই আলোয় পচামামা দেখল, দুজনের হাতেই এক এক জোড়া করে কালো কদাকার পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে লটকে আছে, আর তার নিজের পকেটের ভেতরে সমানে আওয়াজ উঠছে খড়র-খড়র—

—উরিঃ দাদা!

পচামামা একটানে গায়ের কোটটা ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর ওদের পড়ে-থাকা টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়—দৌড়——রাম দৌড়! সকালের জন্যেও অপেক্ষা করতে হল না, একটা চিতাবাঘের পিঠের ওপর হাই জাম্প দিয়ে, একটা পাইথনের ল্যাজ মাড়িয়ে, ডজন পাঁচেক শেয়ালকে আঁতকে দিয়ে রাত নটার

সময় যখন লঙ্কাপাড়া চা বাগানে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল, তখন তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

বুঝলি ক্যাবলা, এই হল আসল পাহাড়ী কাঁকড়াবিছের গল্প। দুটো অমন বাঘা জোয়ানকে ধাঁ করে শুইয়ে দিলে। তোর কলকাতার কাঁকড়াবিছে ওদের কিছু করতে পারত? রামো—রামো!

টেনিদা থামল।

ক্যাবলা মাথা চুলকোতে লাগল। হাবুল বললে, একটা কথা জিগাইমু টেনিদা?

টেনিদা হাবুলের কথা নকল করে বললে, হ, জিগাও।

—কাঁকড়াবিছায় কেক-বিস্কুট-ডিমভাজা খায়?

—এ তো আর তোর কলকাত্তিয়া নয়, পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে। ওদের মেজাজই আলাদা। আমার কথা বিশ্বাস না হয় পচামামাকে জিজ্ঞেস কর্।

—তেনারে পামু কই?

টেনিদা বললে, ধ্যাধ্যেড়ে কালীকেষ্টপুরে।

আমি জানতে চাইলুম: সে কোথায়?

টেনিদা বললে খুব সোজা রাস্তা। প্রথমে আমতা চলে যাবি। সেখান থেকে দশ মাইল দামোদরে সাঁতার কাটবি। তারপর ডাঙায় উঠে চল্লিশ মাইল পঁচাত্তর গজ সাড়ে এগারো ইঞ্চি হাঁটলেই ধ্যাধ্যেড়ে কালীকেষ্টপুরে পৌঁছে যাবি। আচ্ছা, তোরা তাহলে সেখানে রওনা হয়ে যা, আমি এখন একবার পিসিমার বাড়িতে চললুম। টা-টা—

বলেই হাত নেড়ে লাফিয়ে পড়ল রক থেকে, ধাঁ করে হাওয়া হয়ে গেল।

সাঙ্ঘাতিক !

সাতদিন পরেই পরীক্ষা। আর কী ? সেই কালান্তক স্কুল-ফাইন্যাল।

পর-পর দুবার সাদা কালিতে আমার নাম ছাপা হয়েছে। তিন বারের পরও যদি তাই ঘটে—তাহলে বড়দা শাসিয়েছে আমাকে সোদপুরে রেখে আসবে।

—সোদপুরে তো গান্ধীজী এসে থাকতেন। আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম।

—তুমি থাকবে। বড়দা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, তবে গান্ধীজী যেখানে থাকতেন সেখানে নয়। তিনি যাদের দুধ খেতেন তাদের আস্তানায়।

—মানে ?

—মানে পিঁজরাপোলে।

আমি ব্যাজার হয়ে বললাম, পিঁজরাপোলে কেন থাকতে যাব ? ওখানে কি মানুষ থাকে ?

—মানুষ থাকে না গরু-ছাগল তো থাকে। সেইজন্যেই তো তুই থাকবি, কচি-কচি ঘাস খাবি আর ব্যা-ব্যা করে ডাকবি।

শুনে মনটা এত খারাপ হল যে কী বলব ! একদিন সন্ধে-বেলা গড়ের মাঠে গিয়ে চুপি চুপি একমুঠো কাঁচা ঘাস খেয়ে দেখলাম—যাচ্ছেতাই লাগল। ছাদে গিয়ে একা-একা ব্যা-ব্যা করেও ডাকলাম, কিন্তু ছাগলের মতো সেই মিঠে প্রাণ-কাড়া আওয়াজটা কিছুতেই বেরুল না।

তাই ভারি দুশ্চিন্তায় পড়লাম। গিয়ে বললাম লীডার টেনিদাকে।

টেনিদার অবস্থা আমার মতোই। এবার নিয়ে ওর চারবার হবে। হাবুল সেনের দ্বিতীয় বার। শুধু হতভাগা ক্যাবলাটাই লাফে লাফে ফার্স্ট হয়ে এগিয়ে আসছে—তিন ক্লাশ নিচে ছিল, ঠিক ধরে ফেলেছে আমাকে। এর পরে যদি টপকে চলে যায়—তাহলে সত্যিই পিঁজরাপোলে যেতে হবে।

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা আতা খাচ্ছিল। গভীর-ভাবে চিন্তা করতে গিয়ে গোটাকয়েক বিচি খেয়ে ফেলল। তারপর অন্যমনস্কভাবে, খোসাটা যখন অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, তখন সেটাকে থু—থু করে ফেলে দিয়ে বললে, ইউরেকা! হয়েছে!

—কী হয়েছে?

—প্ল্যানচেট।

—প্ল্যানচেট কাকে বলে?

টেনিদা বললে, তুই একটা গাধা! প্ল্যানচেট করে ভূত নামায়—জানিসনে?

এর মধ্যেই কোত্থেকে পাঁটার ঘুগনি চাটতে চাটতে ক্যাবলা এসে পড়েছে। বলল, উঁহু, ভুল হল। ওর উচ্চারণ হবে প্লাঁসেৎ।

—থাম্-থাম্—বেশি ওস্তাদি করিস নি! ভূতের আবার শুদ্ধ উচ্চারণ! তারা তো চন্দ্রবিন্দু ছাড়া কথাই কইতে পারে না—বলেই ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে ঘুগনির পাতাটা কেড়ে নিলে টেনিদা।

ক্যাবলা হায়-হায় করে উঠল। টেনিদা একটা বাঘাটে

হুঙ্কার করে বললে, থাম্, চিল্লাসনি! এ হল তোর ধৃষ্টতার শাস্তি! বলতে বলতে জিভের এক টানে ঘুগনির পাতা একদম সাফ।

ভেবেছিলাম আমাকেও একটু দেবে—কিন্তু পাতার দিকে তাকিয়ে বুকভরা আশা একেবারে ধুক করে নিবে গেল। বললাম, মরুকগে প্ল্যানচেট আর প্ল্যাঁসেৎ—কিন্তু ওসব ভুতুড়ে কাণ্ড আবার কেন? ভূত-টুত আমার একেবারেই পছন্দ হয় না!

টেনিদা হেঁ-হেঁ করে বললে, আছে রে গোমুখ্যু, আছে! সবাই কি আর তালগাছের মতো হাত বাড়িয়ে ঘাড় মটকে দেয়? ওদের মধ্যেও ছু-চারটে ভদ্দর লোক আছে। তারা পরীক্ষার কোশ্চেন-টোশ্চেন বলে দেয়।

—অ্যাঁ?

—তবে আর বলছি কী! টেনিদা এবার শালপাতার উল্টো দিকটা একবার চেটে দেখল। কিছু পেলে না—তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর পাতাটা ছুড়ে দিলে। বললে, আমার বিরিঞ্চিমামা কিছুতেই আর বি. এ. পাশ করতে পারে না। গুণে গুণে আঠারো বার গাড্ডা খেল। শেষকালে যখন আমার মামাতো ভাই গুবরে বি. এ. ক্লাসে উঠল, তখন বিরিঞ্চিমামার আর সইল না। প্ল্যানচেটে বসল। আর বললে পেত্যয় যাবি না প্যালা—টপ্ টপ্ করে কোশ্চেন-পেপার এসে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর।

—পরীক্ষার পরে না আগে? রোমাঞ্চিত হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

—দূর উল্লুক! পরে হবে কেন রে, একমাস আগে।

হঠাৎ ক্যাবলা একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল:

—আচ্ছা টেনিদা—সবশুদ্ধ তোমার কটা মামা ?

—অত খবরে তোর দরকার কী রে গর্দভ ? পুলিশ কমিশনার থেকে পকেটমার পর্যন্ত সারা বাংলা দেশে আমার যত মামা, তাদের লিস্‌টি করতে গেলে একটা গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকা হয়ে যায়—তা জানিস ?

—ছাড়ান দ্যাও—ছাড়ান দ্যাও ! বললে হাবুল সেন।

আমি বললাম, আমাদের অঙ্কের কোশ্চেন যে করেছে সে কি তোমার মামা হয় নাকি ?

—কে জানে, হতেও পারে ! টেনিদা তাচ্ছিল্য করে জবাব দিলে।

—তাহলে তাকেই প্ল্যানচেটে ডাকো না !

—চুপ কর্ বেল্লিক ! জ্যান্ত মানুষ কি কখনো প্ল্যানচেটে আসে ? ভূতকে ডাকতে হয়। ভূতের অসীম ক্ষমতা—যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তেমন-তেমন ভূত যদি আসে—ব্যাস—মার দিয়া কেল্লা !

—বেশ তো—আনো না তবে ভূতকে ! আমি অনুনয় করলাম।

—বললেই হল ? টেনিদা প্রায় ভূতের মতো দাঁত খিচোল : ভূত কি চানাচুরওলা যে ডাকলেই আসবে ? তার জন্যে হ্যাপা আছে না ? অন্ধকার ঘর চাই—টেবিল চাই—চারজন লোক চাই—

ক্যাবলার চোখদুটো মিট-মিট করছিল। বললে, ঠিক আছে। আমাদের গ্যারেজের পাশে একটা অন্ধকার ঘর আছে—একটা পা-ভাঙা টেবিল আমি দেব, আর চারমূর্তি আমরা তো আছিই।

টেনিদা বললে, বাঃ, গ্র্যাণ্ডি! শুনে এত ভালো লাগছে যে তোর পিঠে আমার তিনটে চাঁটি মারতে ইচ্ছে করছে!

ক্যাবলা একলাফে রোয়াক থেকে নেমে পড়ল। বললে, তাহলে আজ রাত্রেই?

টেনিদা বললে, হ্যাঁ—আজ রাত্রেই।

আমার কেমন যেন সুবিধে মনে হচ্ছিল না। ভুত-টুত কেমন যেন গোলমেলে ব্যাপার! কিন্তু সাতদিন পরেই যে স্কুল ফাইন্যাল! আর তার দেড়মাস বাদেই পিঁজরাপোল!

অগত্যা নাক-টাক চুলকে আমায় রাজি হয়ে যেতে হল।

বাড়ির পেছনে গ্যারাজ—এমনি ঘুরঘুট্‌টি অন্ধকার সেখানে! গ্যারাজের পাশের ছোট টিনের ঘরটা যেন ভুষো কালি মাখানো। গিয়ে দেখি ক্যাবলা সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে। একটা পায়া-ভাঙা টেবিল। তার চারদিকে চারটে চেয়ার। একটু দূরে লম্বা দড়ির সঙ্গে ছোট একটা বস্তা ঝুলছে। টেবিলের ওপর ক্যাবলা একটা মোমবাতি জেলে রেখেছিল—তার আলোতেই সব দেখতে পেলাম।

বস্তাটা দেখিয়ে হাবুল বললে, ওইটা কী ঝুল্যা আছে রে! খাওন-দাওনের কিছু আছে নাকি?

টেনিদা বললে, পেট-সর্বস্ব সব—খালি খাওয়াই চিনেছে! ওটা বক্‌সিংয়ের বালির বস্তা।

—ভূত আইস্যা ওইটা লইয়া বক্‌সিং কোরবো নাকি? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

টেনিদা বললে, থাম্—এখন বেশি বাজে বকিসনি! এবার কাজ শুরু করা যাক। হ্যাঁরে ক্যাবলা—এদিকে কেউ এখন আসবে না তো?

—না, সে ভয় নেই।

—তবে দরজা বন্ধ করে দে।

ক্যাবলা দরজা বন্ধ করে দিলে। টেনিদা বললে, চারজনে চারটে চেয়ারে বসব আমরা। আলো নিবিয়ে দেব। তারপরে ধ্যান করতে থাকব।

—ধ্যান? কিসের ধ্যান?—আমি জানতে চাইলাম।

—ভূতের। মানে অঙ্কের কোশ্চেন বলে দিতে পারে—এমন ভূতের।

হাবুল বললে, সেইডা মন্দ কথা না। হারু পণ্ডিতেরে ডাকন যাউক!

হারু পণ্ডিত! শুনে আমার বুকের ভেতরে একেবারে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তিন বছর আগে মারা গেছেন হারু পণ্ডিত। দুর্দান্ত অঙ্ক জানতেন। তার চাইতেও জানতেন দুর্দান্তভাবে পিটতে। একটা চৌবাচ্চার নল দিয়ে জল-টল ঢোকার কি সব অঙ্ক দিতেন; আমরা হাঁ করে থাকতাম আর পটাৎ পটাৎ গাঁট্টা খেতাম। সেই হারু পণ্ডিতকে ডাকা!

আমি বললাম, বড্ড মারত যে!

—এখন আর মারবে না। ভূত হয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে। তা ছাড়া কেউ তো ডাকে না—আমরা ডাকলে কত খুশি হবে দেখিস। শুধু অঙ্ক কেন—চাই কি আদর করে সব কোশ্চেনই বলে দেবে! টেনিদা আমাকে উৎসাহিত করলে।

ক্যাবলা বললে, তবে ধ্যানে বসা যাক।

আমি বললাম, হাঁ ভাই, একটু তাড়াতাড়ি! বেশি দেরি হয়ে গেলে বড়দা কান পৌঁচিয়ে দেবে। আমি বলে এসেছি—ক্যাবলার কাছে অঙ্ক কষতে যাচ্ছি।

টেনিদা বললে, আমি আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তার আগে শেষ কথাগুলো বলে নিই। সবাই হারু পণ্ডিতকে ধ্যান করবি এক মনে এক প্রাণে। সেই দাড়ি—সেই ডাঁট-ভাঙা চশমা, সেই—টাক—সেই নস্যি নেওয়া—

ক্যাবলা বললে, সেই গাঁট্টা।

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, চুপ্, বাজে কথা এখন বন্ধ। শুধু ধ্যান। এক মনে এক প্রাণে। শুধু প্রার্থনা: স্যার—দয়া করে একবার আসুন—আপনার অধম ছাত্রদের পরীক্ষার কোশ্চেন-গুলো বলে দিয়ে যান! আর কিছু না—আর কোন কথা নয়। আচ্ছা আমি আলো নেবাচ্ছি। ওয়ান—টু—থ্রী—

টুক্ করে আলো নিবে গেল।

বাপ্স্ কী, অন্ধকার! যেন দম আটকে যায়! ভয়ে আমার গা শির্-শির্ করতে লাগল, ধ্যান করব কী ছাই!

তবু ধ্যানের চেষ্টা করা যাক। কিন্তু কী যাচ্ছেতাই মশা এ ঘরে! পা দুটো একেবারে ফুটো করে দিচ্ছে! অনেকক্ষণ দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে থেকে আর পারা গেল না। চটাস্ করে একটা চাঁটি মারলাম।

কিন্তু একি! পায়ে চাঁটি মারলাম—কিন্তু লাগল না তো? আমার পা কি একেবারে অসাড় হয়ে গেছে? আর আমার পাশ থেকে হাবুল তখনই হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল: অ টেনিদা, ভূতে আমার পায়ে ঠাঁই কইর‍্যা একটা চোপাড় মারছে!

টেনিদা বললে, শাট্ আপ! ধ্যান করে যা।

—কিন্তু আমারে যে চোপাড় মারল!

—ধ্যান না করলে আরো মারবে। চোখ বুজে বসে থাক্।

আমি একদম চুপ। এঃ হেঁ-হে—ভারি ভুল হয়ে গেছে! অন্ধকারে নিজের ঠ্যাং ভেবে হাবুলের পায়েই চড় মেরে দিয়েছি।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। ধ্যান করবার চেষ্টা করছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হারু পণ্ডিতের টাক আর দাড়িটা বেশ ভাবতে পারছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গাঁট্টাটাও বিচ্ছিরিভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি ধ্যান বন্ধ করে দিচ্ছি। ওদিকে আবার দারুণ ক্ষিদে পাচ্ছে। আসবার সময় দেখেছি—রান্নাঘরে মাংস চেপেছে। এতক্ষণে হয়েও গেছে বোধহয়। বাড়িতে থাকলে ঠাকুরের কাছে গিয়ে এক-আধটু চাখতে-টাখতেও পারতাম। যতই ভাবি, খিদেটা ততই যেন নাড়ির ভেতর পাক খেতে থাকে।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে রব উঠল : ব্যা-ব্যা-ব্যা—অ্যা-অ্যা—

কী সর্বনাশ! ধ্যান করতে করতে শেষকালে পাঁটার আত্মা ডেকে আনলাম নাকি! এতক্ষণ যে মাংসের কথাই ভাবছিলাম!

আমার পাশ থেকে হাবুল কাঁপা গলায় বললে, অ টেনিদা—পাঠা ভূত!

অন্ধকারে টেনিদা গর্জন করলে : যেমন তোরা পাঁটা—পাঁটা-ভূত ছাড়া আর কী আসবে তোদের কাছে!

ক্যাবলা খিক-খিক করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার শোনা গেল : ভ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—

টেনিদা বললে, অমন কত আসবে! ধ্যানে বসলে সবাই আসতে চায় কিনা! এখন কেবল একমনে জপ করে যা—পাঁটা-ভূত, তুমি চলে যাও, স্বর্গে গিয়ে ঘাস খাও। আমরা

শুধু হারু পণ্ডিতকে চাই। সেই টাক, সেই দাড়ি—সেই নস্যির ডিবে—আমাদের সেই স্যারকেই চাই। আর কাউকে না—কাউকেই না—

পাঁটা ভূতকে আমি যে ডেকে ফেলেছি সেটা চেপে গেলাম। কিন্তু আমার পায়ে ওটা কী সুড়সুড়ি দিয়ে গেল? প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ টের পেলাম—আরসোলা।

খিদেটা ভুলে গিয়ে প্রাণপণে স্যারকে ডাকতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ধ্যানের জো আছে? ঘচাং করে কে যেন আমার পায়ে ল্যাং মারল।

—টেনিদা, ভূতে ল্যাং মারছে আমাকে—আমি আর্তনাদ করলাম।

হাবুল বলে উঠল: আঃ—খামাখা গাধার মতন চ্যাঁচাস ক্যান? আমার পা-টা হঠাৎ লাইগ্যা গেছে!

টেনিদা দাঁত কিড়মিড় করে উঠল: উঃ—এই গাড়োল-গুলোকে নিয়ে কি ধ্যান হয়? তখন থেকে সমানে ডিসটার্ব করছে! এবার যে একটা কথা বলবে, তার কান ধরে সোজা বাইরে ফেলে দেব!

আবার ধ্যান শুরু হল।

প্রায় হারু পণ্ডিতকে ধ্যানের মধ্যে এনে ফেলেছি। এলো, এলো—এসেই পড়েছে বলতে গেলে! টাকটা প্রায় আমার চোখের সামনে—মনে হচ্ছে যেন দাড়ির সুড়সুড়ি আমার মুখে এসে লাগছে। এক মনে বলছি: দোহাই স্যার, স্কুল ফাইন্যাল স্যার—অঙ্কের কোশ্চেন স্যার!—আর ঠিক তক্ষুনি—

কেমন একটা বিটকেল শব্দ হল মাথার ওপর।

চমকে তাকাতে দেখি, টিনের চালের গায়ে দুটো জ্বলজ্বলে

চোখ। ঠিক যেন মোটা-মোটা চশমার আড়াল থেকে হারু পণ্ডিত আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। আমার পালাজ্বরের পিলেটা সঙ্গে সঙ্গে তড়াং করে লাফিয়ে উঠল!

—ও কী—ও কী টেনিদা!—আমি আবার আর্তনাদ করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বলন্ত চোখদুটো যেন শূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আর আমার মাথায় এসে লাগল এক রাম-চাঁটি! ভূত হয়ে সে চাঁটি মোলায়েম হওয়া তো দূরে থাক—আরো মোক্ষম হয়ে উঠেছে।

—বাপ্‌রে গেছি—বলে আমি প্রচণ্ড এক লাফ মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল উলটে পড়ল।

—খাইছে—খাইছে—ভূতে খাইছে রে—হাবুল কেঁদে উঠল।

—টেবিল চাপা দিয়ে আমায় মেরে ফেলে দিলে রে—টেনিদার চিৎকার শোনা গেল।

অন্ধকারে আমি দরজার দিকে ছুটে পালাতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন আমার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ল। আমার গলা দিয়ে 'গ্যাঁ—ঘোঁক্'—বলে একটা আওয়াজ বেরুলো—আর তার পরেই—সর্ষে ফুল! ঝিঁঝির ডাক! পটলডাঙার প্যালারাম একেবারে ঠায় অজ্ঞান।

চোখ মেলে দেখি, মেঝেয় পড়ে আছি। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে, আর ক্যাবলা আমার মাথায় জল দিচ্ছে। চেয়ার টেবিলগুলো ছত্রাকার হয়ে আছে ঘরময়।

আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত!

ক্যাবলা বললে, না—ভূত নয়। টেনিদা আর হাবুল তক্ষুনি পালিয়েছে বটে, কিন্তু তোকে চুপি চুপি সত্যি কথা বলি। ঘরটার পেছনেই একটা ছাগল বাঁধা আছে। দাদুর

হাঁপানির রোগ আছে কিনা, ছাগলের দুধ খায়। সেই ছাগলটাই ডাকছিল।

—আর সেই জ্বলজ্বলে চোখ? সেই চাঁটি?

—হুলোর।

—হুলো কে?

—আমাদের বেড়াল। এ ঘরে প্রায়ই ইঁদুর ধরতে আসে।

—কিন্তু হুলো কি অমন চাঁটি মারতে পারে?

—চাঁটি মারবে কেন রে বোকা? তুই চ্যাঁচালি—ভয় পেয়ে হুলোও চাল থেকে লাফ দিলে। পড়বি তো পড় ছোড়দার স্যাণ্ডব্যাগের ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা দোল খেয়ে এসে তোর মাথায় লাগল—তুই ভাবলি হারু পণ্ডিতের গাঁট্টা—ক্যাবলা হেসে উঠল।

—আর আমার ঘাড়ে অমন করে লাফিয়ে পড়ল কে?

—হাবলা। ভয় পেয়ে বেরুতে গিয়ে তোকে বিধ্বস্ত করে চলে গেছে।—ক্যাবলা হেসে উঠল আবার।

আমি আবার চোখ বুজোলাম। ক্যাবলার কথাই হয়ত ঠিক। কিন্তু আমার মন বলছে—ওই হুলো আর বালির বস্তার মধ্য দিয়ে সত্যি-সত্যিই হারু পণ্ডিতের মোক্ষম চাঁটি আমার মাথায় এসে লেগেছে।

কারণ, পৃথিবীতে অমন দুর্মদ চাঁটি আর কেউ হাঁকড়াতে পারে না। আর কিছুতেই না।

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি একটা পাকা আমকে কায়দা করতে চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ খেতে হল না। গোটা-চারেক কামড় দিয়েই ফেলে দিতে হল—অ্যায়সা টক! দাঁতগুলো শির্-শির্ করতে লাগল—মেজাজটা বেজায় খিচড়ে গেল আমার। বাড়িতে মাংস এসেছে দেখেছি—রাত্তিরে জুত করে হাড় চিবুতে পারব কি না কে জানে!

এই সময় কোথেকে পটলডাঙার টেনিদা এসে হাজির। গাঁক-গাঁক করে বললে, এই প্যালা, আমটা ফেলে দিলি যে?

—যাচ্ছেতাই টক! খাওয়া যায় নাকি?

—টক? টেনিদা ধুপ্ করে আমার পাশে বসে পড়ে বললে, টক বলে বুঝি গেরাহ্যি হল না? সংসারে টক যদি না থাকত, তাহলে আচার পেতিস কোথায়? টক যদি না থাকত তাহলে কী করে দই জমত? টক যদি না থাকত তাহলে চালকুমড়োর সঙ্গে কামরাঙার তফাত কী থাকত? টক যদি না থাকত তাহলে পিঁপড়েরা কী করে টক-টক হত? টক না থাকলে—

টক না থাকলে পৃথিবীতে আরো অনেক অঘটন ঘটত—কিন্তু সে-সবের লম্বা লিস্টি শোনবার মতো উৎসাহ আমার ছিল না। আমি বাধা দিয়ে বললুম, তাই বলে অত টক আম কোন ভদ্দরলোক খেতে পারে নাকি?

আমের গন্ধে কোথেকে একটা মস্ত নীল রঙের কাঁঠালে-

মাছি এসেছে, সেটা শেষতক টেনিদার খাঁড়ার মতো মস্ত নাকটার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। আমার কথা শুনে টেনিদার সেই পেল্লায় নাকের ভেতর থেকে রণ-ডম্বরুর মতো একটা বিদঘুটে আওয়াজ বেরুলো। মাছিটা শূন্যে বার-দুই ঘুরপাক খেয়ে বোঁ করে মাটিতে পড়ে গেল—ভিমি খেল না হার্টফেলই করল কে জানে?

টেনিদা বললে, ইস্-স্-স্! খুব যে ভদ্দর লোক হয়ে গেছিস দেখছি! তবু যদি পালা জ্বরে ভুগে দু-বেলা পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল না খেতিস! তুই কি আমার গাবলুমামার চাইতেও ভদ্দরলোক? জানিস, গাবলুমামা এখনো চারশো টাকা মাইনে পায়?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, জেনে আমার লাভ কী? তোমার গাবলুমামা তো আমায় টাকা ধার দিতে যাচ্ছে না?

—তোর মতো অখাদ্যিকে টাকা ধার দিতে বয়ে গেছে গাবলুমামার! টেনিদার নাক দিয়ে আবার একটা আওয়াজ বেরুলো: জানিস—তিনবার-আই. এ.-ফেল-করা গাবলু মামা অতো বড় চাকরিটা পেলো কী করে? স্রেফ টক আমের জন্যে।

—টক আমের জন্যে? আমি হাঁ করে রইলুম: টক আম খেলে বুঝি ওইরকম চাকরি হয়?

—খেলে নয় রে গাধা—খাওয়ালে। তবে, তাক বুঝে খাওয়াতে জানা চাই। বলছি তোকে ব্যাপারটা—অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবি। তার আগে গলির মোড় থেকে দু-আনার ডালমুট নিয়ে আয়।

জ্ঞানলাভ করতে চাই আর না চাই, টেনিদা যখন একবার

ডালমুট খেতে চেয়েছে—তখন খাবেই। পকেটে পয়সা থাকলেই ও ঠিক টের পায়। কী করি, আনতেই হল ডালমুট।

—তুই পেটরোগা, এসব তোর খেতে নেই—বলে হ্যাঁচকা টানে টেনিদা ঠোঙাটা কেড়ে নিলে। আমি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। খেতে যখন দেবে না, তখন বেশ করে নজর দিয়ে দিই। পরে টের পাবে।

টেনিদা ভ্রূক্ষেপ করলে না। বললে, তবে শোন্। আমার মামার বাড়ি কোথায় জানিস তো? খড়্গপুরে। সেই যে খড়্গপুর—যেখানে রেলের অনেক ইঞ্জিন-টিঞ্জিন আছে?

সেবার গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেছি। ওই যে একটা ছড়া আছে না—'মামাবাড়ি ভারি মজা—কিল চড় নাই'? কথাটা একদম বোগাস—বুঝলি? কক্ষনো বিশ্বাস করিসনি!

অবিশ্যি মামাবাড়িতে ভালো লোক একেবারে নেই তা নয়। দিদিমা—দাদু এরা বেশ খাসা লোক। বড়মামীরাও মন্দ হয় না। কিন্তু ওই গাবলুমামা-টামা, বুঝলি, ওরা ভীষণ ডেঞ্জারাস হয়!

বললে বিশ্বাস করবি নে, সাতদিনের মধ্যে গাবলুমামা দুবার আমার কান টেনে দিলে। এমন কিছু করিনি, কেবল একদিন ওর ঘড়িটায় একটু চাবি দিয়েছিলুম—তাতে নাকি স্প্রিংটা কেটে গিয়েছিল। আর-একদিন ওর শাদা নাগরাটা কালো কালি দিয়ে একটু পালিশ করেছিলুম, আর নেটের মশারিতে কাঁচি দিয়ে একটা গ্র্যাণ্ড জানলা বানিয়ে দিয়েছিলুম। এর জন্যে দুদিন আমার কান ধরে পাক দিয়ে দিলে। কী ভীষণ ছোটলোক বল্ দিকি!

তা, পড়ে মরুক গাবলুমামা—খড়্গপুরে দিনগুলো আমার

ভালোই কাটছিল। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া—মজাসে ইস্টিশানে রেল দেখে বেড়ানো, হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাঁসাইয়ের পুল পর্যন্ত চলে যাওয়া, সেখানে বেশ চড়ুইভাতি—আরো কত কী! বেশ ছিলুম।

বেশ মনের মতো বন্ধুও জুটে গিয়েছিল একটি। তার ডাক-নাম ঘটা—ভালো নাম ঘটকর্পর। ওর ছোট ভাইয়ের নাম ক্ষপণক, ওর দাদার নাম বরাহ। ওদের বাবা গোবর্ধনবাবুর ইচ্ছে ছিল,—ওদের ন-ভাইকে নিয়ে নবরত্ন-সভা বসাবেন বাড়িতে।

কিন্তু ক্ষপণকের পর আর ভাই জন্মালো না—খালি বোন আর বোন। রেগে গিয়ে গোবর্ধনবাবু তাদের নাম দিতে লাগলেন, জ্বালামুখী, মুণ্ডমালিনী এই সব। এমনকি খনা নাম পর্যন্ত রাখলেন না কারুর।

তা এই তিন রত্নেই যথেষ্ট—একেবারে তিন তিরিখ্খে নয়! এক একটা বিচ্ছু অবতার! আর ঘটা তো একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানির ঘট!

আগে কি আর বুঝতে পেরেছিলুম? তাহলে ঘটার ত্রিসীমানায় কে যায়! ওর ঠাকুরমার ভাঁড়ার থেকে আচার-টাচার চুরি করে এনে আমায় খাওয়াতো—আমি ভাবতুম অমন ভালো ছেলে বুঝি দুনিয়ায় আর হয় না!

কিন্তু শেষকালে এই ঘটাই আমাকে এমন একখানা লেঙ্গি মেরে দিলে যে কী বলব!

একদিন দুপুরবেলা গাবলুমামা বেশ প্রেম্সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আর আমি দরজার ফাঁক দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছি। একটা ছিপ চাঁছব—গাবলুমামার দাড়ি-কামানোর চকচকে ক্ষুরটা হাত-সাফাই করতে পারলে ভীষণ সুবিধে হয়।

এমন সময় ফিস্‌-ফিস্‌ করে ঘটা আমার কানে কানে বললে, এই টেনি, আম খাবি ?

কেন খাব না—খেতে আর ভয় কী ! আর আমায় জানিস তো প্যালা—খাওয়ার ব্যাপারে কাপুরুষতা আমার একদম বরদাস্ত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে দুহাত তুলে লাফিয়ে উঠে আমি বললুম, কোথায় রে ?

—আমাদের বাগানে।

আমি বললুম, ওরে বাবা !

বলবার কারণ ছিল। গোবর্ধনবাবুর খুব ভালো একটা আমের বাগান আছে—বাছাই বাছাই কলমের আম। ল্যাংড়া, বোম্বাই, মিছরিভোগ—আরো কত কী। দেড় মাইল দূর থেকেও আমের গন্ধে জিভে জল আসে। কিন্তু কাছে যায় সাধ্যি কার ! যমদূতের মতো একটা অ্যায়সা জোয়ান মালী রাতদিন খাড়া পাহারা দিচ্ছে সেখানে। একটু উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছ কি সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়বে, ইখানে হৈচ্ছে কী ? ও-সব চলিবেনি ! না পালাইছ তো পিট্টি খাইছ !

ঘটা বললে, কিছু ঘাবড়াসনি—বুঝলি ? আজ জামাইষষ্ঠি কিনা—মালী এবেলা শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভালোমন্দ খেয়ে-দেয়ে সন্ধের পর ফিরবে। আজকেই সুযোগ !

অমন জাঁদরেল মালীরও শ্বশুরবাড়ি থাকে—আমার বিশ্বাসই হল না। ঘটা বললে, সত্যি বলছি টেনি ! চল্‌ না বাগানে—গেলেই বুঝতে পারবি।

গেলুম বাগানে। বেগতিক দেখলেই রামদৌড় লাগাবো লম্বা লম্বা ঠ্যাং-দুটো তো আছেই।

গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই। মালীর ঘরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। আর বাগানে ?

গাছভর্তি আম আর আম! তাদের কী রঙ, আর ক্যায়সা খোশবু! মনে হল যেন স্বর্গের নন্দনবনে এসে ঢুকেছি আর চারিদিকে অমৃত ফল ঝুলছে! কিন্তু হলে কী হবে! প্রায় সবগুলো গাছই বিচ্ছিরি-রকমের জাল দিয়ে ঘেরাও করা। ঢিল মারলে পড়বে না—আঁকশিতে নামবে না।

শুধু একদিকে বেঁটে চেহারার একটা গাছে কোন জালই নেই। আর, কী আম হয়েছে সে গাছে! মাটির হাতখানেক কাছাকাছি পর্যন্ত আম ঝুলে পড়েছে। পেকে টুকটুক করছে আমগুলো—লালে আর হলদেতে কী আশ্চর্য তাদের রঙ! দেখেই আনন্দে আমার মূর্ছা যাওয়ার জো হল।

ঘটা বললে, এ আমের নাম হল পেশোয়ার কী আমীর। আমের সেরা! খেলে মনে হবে পেশোয়ারের আঙুর, ভীম নাগের সন্দেশ আর কাশীর চমচম একসঙ্গে খাচ্ছিস। লেগে যা টেনি—

বলবার আগেই লেগে গেছি আমি। চক্ষের নিমেষে টেনে নামিয়েছি গোটা-পনেরো পেশোয়ার কী আমীর। তারপর বেশ টুসটুসে একটা আমে যেই কামড় বসিয়েছি—

সঙ্গে সঙ্গে কী যে হল সে আমার মনে নেই প্যালা! আমি মাথা ঘুরে সেইখানেই বসে পড়লুম। ওরে ব্বাপ্‌স্‌—কী টক! দশ মিনিট ধরে খালি মনে হতে লাগল, আমার দুপাটি দাঁতের ওপর কেউ দমাদম হাতুড়ি ঠুকছে—আমার দুকানে তিরিশটা ঝিঁঝি পোকা কোরাস গাইছে, আমার নাকের ওপর তিন ডজন উচ্চিংড়ি লাফাচ্ছে, আমার মাথার ওপর সাতটা কাঠঠোকরা এক নাগাড়ে ঠুকে চলেছে!

যখন জ্ঞান হল—তখন দেখি দু-ডজন পেশোয়ার কী আমীর সামনে নিয়ে আমি বসে আছি ধুলোর ওপর। ঘটার চিহ্নমাত্র নেই। ঘটকর্পর কর্পূরের মতোই উবে গেছে।

কী শয়তান, কী বিশ্বাসঘাতক! একবার যদি ওকে সামনে পাই, তাহলে ওর নাক খিমচে দেব, কান কামড়ে দেব, পিঠে জলবিছুটি ঘষে দেব, ওর ছুটির টাস্কের সব অঙ্কগুলো এমন ভুল করে রেখে দেব যে ইস্কুলে গেলেই সপাসপ বেত। কিন্তু সে পরের কথা পরে। এখন কী করি!

আমের লোভেই কি না কে জানে, পাটকিলে রঙের মস্ত দাড়িওলা একটা রামছাগল গুটি-গুটি পায়ে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমার সমস্ত রাগ ছাগলটার ওপরে গিয়ে পড়ল। বটে—আম খাবে! দ্যাখো একবার পেশোয়ার কী আমীরকে পরখ করে!

ছাগলে সব খায়—জানিস তো প্যালা? ছাতা খায়, খাতা খায়, হকিস্টিক খায়, জুতো খায়—জুতোবুরুশওয়ালাকেও যে বাগে পেলে খায় না একথা জোর করে বলা যায় না। আমার সেই কামড়-দেওয়া আমটাকেই দিলুম ছুড়ে ওর দিকে।

মাটিতেও পড়তে পেলো না—ক্রিকেট বলেই মতোই আকাশে লাফিয়ে উঠে ছাগলটা আমটাকে লুফে নিলে। তারপর?

—ব্যা—আ-আ—করে গগনভেদী আওয়াজ হল একটা। একটা নয়—যেন সমস্ত ছাগল জাতি একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। তারপরেই টেনে একখানা দৌড় মারল। সে কী দৌড় রে প্যালা! চক্ষের পলকে বাগান পেরুলো, মাঠ পেরুলো, লাফ মারতে মারতে খানা খন্দল পেরুলো। বোধহয় মেদিনীপুরে গিয়েই শেষ-তক সেটা থামল।

আমি জ্বলন্ত চোখে আমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ঘটাকে একটা খাওয়াতে পারলে বুকের জ্বালা নিভত! কিন্তু সেটাকে আর পাই কোথায়? তিন দিনের মধ্যেও তার টিকির ডগাটি পর্যন্ত দেখতে পাব না এটা নিশ্চিত।

তাহলে কাকে খাওয়াই?

নির্ঘাৎ গাবলুমামাকে। দুদিন আমার কানদুটো বেহালার কানের মতো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়েছে। এ আম গাবলুমামারই খাওয়া দরকার।

গোটা-আষ্টেক আম কোঁচড়ে লুকিয়ে ফিরে এলুম।

ভগবান ভরসা থাকলে সবই সম্ভব হয় প্যালা—বুঝলি? বাড়ি ফিরে দেখি ভীষণ হৈ-চৈ! গাবলুমামা কোন্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাকরির চেষ্টায়। দইয়ের ফোঁটা-টোঁটা পরানো হচ্ছে—দিদিমা—বড়মামী—দাদু—সবাই একসঙ্গে দুর্গা দুর্গা—কালী কালী এই সব আওড়াচ্ছেন।

গাবলুমামার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি—কেউ নেই। শুধু টেবিলের ওপর রঙচঙে একটা বেতের ঝুড়ি। তাতে বাছা বাছা সব বোম্বাই আম। ভগবানই বুদ্ধি দিলে রে প্যালা! কেউ দেখবার আগেই আমি ঘরে ঢুকে গোটাকয়েক বোম্বাই সরিয়ে ফেললুম—তার উপর সাজিয়ে দিলুম সাতটা পেশোয়ার কী আমীর—মানে, সাতটা অ্যাটম বম্!

তারপরে গোয়ালঘরে লুকিয়ে বসে সেই বোম্বাইগুলো সাবাড় করছি—দেখি না সেই ঝুড়িটা নিয়ে গাবলুমামা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর দাদু দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমানে 'কালী কালী' বলতে লাগলেন।

এইবার আমার চটকা ভাঙল। অ্যাঁ—ওই আম সাহেবের

কাছে ভেট যাচ্ছে! গাবলুমামার অবস্থা কী হবে ভেবে আমারই তো গায়ের রক্ত জমে গেল! চাকরি তো দূরে থাক—হাড়গোড় নিয়ে গাবলুমামা ফিরতে পারলে হয়! বেশ খানিকটা অনুতাপই হল এবার। ইস্—এ যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল রে!

বললে বিশ্বাস করবিনি প্যালা—ওই আমের জোরেই শেষতক গাবলুমামার চাকরি হয়ে গেল। কী করে? সেইটেই তো আদত গল্প।

যে সায়েবটার সঙ্গে মামা দেখা করতে গেল, তার নাম ডার্কডেভিল। যতটা না বুড়ো হয়েছে—তার চাইতে বেশি ধরেছে বাতে। প্রায় নড়তে-চড়তে পারে না, একটা চেয়ারে বসে রাত-দিন কোঁ কোঁ করছে। তার হাতেই গাবলুমামার চাকরি।

আমের ঝুড়ি নিয়ে গাবলুমামা সায়েবকে সেলাম দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, মাই গার্ডেনস ম্যাংগো স্যার—ভেরি গুড স্যার—ফর ইয়োর ইটিং স্যার—

একদম চালিয়াতি—বুঝলি প্যালা? আমার মামারবাড়ির ধারে-কাছেও আমের গাছ নেই। তবু ও-সব বলতে হয়—গাবলুমামাও চালিয়ে দিলে।

সায়েবটা বেজায় লোভী, তায় রাত-দিন রোগে ভুগে লোভ আরো বেড়ে গিয়েছিল। আমের ঝুড়ি দেখেই সায়েবের নোলা সকসকিয়ে উঠল। তার ওপরে আবার সেই পেশোয়ার কী আমীর—তার যেমন গড়ন, তেমনি রঙ! তক্ষুনি সে ছুরি বের করলে টেবিলের টানা থেকে।

—কাম্ বাবু, হ্যাভ সাম (একটুখানি খাও)—বলেই এক টুকরো সে গাবলুমামার দিকে এগিয়ে দিলে।

—নো স্যার—আই ইট মেনি স্যার,—এইসব বলে গাবলু-মামা হাত-টাত কচলাতে লাগল। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো? ধরেছে যখন—খাইয়ে ছাড়বেই।

অগত্যা গাবলুমামাকে নিতেই হল টুকরোটা। আর মুখে দিয়েই—

—দাদা গো! গেলুম—বলে গাবলু মামা চেয়ার-শুদ্ধ উলটে পড়ে গেল। কষের একটা দাঁত নড়ছিল, সেটাও খসে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

আর সায়েব?

আমে কামড় দিয়েই বিটকেল আওয়াজ ছাড়লে: ও গশ্—ঘোঁয়াক!—তারপরেই তড়াক করে এক লাফে টেবিলে উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মাই গড্—ঘঁ্যাচাৎ!

এই বলে আর-এক লাফ! মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছিল, সায়েব তার একটা ব্লেডকে চেপে ধরলে। তারপর ঘুরন্ত ফ্যানের সঙ্গে শূন্যে ঘুরতে লাগল বাঁই-বাঁই করে।

সে কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড—তোকে কী বলব প্যালা! ঘরের ভেতর নানারকম আওয়াজ শুনে সায়েবের আর্দালি ছুটে এসেছিল। সে সায়েবকে ফ্যানের সঙ্গে বনবনিয়ে ঘুরতে দেখে বললে, রাম-রাম—এ কেইস্যা কাম! বলে সে কাকের মতো হাঁ করে রইল।

আর সেই সময়েই ঘুরন্ত আর উড়ন্ত সায়েবের হাত থেকে পেশোয়ার কী আমীর টুপ্ করে খসে পড়ল। আর পড়বি তো পড় একেবারে আর্দালির হাঁ-করা মুখে!—এ দেশোয়ালী ভাই জান গই রে—বলে আর্দালি পাঁই-পাঁই করে একেবারে ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ল। তখন মাদ্রাজ মেল ইস্টিশান

ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এক লাফে তাতেই উঠে পড়ল আর্দালি, তারপরে পতন ও মূর্ছা। ওয়ালেটেয়ারে গিয়ে নাকি তার জ্ঞান হয়েছিল।

ততক্ষণে গাবলুমামার চটকা ভেঙেছে। মাথার ওপরে সায়েবের বুটের ঠোক্কর কাঁধে এসে লাগতেই গাবলুমামা টেনে ছুট। একদৌড়ে বাড়িতে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল—তারপরেই একশো চার জ্বর, আর তার সঙ্গে ভুল বকুনি ঃ ওই—ওই আম আসছে! আমায় ধরলে!

বাড়িতে তো কান্নাকাটি। আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস! কিন্তু পরের দিন তাজ্জব কাণ্ড! সকালেই সায়েবের দু-নম্বর চাপরাসি গাবলুমামার নামে এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির।

ব্যাপার কী?

না—গাবলুমামার চাকরি হয়েছে। আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরি।

কেমন করে হল? আরে, কেন হবে না? সায়েব তো ফ্যানের ব্লেড থেকে ছিটকে পড়ল। পড়তেই দেখে—আশ্চর্য ঘটনা! সায়েবের দশ বছরের বাত—হাত-পা ভালো করে নাড়তে পারত না—পেশোয়ার কী আমীরের এক ধাক্কাতেই সে বাত বাপ-বাপ করে পালিয়েছে। কাল সারা বিকেল সায়েব মাঠে ফুটবল খেলেছে, আনন্দে সকলকে ভেংচি কেটেছে, বাড়ি ফিরে তার পেল্লায় মোটা মেমসায়েবের সঙ্গে মারামারি করেছে পর্যন্ত।

আর গাবলুমামার জ্বর? তক্ষুনি রেমিশন! দশ বালতি জলে চান করে, ভাত খেয়ে, কোট-পেন্টুলুন পরে গাবলুমামা তক্ষুনি সায়েবকে সেলাম দিতে ছুটল।

বুঝলি প্যালা—তাই বলছিলুম, টক আমকে অচ্ছেদ্দা করতে নেই! জুৎ-মতো কাউকে খাইয়ে দিতে পারলে বরাত খুলে যায়।

ডালমুটের ঠোঙাটা শেষ করে টেনিদা থামল।

—আহা, এমন বাতের ওষুধ! আমি বললুম, সে আম-গাছটা—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা বললে, ও-সব ভগবানের দান রে,—বেশিদিন কি সংসারের থাকে? পরদিনই কালবৈশাখী ঝড়ে গাছটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল।

ডেসিম্যালের পরে আবার একটা ভেস্কুলাম, তার সঙ্গে ভগ্নাংশ। এমন জটিল জিনিসকে সরল করা অন্তত আমার কাজ নয়! পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে সিঙি মাছের ঝোল খাই—এসব গোলমালের মধ্যে পা বাড়িয়ে আমার কী দরকার?

পণ্ডিতমশায় যখন দাঁত খিচিয়ে 'লৃট্-লুঙকে' মাথায় ঢোকবার চেষ্টা করেন, তখন আমি আকুলভাবে 'ঘিন্নুন' আর 'আলু' প্রত্যয়ের কথা ভাবতে থাকি। ওর সঙ্গে যদি 'দাদখানি চাল' প্রত্যয় থাকত—তাহলে আর কোন দুঃখ থাকত না। তবে 'চাঁটি' আর 'গাঁট্টা' প্রত্যয়গুলো বাদ দেওয়া দরকার বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু অঙ্ক আর সংস্কৃতর ধাক্কা যদি বা সামলানো যায়—ক্রিকেট খেলা ব্যাপারটা আমার কাছে স্রেফ রহস্যের খাসমহল। 'ক্রিকেট' মানে কি? বোধহয় ঝিঁঝি। দুপুরের কাটফাটা রোদ্দুরে চাঁদিতে ফোস্কা পড়িয়ে ওসব ঝিঁঝিঁ খেলা আমার ভাল লাগে না। মাথার ভেতরে ঝিঁঝি করতে থাকে আর মনে হয়—মস্ত একটা হাঁ করে কাছে কেউ ঝিঁঝিট খাম্বাজ গাইছে। অবশ্য ঝিঁঝিট খাম্বাজ কী আমার জানা নেই—তবে আমার মনে হয় ক্রিকেট অর্থাৎ ঝিঁঝি খেলার মতোই সেটাও ভয়াবহ।

অথচ কী গেরো ছাখো! পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাকেই ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে। গোড়াতেই কিন্তু

বলে দিয়েছিলাম এসব আমার আসে না। আমি খুব ভাল চিয়ার-আপ্ করতে পারি, দু-এক গেলাস লেমন স্কোয়াশও নয় খাব ওদের সঙ্গে—এমনকি লাঞ্চ খেতে ডাকলেও আপত্তি করব না। কিন্তু ও-সব খেলা—টেলার ভেতরে আমি নেই—প্রাণ গেলেও না !

কিন্তু প্রাণ যাওয়ার আগেই কান যাওয়ার জো ! আমাদের পটলডাঙার টেনিদাকে মনে আছে তো ? সেই খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর রণডম্বরুর মতো গলা—যার চরিত-কথা তোমাদের অনেকবার শুনিয়েছি ? সেই টেনিদা হঠাৎ গাঁক-গাঁক করে তার আধ মাইল লম্বা হাতখানা আমার কানের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—খেলবি নে মানে ? খেলতেই হবে তোকে ! বল করবি —ব্যাট করবি—ফিল্ডিং করবি—ধাঁই করে আছাড় খাবি—মানে যা যা দরকার সবই করবি। সই না করিস, তোর ঐ গাধার মতো লম্বা লম্বা কানদুটো একেবারে গোড়া থেকে উবড়ে নেব—এই পাকা কথা বলে দিলুম !

গণ্ডারের মতো নাকের চাইতে গাধার কান ঢের ভাল। আমি মনে মনে বললাম। গণ্ডারের নাক মানে লোককে গুঁতিয়ে বেড়ানো, কিন্তু গাধার কান ঢের কাজে লাগে—অন্তত চটপট করে মশা-মাছি তো তাড়ানো যায় !

কিন্তু সেই কানদুটোকে টেনিদার হাতে বেহাত হতে দিতে আমার আপত্তি আছে। কী করি, রাজি হয়ে গেলাম।

তা, প্যাণ্ট-ট্যাণ্ট পরতে নেহাত মন্দ লাগে না। বেশ কায়দা করে বুক চিতিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা বললে, তোকে খাসা দেখাচ্ছে প্যালা !

—সত্যি ?

একগাল হেসে ওকে একটা চকোলেট দিতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললে—বেগুন ক্ষেতে কাকতাড়ুয়া দেখেছিস? ঐ যে মাথায় কেলে হাঁড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে? হুবহু তেমনি মনে হচ্ছে তোকে।

আমি ক্যাবলাকে একটা চাঁটি দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তার আর দরকার হল না। হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে—আর তোরে কেমন দেখাইতে আছে? তুই তো বজ্রবাঁটুল—পেণ্টুল পইর‍্যা য্যান চালকুমড়া সাজছস।

ক্যাবলা স্পীকটি নট! একেবারে মুখের মতো! আমি খুশি হয়ে চকোলেটটা হাবুল সেনকেই দিয়ে দিলাম।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন টেনিদার হুকার শোনা গেল—এখানো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যারাণ্ডা ভাজছিস প্যালা? প্যাড পর্—দস্তানা পর্—তোকে আর ক্যাবলাকেই যে আগে ব্যাট করতে হবে।

আমাকে দিয়েই শুরু। পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা ধপাৎ করে লাফিয়ে উঠল একবার।

টেনিদা বললে, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যেই বল আসবে ঠাঁই করে পিটিয়ে দিবি! আয়সা হাঁকড়াবি যে প্রথম বলেই ওভার বাউণ্ডারি—পারবি না?

—পারা যাবে বোধহয়—কান-টান চুলকে আমি জবাব দিলাম।

—বোধহয় নয়, পারতেই হবে। তাড়াতাড়ি যদি আউট হয়ে যাস, তোকে আর আমি আস্ত রাখব না! মনে থাকবে?

এর মধ্যে হাবুল সেন আমার পায়ে আবার প্যাড পরিয়ে দিয়েছে, সেইটে পরে, হাতে ব্যাট নিয়ে দেখি, নড়াচড়া করাই শক্ত!

কাতর স্বরে বললাম: হাঁটতেই পারছি না যে! খেলব কী করে?

—তুই হাঁটতে না পারলে আমার বয়েট গেল! টেনিদা বিচ্ছিরি রকম মুখ ভ্যাংচালো: বল মারতে পারলে আর রান নিতে পারলেই হল।

—বা রে, হাঁটতেই যদি না পারি তবে রান নেব কেমন করে?

—মিথ্যে বকাসনি প্যালা—মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার! হাঁটতে না পারলে দৌড়োনো যায় না? কেন যায় না—শুনি? তাহলে মাথা না থাকলেও কী করে মাথা ব্যথা হয়? নাক না ডাকলেও লোক ঘুমোয় কী করে? যা—যা, বেশি কঁ্যাচম্যাচ করিসনি! মাঠে নেমে পড়্!

একেবারে মোক্ষম যুক্তি।

নামতেই হল অগত্যা। খালি মনে মনে ভাবছি প্যাড-ফ্যাড-শুদ্ধ পড়ে না যাই! ব্যাটটাকে মনে হচ্ছে ভীমের গদার মতো ভারি—আগে থেকেই তো কব্জি টনটন করছে! আমি ওটাকে হাকড়াব না ওটাই আমায় আগে হাঁকড়ে দেবে—সেইটেই ঠাহর করতে পারছি না।

তাকিয়ে দেখি, পেছনে আর দু-পাশে খালি চোরবাগান টাইগার ক্লাব। ওদের সঙ্গেই ম্যাচ কিনা!

কিন্তু এ আবার কী রকম ঝিঁঝি খেলা? ফুটবল তো দেখেছি সমানে সমানে লড়াই—এ ওর পায়ে ল্যাং মারছে—সে তার মাথায় ঢুঁ মারছে—আর বল সিধে এসপার ওসপার করবার জন্যে সেই গোলকীপার দাঁড়িয়ে আছে ঘুঘুর মতো। এ পক্ষের একটা চিত হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও-পক্ষের আর একটা কাত। সে একরকম মন্দ নয়।

কিন্তু এ কী কাপুরুষতা! আমাদের দু-জনকে কায়দা করবার জন্যে ওরা এগার জন! সেইসঙ্গে আবার দুটো আম্-পায়ার! তাদের পেটে পেটে যে কী মতলব তাই বা কে জানে! আম্পায়ারদের গোল-গোল চোখ দেখে আমার তো প্রায় ভ্যামপায়ার বলে সন্দেহ হল।

তারপর লোকগুলোর দাঁড়িয়ে থাকার ধরন দেখ একবার! কেমন নাড়ুগোপালের মতো নুলো বাড়িয়ে উবু হয়ে আছে—যেন হরির লুটের বাতাসা ধরবে! সব দেখে শুনে আমার রীতি-মতো বিচ্ছিরি লাগল।

এই রে—বল ছোড়ে যে! ব্যাট নিয়ে হাঁকড়াতে যাব—প্যাড-ট্যাড নিয়ে উলটে পড়ি আরকি! বলটা কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল দমদম বুলেটের মতো—একটু হলেই কানটা উড়িয়ে নিত। একটা ফাঁড়া তো কাটল! কিন্তু ওকি? আবার ছোড়ে যে!

জয় মা ফিরিঙ্গি পাড়ার ফিরিঙ্গি কালী! যা হোক এবার একটা কিছু হয়ে যাবে! বলি দেবার খাঁড়ার মতো ব্যাটটাকে মাথার উপর তুলে হাঁকিয়ে দিলাম। বলে লাগল না—স্রেফ পড়ল আমার হাঁটুর ওপরে। নিজের ব্যাটাঘাতে বাপ্‌রে বলে বসে পড়তেই দেখি, বলের চোটে স্টাম্প-ফাম্পগুলো কোথায় উড়ে বেরিয়ে গেছে।

—আউট—আউট!

চারদিকে বেদম চিৎকার। আম্পায়ার আবার মাথার ওপরে একটা হাত তুলে জগাই-মাধাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে।

কে আউট হল? ক্যাবলা বোধহয়? আমি তক্ষুনি জানতাম! আমাকে কাকডাড়ুয়া বলে গাল দিয়েছে—আউট না হয়ে যায় কোথায়!

হাঁটুর চোটটা সামলে নিয়ে ব্যাট দিয়ে স্ট্যাম্পগুলো সব ঠিক করতে যাচ্ছি—হঠাৎ হতচ্ছাড়া আম্পায়ার বলে বসল—তুমি আউট, চলে যাও।

আউট? বললেই হল? আউট হবার জন্যেই এত কষ্ট করে প্যাড আর পেণ্টলুন পরেছি নাকি? আবদার গ্যাখো একবার! বয়ে গেছে আমার আউট হতে!

বললাম, আমি আউট হব না। এখন আউট হবার কোন দরকার দেখছি না আমি।

আমি ঠিক বুঝেছিলাম ওরা আম্পায়ার নয়, ভ্যামপায়ার! কুইনিন চিবোবার মতো যাচ্ছেতাই মুখ করে বললেঃ দরকার না থাকলেও তুমি আউট হয়ে গেছ। স্টাম্প পড়ে গেছে তোমার।

—পড়ে গেছে তো কী হয়েছে—আমি রেগে বললাম, আবার দাঁড় করিয়ে দিতে কতক্ষণ? ওসব চালাকি চলবে না স্যার—এখনো আমার ওভার বাউণ্ডারি করা হয় নি!

কেন জানি না, চারদিকে ভারি যাচ্ছেতাই একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। চোরবাগান ক্লাবের লোকগুলোই বা কেন যে এরকম দাপাদাপি করছে, আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

তার মধ্যে আবার চালকুমড়ো ক্যাবলাটা ছুটে এল ওদিক থেকেঃ

চলে যা—চলে যা প্যালা! তুই আউট হয়ে গেছিস।

আর কতক্ষণ ধৈর্য থাকে এ অবস্থায়ঃ আমি চেঁচিয়ে বললাম, তোর ইচ্ছে থাকে তুই আউট হ-গে। আমি এখন ওভার বাউণ্ডারি করব।

আমার কানের কাছে সবাই মিলে তখন সমানে কিচির

মিচির করছে। আমি কান দিতাম না—যদি না কটাং করে আমার কানে টান পড়ত।

তাকিয়ে দেখি—টেনিদা।

ধাঁই করে আমার কাছ থেকে ব্যাট নিয়ে কানে একটা চিড়িং মেরে দিল—তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

—যা—যা উল্লুক! বেরো মাঠ থেকে! খুব ওস্তাদি হয়েছে, আর নয়!

রামছাগলের মতো মুখ করে অগত্যা আমায় চলে যেতে হল। মনে মনে বললাম, আমাকে আউট করা! আউট কাকে বলে সে আমি দেখিয়ে দেব!

গিয়ে তো বসলাম—কিন্তু কী তাজ্জব কাণ্ড! আমাদের দেখিয়ে দেবার আগেই চোরবাগানের টাইগার ক্লাব আউট দেখিয়ে দিচ্ছে! কারুর স্টাম্প উলটে পড়ছে। পেছনে যে লোকটা কাঙালী বিদায়ের মতো করে হাত বাড়িয়ে বসে আছে, সে আবার খুটুস করে স্টাম্প লাগিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা মারবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে বল লুফে নিচ্ছে। খালি আউট—আউট—আউট! এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা!

আমাদের পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব ব্যাট বগলে যাচ্ছে আর আসছে। এমন যে ডাকসাইটে টেনিদা, তারও বল একটা রোগা-পটকা ছেলে কটাং করে কামড়ে নিলে। হবেই তো! এদিকে মোটে দু-জন—ওদিকে এগারো, সেইসঙ্গে আবার দুটো আম্‌-পায়ার। কোন ভদ্দরলোক ঝিঁঝি খেলতে পারে কখনো!

ঐ চালকুমড়ো ক্যাবলাটাই টিকে রইল শেষ-তক। কুড়ি না একুশ রান করল বোধহয়। পঞ্চাশ রান না পেরুতেই পটল-ডাঙা থাণ্ডার ক্লাব বেমালুম সাফ।

এইবার আমাদের পালা। ভারি খুশি হল মনটা। আমরা এগারো জন এবারে তোমাদের নিয়ে পড়ব। আম্‌পায়ার দুটোও দেখি ওদের দল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে ভিড়েছে। কিন্তু ওদের মতলব ভাল নয় বলেই আমার বোধ হল।

ক্যাপ্টেন টেনিদাকে বললাম, আম্‌পায়ারদুটোকে বাদ দিলে হয় না? ওরা নয় ওদের সঙ্গেই ব্যাট করুক?

টেনিদা আমাকে রদ্দা মারতে এল। বললে, বেশি ওস্তাদি করিস নি প্যালা! ওখানে দাঁড়া। একটা ক্যাচ ফেলেছিস কি ঘ্যাঁচ করে কান কেটে দেব! ব্যাট তো খুব করছিস—এবার যদি ঠিকমতো ফিল্ডিং করতে না পারিস, তাহলে তোর পালাজ্বরের পিলে আমি আস্ত রাখব না!

হাবুল সেন বল করতে গেল।

প্রথম বলেই—ওরে বাপরে! টাইগার ক্লাবের সেই রোগা ছোকরাটা কী একখানা হাঁকড়ালে! বোঁ করে বল বেরিয়ে গেল, একদম বাউণ্ডারি। ক্যাবলা প্রাণপণে ছুটেও রুখতে পারলে না।

পরের বলেও আবার সেই হাঁকড়ানি। তাকিয়ে দেখি কামানের গুলির মতো বলটা আমার দিকেই ছুটে আসছে।

একটু দূরেই ছিল আমাদের পাঁচুগোপাল। চেঁচিয়ে বললে, প্যালা—ক্যাচ—ক্যাচ—

—ক্যাচ! ক্যাচ! দূরে দাঁড়িয়ে ওরকম সবাই-ই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করতে পারে! ঐ বল ধরতে গিয়ে আমি মরি আর কি! তার চাইতে বললেই হয়, পাঞ্জাব মেল ছুটছে প্যালা লুফে নে?

মাথা নিচু করে আমি চুপ করে বসে পড়লাম—আবার বল বাউণ্ডারি পার।

হৈ-হৈ করে টেনিদা ছুটে এল।

—ধরলি নে যে ?

—ও ধরা যায় না !

—ধরা যায় না ? ইস—এমন চমৎকার ক্যাচটা, এক্ষুনি আউট হয়ে যেত !

—সবাইকে আউট করে লাভ কী ? তাহলে খেলবে কে ? আমরাই তো আউট হয়ে গেছি—এখন খেলুক না ওরা !

—খেলুক না ওরা !—টেনিদা ভেংচি কাটল—তোর মতো গাড়োলকে খেলায় নামানোই আমার ভুল হয়েছে ! যা—যা—বাউণ্ডারি লাইনে চলে যা !

চলে গেলাম। আমার কী ! বসে বসে ঘাসের শীষ চিবুচ্ছি ! দুটো একটা বল এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, ধরার চেষ্টা করেও দেখলাম। বোঝা গেল, ওসব ধরা যায় না। হাতের তলা দিয়ে যেমন শোল মাছ গলে যায়—তেমনি সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে পিছলে বাউণ্ডারি লাইন পেরিয়ে যেতে লাগল।

আর সাবাস বলতে হবে চোরবাগান টাইগার ক্লাবের ঐ রোগা ছোকরাকে ! ডাইনে মারছে, বাঁয়ে মারছে, চটাং করে মারছে, শাঁই করে মারছে, ধাঁই করে মারছে ! একটা বলও বাদ যাচ্ছে না ! এর মধ্যেই বেয়াল্লিশ রান করে ফেলেছে একাই। দেখে ভীষণ ভাল লাগল আমার। পকেটে চকোলেট থাকলে দুটো ওকে আমি খেতে দিতাম।

হটাৎ বল নিয়ে টেনিদা আমার কাছে হাজির।

—ব্যাটিং দেখলাম, ফিল্ডিংও দেখছি। বল করতে পারবি ?

এতক্ষণ ঝিঁঝি খেলা দেখে আমার মনে হয়েছিল—বল করাটাই সবচেয়ে সোজা। একপায়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম—খুব পারব। এ আর শক্তটা কী ?

—ওদের ঐ রোগাপট্‌কা গোঁসাইকে আউট করা চাই। পারবিনে ?

—এক্ষুনি আউট করে দিচ্ছি—কিছু ভেবো না !

আমি আগেই জানি, আম্‌পায়ারদুটোর মতলব খারাপ। সেই-জন্যেই আমাদের দল থেকে ওদের বাদ দিতে বলেছিলাম—টেনিদা কথাটা কানে তুলল না। যেই প্রথম বলটা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বললে—নো বল !

নো বল তো নো বল—তোদের কী ! বলতেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু গোঁসাই দেখি আবার ধাঁই করে হাঁকড়ে দিয়েছে, বাউণ্ডারি তো তুচ্ছ—একেবারে ওভার বাউণ্ডারি।

আর চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সে কী হাততালি ! একজন তো দেখলাম আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে।

এইবার আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে আগুন জ্বলে গেল। মাথায় টিকি নেই—যদি থাকত, নিশ্চয় তেজে রেফের মতো খাড়া হয়ে উঠত। বটে—ডিগবাজি ! আচ্ছা—দাঁড়াও ! বল হাতে ফিরে পেতেই ঠিক করলাম—এবার গোঁসাইকে একেবারে আউট করে দেব ! মোক্ষম আউট !

প্যাডটা বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে—গোঁসাই পেছন ফিরে সেটা বাঁধছিল। দেখলাম, এই সুযোগ। ব্যাট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালে কিছু করতে পারব না—এই সুযোগেই কর্ণবধ !

মামার বাড়িতে আম পেড়ে পেড়ে হাতের টিপ হয়ে গেছে—আর ভুল হল না। আম্‌পায়ার না ভ্যাম্‌পায়ার হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই বোঁ করে বল ছুড়ে দিলাম।

নির্ঘাত লক্ষ্য ! গোঁসাইয়ের মাথায় গিয়ে খটাং করে বল লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই—'ওরে বাবা !' গোঁসাই মাঠের মধ্যে ফ্ল্যাট !

আউট যাকে বলে! অন্তত এক হপ্তার জন্যে বিছানায় আউট!

আরে—একি, একি! মাঠশুদ্ধ লোক তেড়ে আসছে যে! 'মার মার' করে আওয়াজ উঠছে যে! অ্যাঁ—আমাকেই নাকি?

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কান ঝিঁ-ঝিঁ করছে, প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এবারে টের পাচ্ছি—আসল ঝিঁঝি খেলা কাকে বলে!

গোলটা আমিই দিয়েছি। এখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে ওদের—থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুররে! এখন আমাকে ঘাড়ে করে নাচা উচিত ছিল সকলের। পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভীমনাগের দোকানে কিংবা দেলখোশ রেস্তোরাঁয়। কিন্তু তার বদলে একদল পিনপিনে বিদিকিচ্ছি মশার কামড় খাচ্ছি আমি। চটাস করে মশা মারতে গিয়ে নিজের নাকেই লেগে গেল একটা রাম-থাপ্পড়। একটু উঁ-আঁ করে কাঁদব তারও উপায় নেই। প্যাঁচপেঁচে কাদার ভেতরে কচুবনের আড়ালে মূর্তিমান কানাই সেজে বসে আছি, আর আমার চারি-দিকে মশার বাঁশি বাজছে।

থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম! আবার চিৎকার শোনা গেল। একটা মশা পটাস করে হুল ফোটালো ডান গালে। ধাঁ করে চাঁটি হাঁকালুম—নিজের চড়ে নিজেরই মাথা ঘুরে গেল। অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবুও কখনো এমন চড় হাঁকড়েছেন বলে মনে পড়ল না।

গেছি-গেছি বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাপ-বাপ করে সামলে নিলুম। দমদমার এই কচুবনে আপাতত আরো ঘণ্টাখানেক আমার মৌনতার সাধনা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগে এখান থেকে বেরুবার উপায় নেই আমার।

চিৎকারটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে: থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—পালাজ্বরে ভুগি আর বাসক-পাতার রস খাই। কিন্তু পটলডাঙা ছেড়ে শেষে এই দমদমার কচুবনে আমার পটল তোলবার জো হবে—এ কথা কে জানত !

আমাদের পটলডাঙার থাণ্ডার ফুটবল ক্লাবের আমি একজন উৎসাহী সদস্য। নিজে কখনো খেলি না, তবে সব সময়েই খেলোয়াড়দের প্রেরণা দিয়ে থাকি। আমাদের ক্লাব কোন খেলায় গোল দিলে সাত দিন আমার গলাভাঙা সারে না। হঠাৎ যদি কোন খেলায় জিতে যায়—যা প্রায় কোনদিনই হয় না—তাহলে আনন্দের চোটে আমার কম্প দিয়ে পালাজ্বর আসে।

সদস্য হয়েই ছিলুম ভাল। গোলমাল বাধল খেলোয়াড় হতে গিয়ে।

দমদমার ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ। তিনদিন আগে থেকে ছোটদির ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়ে আমি ধ্রুপদ গাইতে চেষ্টা করছি। গান গাইবার জন্যে নয়—খেলার মাঠে যাতে সারাক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে যেতে পারি—সেই উদ্দেশ্যে। তেতলার ঘর থেকে মেজদা যখন বড় একটা ডাক্তারির বই নিয়ে তেড়ে এল, তারপরেই বন্ধ করতে হল গানটা।

কিন্তু দমদমে পৌঁছেই একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনা গেল।

আমাদের দুই জাঁদরেল খেলোয়াড় ভণ্টু আর ঘণ্টু দুই ভাই। দুজনেই মুগুর ভাঁজে আর দমাদ্দম ব্যাকে খেলে। বলের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেয় অন্য দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে। আজ পর্যন্ত দুজনে যে কত লোকের ঠ্যাং ভেঙেছে তার হিসেব নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবেরই ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাংই একসঙ্গে।

কাশীতে ওদের কুট্টিমামা থাকে। তা থাক—কাশি-সর্দি-পালাজ্বর—যেখানে খুশি থাক। কিন্তু কুট্টিমামা কি আর বিয়ে করবার দিন পেল না? ঠিক আজ দুপুরেই টেলিগ্রামটা এসে হাজির। আর বিশ্বাসঘাতক ভণ্টু আর ঘণ্টু সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে হাওড়া স্টেশনে। থাণ্ডার ক্লাবকে যেন দুটো আণ্ডার-কাট ঘুসি মেরে চিত করে ফেলে দিয়ে গেল!

দলের ক্যাপ্টেন পটলডাঙার টেনিদা বাঘের মতো গর্জন করে উঠল: মামার বিয়ের খ্যাঁট গেলবার লোভ সামলাতে পারলে না! ছোঃ! নরাধম—লোভী—কাপুরুষ! ছোঃ!

গাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের সদস্যেরা তখন বাসি মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে সবাই। ভণ্টু ঘণ্টু নেই—এখন কে বাঁচাবে ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের হাত থেকে? ওদের দুঁদে ফরোয়ার্ড ন্যাড়া মিত্তির দারুণ ট্যারা। আমাদের গোলকীপার গোবরা আবার ট্যারা দেখলে বেজায় ভেবড়ে যায়—কোন্ দিক থেকে যে বল আসবে ঠাহর করতে পারে না। ওই ট্যারা ন্যাড়াই হয়ত একগণ্ডা গোল ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে।

এখন উপায়?

টেনিদার ছোকরা চাকর ভজুয়া গিয়েছিল সঙ্গে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা—মারামারি বাধলে কাজে লাগবে মনে করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টেনিদা কটমট করে খানিকটা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, এই ভজুয়া—ব্যাকে খেলতে পারবি?

ভজুয়া খৈনি টিপছিল। টপ করে খানিকটা খৈনি মুখে পুরে নিয়ে বললে, সেটা ফির কী আছেন ছোটবাবু?

—পায়ের কাছে বল আসবে—ধাঁই করে মেরে দিবি। পারবি না?

—হাঁ খুব পারবে। বল ভি মারিয়ে দিবে—আদমি ভি মারিয়ে দিবে! ভজুয়ার চোখে-মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ।

—না না, আদমিকে মারিয়ে দিতে হবে না। শুধু বল মারলেই হবে। পারবি তো ঠিক?

—কেনো পারবে না?—কাল রাস্তামে একঠো কুত্তা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আইল তো মারিয়ে দিলাম একঠো জোরসে লাথি। এক লরি যাইতেছিল—লাথ্ খাইয়ে একদম উস্‌কো উপর চড়িয়ে গেল। ব্যাস্—সিধা হাওড়া টিশন!

—থাম—থাম—মেলা বকিস নি—টেনিদা একটা নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল: একটা ব্যাক তো পাওয়া গেল! আর একটা—আর একটা—এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমার ওপরে:—ঠিক হয়েছে! প্যালাই খেলবে।

—আমি!

একটা চিনেবাদাম চিবুতে যাচ্ছিলুম, সেটা গিয়ে গলায় আটকালো।

—কেন—তুই তো বলেছিলি, শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে কাদের নাকি তিনটে গোল দিয়েছিলি একাই? সে-সব বুঝি স্রেফ গুলপট্টি?

গুলপট্টি তো নির্ঘাত। চাটুজ্জেদের রকে বসে তেলে-ভাজা খেতে খেতে সবাই দুটো-চারটে গুল দেয়, আমিও ঝেড়েছিলুম একটা। কিন্তু যে টেনিদা দু-বার ম্যাট্রিকে গাড্ডা খেয়েছে, তার মেমোরি এত ভাল কে জানত?

বাদামটা গিলে ফেলে আমি বললুম, না না, গুলপট্টি হবে কেন! পালাজ্বরে কাহিল করে দিয়েছে—নইলে এতদিনে আমি মোহনবাগানে খেলতুম, তা জানো? এখন দৌড়োতে গেলে পিলেটা একটু নড়ে—এই যা অসুবিধে।

—পিলেই তো নড়াবি। পিলে নড়লে তোর পালাজ্বরও সরে পড়বে—এই বলে দিলুম। নে—নেমে পড়্—

ফুর্—র্—র্—র্—

রেফারির বাঁশির আওয়াজ। আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই এক ধাক্কায় টেনিদা আমাকে ছিটকে দিলে মাঠের ভেতরে। পড়তে-পড়তে সামলে নিলুম। ভেবে দেখলুম, গোলমাল বেশি বাড়ানোর চাইতে দু-একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করাই ভাল।

যা থাকে কপালে! আজ প্যালারামেরই একদিন কি পালাজ্বরেরই একদিন!

খেলা শুরু হল।

ব্যাকে দাঁড়িয়ে আছি। ভেবেছিলুম ভজুয়া একাই ম্যানেজ করবে—কিন্তু দেখা গেল, মুখ ছাড়া আর কোন পুঁজিই ওর নেই। একটা বল পায়ের কাছে আসতেই রাম শট হাঁকড়ে দিলে। কিন্তু বলে পা লাগল না—উলটে ধড়াস করে শুকনো মাঠে একটা আছাড় খেল ভজুয়া। ভাগ্যিস গোলকীপার গোবরা তক্কে-তক্কে ছিল—নইলে ঢুকেছিল আর-কি একখানা!

হাই কিক্ দিয়ে গোবরা বলটাকে মাঝখানে পাঠিয়ে দিলে। রাইট আউট হাবুল সেন বলটা নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটল—ফাঁড়া কাটল এ যাত্রা।

কিন্তু ফুটবল মাঠে সুখ আর কতক্ষণ কপালে থাকে! পরক্ষণেই দেখি বল দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসছে আমাদের দিকে—আর নিয়ে আসছে ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির।

ভজুয়া বোঁ-বোঁ করে ছুটল—কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে ছুঁতেও পারল না। খুট করে ন্যাড়া পাশ কাটিয়ে নিলে, ভজুয়া একেবারে লাইন টপকে গিয়ে পড়ল লাইন্স্‌ম্যান ক্যাবলার ঘাড়ে।

কিন্তু ভজুয়ার যা খুশি হোক—আমার তো শিরে সংক্রান্তি। এখন আমি ছাড়া ন্যাড়া মিত্তির আর গোলকীপার গোবরার ভেতর আর কেউ নেই। গোবরাকে তো জানি। ন্যাড়ার ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে—কোন্ দিক দিয়ে বল যে গোলে ঢুকছে টেরও পাবে না।

—চার্জ! চার্জ!—সেণ্টারহাফ টেনিদার চিৎকার: প্যালা, চার্জ—

জয় মা কালী! এমনিও গেছি—অমনিও গেছি! দিলুম পা ছুড়ে। কিমাশ্চর্যম্! ন্যাড়া মিত্তির বোকার মতো দাঁড়িয়ে—বলটা সোজা ছুটে চলে গেছে হাবুল সেনের কাছে।

—ব্রেভো, ব্রেভো প্যালা!—চারদিক থেকে চিৎকার উঠল: ওয়েল সেভ্‌ড্!

তাহলে সত্যিই আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি! আমি পটলডাঙার প্যালারাম, ছেলেবেলায় টেনিস বল ছাড়া যে কখনো পা দিয়ে ফুটবল ছোঁয়নি—সেই আমি ঠেকিয়েছি দুর্ধর্ষ ন্যাড়া মিত্তিরকে! আমার চব্বিশ ইঞ্চি বুক গর্বে ফুলে উঠল। মনে হল, ফুটবল খেলাটা কিছুই নয়। ইচ্ছে করে এতদিন খেলিনি বলেই মোহনবাগানে চান্স পাইনি!

কিন্তু আবার যে ন্যাড়া মিত্তির আসছে। ওর পায়ে কি চুম্বক আছে? সব বল কি ওর পায়ে গিয়ে লাগবে?

দু-বার অপদস্থ হয়ে ভজুয়া ক্ষেপে গিয়েছিল। মরিয়া হয়ে চার্জ করল, কিন্তু রুখতে পারল না। তবু এবারেও গোল বাঁচল। তবে গোবরা নয়—একরাশ গোবর। ঠিক সময়-মতো তাতে পা পিছলে পড়ে গেল ন্যাড়া মিত্তির, আমি ধাঁই করে শট মেরে ক্লিয়ার করে দিলুম। ওদের লেফ্‌ট্‌ আউটের পায়ে লেগে থ্রো হয়ে গেল সেটা।

কিন্তু আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের চিৎকার সমানে শুনছি: ব্রেভো প্যালা—সাবাস! আরে, আবার যে বল আসে! আমাদের ফরোয়ার্ডগুলো কি ঘোড়ার ঘাস কাটছে নাকি? গেল-গেল করতে করতে ওদের বেঁটে রাইট ইনটা শট করলে—আমার পায়ের তলা দিয়ে বল উড়ে গেল গোলের দিকে।

গো—ও—ও—

ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের চিৎকার। কিন্তু 'ওল' আর নয়, স্রেফ কচু। অর্থাৎ বল তখন পোস্ট ঘেঁসে কচুবনে অন্তর্ধান করেছে। গোল কিক্।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা কাণ্ড করেছে ভজুয়া। বলকে তাড়া করে গিয়ে শট করে দিয়েছে গোল-পোস্টের গায়ে। আর তার পরেই আঁই-আঁই করতে করতে বসে পড়েছে পা চেপে ধরে।

ভজুয়া ইনজিওর্ড। ধরাধরি করে দু-তিনজন তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

আপদ গেল। যা খেলছিল—পারলে আমিই ওকে ল্যাং মেরে দিতুম। গোল-পোস্টটাই আমার হয়ে কাজ সেরে দিয়েছে।

কিন্তু এখন যে আমি একেবারে একা। 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়'—! এলোপাথাড়ি কাটল কিছুক্ষণ। ভগবান ভরসা—আমাকে আর বল ছুঁতে হল না। গোটা-দুই গোবরা এগিয়ে এসে লুফে নিলে, গোটাতিনেক সামলে নিলে হাফ-ব্যাকেরা। তারপর হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল।

আঃ—কোনমতে ফাঁড়া কাটল এ পর্যন্ত। বাকি সময়টুকু সামলে নিতে পারলে হয়!

পেটের পিলেটা একটু টনটন করছে—বুকের ভেতরও খানিকা ধড়ফড়ানি টের পাচ্ছি। কিন্তু চারদিক থেকে তখন থাণ্ডার ক্লাবের অভ্যর্থনা: বেড়ে খেলছিস প্যালা, সাবাস! এমনকি ক্যাপ্টেন টেনিদা পর্যন্ত আমার পিঠ থাবড়ে দিলে:

—তুই দেখছি রেগুলার ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ার! নাঃ—এবার থেকে তোকে চান্স দিতেই হবে দু-একবার!

এতে আর কার পিলে-টিলের কথা মনে থাকে? বিজয়গর্বে দু-গ্লাস লেবুর সরবত খেয়ে নিলুম। শুধু ভজুয়া কিছু খেল না—পায়ে একটা ফেটি বেঁধে বসে রইল গোঁজ হয়ে। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, শুধু এক-নম্বরের বাক্যি-নরেশ!—এক লাথ্‌সে কুত্তাকো লরিমে চড়া দিয়া! তবু একটা বল ছুঁতে পারলে না—ছোঃ—ছোঃ!

ভজুয়া দুচোখে জিঘাংসা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার খেলা শুরু হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভজুয়া আবার নামল মাঠে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, দেখিয়ে প্যালাবাবু—ইস্‌ দফে হাম মার ডালেঙ্গে!

ভজুয়ার চোখ দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! সর্বনাশ—আমাকে নয় তো?

—সে কী রে! কাকে?

—দেখিয়ে না—

কিন্তু আবার সে আসছে! 'ওই আসে—ওই অতি ভৈরব হরষে'! আর কে? সেই ন্যাড়া মিত্তির! ট্যারা চোখে সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি! এবার গোল না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না!

ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটল ভজুয়া। তারপরই 'বাপ্' বলে এক আকাশ-ফাটা চিৎকার! বল ছেড়ে ন্যাড়া মিত্তিরের পাঁজরায় লাথি মেরেছে ভজুয়া, আর ন্যাড়া মিত্তির ঝেড়েছে ভজুয়ার মুখে এক বোম্বাই ঘুসি। তারপর দু-জনেই ফ্ল্যাট এবং দু-জনেই অজ্ঞান। ভজুয়া প্রতিশোধ নিয়েছে বটে, কিন্তু এটা জানত না যে ন্যাড়া মিত্তির নিয়মিত বক্সিং লড়ে।

মিনিট-তিনেক খেলা বন্ধ। পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাব আর দমদম ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের মধ্যে একটা মারামারি প্রায় বেধে উঠেছিল—দু-চারজন ভদ্রলোক মাঝখানে নেমে পড়ে থামিয়ে দিলেন। ফের খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু ভজুয়া আর ফিরল না—ন্যাড়া মিত্তিরও না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ন্যাড়া বেরিয়ে যাওয়াতে দলের কোমর ভেঙে গেছে ওদের। তবু হাল ছাড়ে না ভ্যাগাবণ্ড ক্লাব। বার-বার তেড়ে আসছে। আর, কী হতচ্ছাড়া ওই বেঁটে রাইট-ইনটা!

—অফ সাইড!—রেফারির হুইসল। আর-একটা ফাঁড়া কাটল।

পটলডাঙা ক্লাবের হাফ ব্যাকেরা এতক্ষণে যেন একটু দাঁড়াতে পেরেছে। আমার পা পর্যন্ত আর বল আসছে না। খেলার প্রায় মিনিট-তিনেক বাকি। এইটুকু কোনমতে কাটাতে পারলেই

মানে মানে বেঁচে যাই—পটলডাঙার প্যালারাম বীরদর্পে ফিরতে পারে পটলডাঙায়।

এই রে! আবার সেই বেঁটেটা! কখন চলে এসেছে কে জানে! এ যে ন্যাড়া মিত্তিরের ওপরেও এক-কাঠি! নেংটি ইঁদুরের মতো বল মুখে করে দৌড়তে থাকে! আমি কাছে এগোবার আগেই বেঁটে কিক করেছে। থাণ্ডার ক্লাব বাঁয়ে শেয়াল নিয়ে নেমেছিল নির্ঘাত! ডাইভ করে বলটা ধরতে পারলে না গোবরা—তবু এবারেও বল পোস্ট ঘেঁসে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে যে গোবরটা কাত করেছিল—সেটা এবার আমায় চিত করল। একখানা পেল্লায় আছাড় খেয়ে যখন উঠে পড়লুম তখন পেটের পিলেটায় সাইক্লোন হচ্ছে! মাথার ভেতরে যেন একটা নাগরদোলা ঘুরছে বোঁ-বোঁ করে। মনে হচ্ছে, কম্প দিয়ে পালাজ্বর এল বুঝি!

আর এক মিনিট। আর এক মিনিট খেলা বাকি। রেফারি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বার-বার। ড্র যাবে নির্ঘাত। যা খুশি হোক—আমি এখন মাঠ থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি! আমার এখন নাভিশ্বাস! গোবরে আছাড় খেলে মাথা এমন বোঁ-বোঁ করে ঘোরে কে জানত!

গোল-কিক্।

আবছাভাবে গোবরার গলার স্বর শুনতে পেলুম : কিক কর্ প্যালা—

শেষের বাঁশি প্রায় বাজল। চোখে ধোঁয়া দেখছি আমি। এইবার প্রাণ খুলে একটা কিক করব আমি! মোক্ষম কিক! জয় মা কালী—

প্রাণপণে কিক্ করলুম। গো—ও-ওল—গো—ও-ও-ল—! চিৎকারে আকাশ ফাটার উপক্রম! প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এত জোরে কি শট মেরেছি যে আমাদের গোল-লাইন থেকেই ওদের গোলকীপারকে ঘায়েল করে দিয়েছি?

কিন্তু সত্য-দর্শন হল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। গোবরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমাদের গোলের নেটের ভেতরেই বলটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন আমার কীর্তি দেখে বলটাও হতভম্ব হয়ে গেছে।

তারপর?

তারপর খেলার মাঠ থেকে এক মাইল দূরের এই কচুবনে কানাই হয়ে বসে আছি। দূর থেকে এখনো ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের চিৎকার আসছেঃ থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ-হিপ হুররে!

ভজগৌরাঙ্গ-কথা

হাবুল সেন বর্ধমানে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। ক্যাবলা গেছে বাবা মার সঙ্গে নইনিতালে। তাই পুজোর ছুটিতে পটলডাঙা আলো করে আছি চার মূর্তির দু-জন—আমি আর টেনিদা।

বিকেলবেলা ভাবছি ধাঁ করে লিলুয়ায় ছোট পিসিমার বাড়ি থেকে একটু বেড়িয়ে আসি—হঠাৎ বাইরে থেকে টেনিদার গাঁক গাঁক করে চিৎকার ঃ

—প্যালা, কাম—কুইক !

নতুন ডাক্তার মেজদা হসপিটালে গোটাকতক রুগী-টুগী মেরে ফিরে আসছিল। নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাঁত খিচিয়ে আমায় বলে গেল ঃ যাও জাম্বুবান—তোমার দাদা হনুমান তোমায় ডাকছে। দু-জনে মিলে এখন লঙ্কা পোড়াওগে।

জাম্বুবান কখনও লঙ্কা পোড়ায় নি—মেজদাকে এই কথা বলতে গিয়েও আমি বললুম না। ওকে চটিয়ে দিলে মুশকিল। একটু পেটের গণ্ডগোল হয়েছে কি, সঙ্গে সঙ্গে সাতদিন হয়ত সাগুবার্লি কিংবা স্রেফ কাঁচকলার ঝোল খাইয়ে রাখবে, নইলে পটাং করে পেটেই একটা ইনজেকশন দিয়ে দেবে। তাই মিথ্যে অপবাদটা হজম করে যেতে হল।

আবার টেনিদার সেই পাড়া-কাঁপানো বাজখাই হাঁক ঃ প্যালা, আর ইউ ডেড ?

টেনিদার চিৎকার শুনলে মড়া অবধি লাফিয়ে ওঠে, আর আমি তো এখনো মারাই যাই নি। হুড়মুড় করে দোতলা থেকে নেমে এসে বললুম ঃ কী হয়েছে, চ্যাঁচাচ্ছ কেন অত ?

টেনিদা আমার চাঁদির ওপর কড়াং করে একটা গাঁট্টা মারল। বললে ঃ তুই একটা নীরেট ভেট্‌কি মাছ! আমি তো শুধু চ্যাঁচাচ্ছি—ব্যাপারটা শুনলে তুই একেবারে 'ভজগৌরাঙ্গ' 'ভজ-গৌরাঙ্গ' বলে দু-হাত তুলে নাচতে থাকবি! যাকে বলে নরীনৃত্যতি।

কাণ্ডটা দেখ একবার—টেনিদা সংস্কৃত আওড়াচ্ছে! পণ্ডিত-মশাই একবার ওকে 'গো' শব্দরূপ জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, গৌ—গৌবৌ—গৌবরঃ! শুনে পণ্ডিতমশাই চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে যেতে যেতে সামলে গিয়েছিলেন। আর ওকে বলেছিলেন—কী বলেছিলেন, সেটা না-ই বা শুনলে!

কিন্তু সংস্কৃত যখন বলছে, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয় সাঙ্ঘাতিক। বললুম ঃ খামোকা আমি নাচব কেন? আর যদিই বা নাচি ভজ-গৌরাঙ্গ বলব কেন? তোমার নাম ধরে ভজহরি ভজহরি বলেও তো নাচতে পারি! (তোমরা তো জানোই, টেনিদার পোশাকী নাম ভজহরি মুখুজ্জে।)

টেনিদা আমার নাকের সামনে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বললে ঃ ভজহরি বলে নাচলে কচুপোড়া পাবি! আরে, আজ সন্ধের পর ভজগৌরাঙ্গবাবু যে পোলাও-মাংস খাওয়াচ্ছেন! তোকে আর আমাকে!

শুনে খানিকক্ষণ আমি হাঁ করে থাকলুম।

—কে খাওয়াচ্ছে বললে!

—ভজগৌরাঙ্গবাবু।

আমার হাঁ-টা আরও বড় হলঃ ভাল করে বল, বুঝতে পারছি না।

বলেই বুঝতে পারলুম, কী ভুলটাই করেছি। টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের কাছে মুখ এনে 'ভজগৌরাঙ্গ' বলে এমন একখানা হাঁক ছাড়ল যে আমি আঁতকে তিন হাত লাফিয়ে উঠলুম। কান কন-কন করতে লাগল, মাথা বন-বন করে উঠল।

টেনিদা হিড়-হিড় করে টানতে টানতে আমাকে চাটুজ্জেদের রোয়াকে নিয়ে এল। বললে, শুনে যে তো মুচ্ছো যাওয়ার জো হল দেখছি! বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি?

বাঁ দিকের কানটা চেপে ধরে আমি বললুমঃ ভজগৌরাঙ্গ আমাদের মাংস-পোলাও খাওয়াবে?

—আলবাত! তোকে আর আমাকে।

—ভজগৌরাঙ্গ সমাদ্দার?

—নির্ঘাত!

বলে কী টেনিদা! পাগল হয়ে গেছে, না পেট খারাপ হয়েছে? ভজগৌরাঙ্গবাবুর মতো কৃপণ সারা কলকাতায় আর দু-জন নেই। একাই থাকেন। ওঁর ছেলে রামগোবিন্দ চাকরি পেয়েই নিজের মাকে নিয়ে কেষ্টনগরে চলে গেছে—মানে পালিয়ে বেঁচেছে। ভজগৌরাঙ্গ পাটের দালালি করছেন, আর টাকা জমাচ্ছেন। বাড়ির সামনে ভিক্ষুক এলে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন। একবার গোটাকয়েক ডেঁয়ো পিঁপড়ে ওঁর একটুখানি চিনি খেয়ে ফেলেছিল, ভদ্রলোক পিঁপড়েগুলোকে ধরে একটা শিশিতে পুরে রাখলেন আর পর-পর তিন দিন সেই পিঁপড়ে দিয়ে চা করে খেলেন। সেই ভজগৌরাঙ্গ পোলাও-মাংস খাওয়াবেন আমাকে

আর টেনিদাকে ? উঁহু, মাথা খারাপ হলেও এ কথা লোকে ভাবতে পারে না। টেনিদার পেট খারাপই হয়েছে।

টেনিদা বললে, 'অমন সিঙাড়ার মতো মুখ করে, ছাগলের মতো তাকিয়ে আছিস যে ? তাহলে সব খুলে বলি, শোন।

কাল শেষ রাত্তিরে ছোটকাকা সরকারি কাজে এরোপ্লেনে চেপে সিঙাপুরে গেছে। আমি দমদমে ছোটকাকাকে তুলে দিয়ে যখন ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরেছি, তখন রাত চারটে। গলির মধ্যে ঢুকেই দেখি যে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার ! একটা লোক ল্যাম্প-পোস্টের ওপর ঝুলছে, আর নিচ থেকে একজন পাহারাওলা উতারো-উতারো বলে তার ঠ্যাং ধরে টানছে।

এগিয়ে এসে দেখি, ল্যাম্প-পোস্ট ধরে যে লোকটা ঝুলছে সে আর কেউ নয়, ভজগৌরাঙ্গবাবু।

—বল কী ! ভজগৌরাঙ্গবাবু ? তা শেষ রাত্তিরে ল্যাম্প-পোস্ট ধরে ঝুলতে গেল কেন ?

—আরে, সেইটেই তো গণ্ডগোল ! পাহারাওলা তো এক হ্যাঁচকা টানে ভজগৌরাঙ্গবাবুকে চালকুমড়োর মতো ধপাত করে নামিয়ে নিলে। তারপর বললে, তোম্ ইলেকট্রিক তার চুরি করতা হ্যায়—চল থানামে ! আর ভজগৌরাঙ্গ হাউমাউ করতে থাকে, আমি শেষ রাত্রে বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে হিসাব লিখ্‌তা থা, একঠো কাগজ উড়্‌কে ল্যাম্প-পোস্টকে উপরে গিয়ে লটকে গিয়া, সেইঠো পাড়তে গিয়া। পাহারাওলা তা বিশ্বাস করবে কেন ! খালি বলে, তোম্ চোর হ্যায়, চল থানামে !

আমাকে দেখেই ভজগৌরাঙ্গবাবুর সে কী কান্না ! বলে, বাবা টেনি, আমায় বাঁচাও ! এই বুড়ো বয়েসে চোর বলে ধরে নিয়ে গেলে আমি আর বাঁচব না !

যাই হোক, আমি পাহারওলাকে অনেক বোঝালুম। বললুম, 'এ দারোগা সাব—এ লোক আচ্ছা আদমি, চুরি নেহি করতা। ছোড়্ দিজিয়ে দারোগা সাহেব!—দারোগা সাহেব বলতে লোকটা একটু ভিজল। খানিকটা খইনি-টইনি খেয়ে, ভজগৌরাঙ্গবাবুর টিকিতে একটা টান দিয়ে বললে, আচ্ছাঃ, আজ ছোড়্‌দেতা। ফের যদি তোম্ ল্যাম্পপোস্টে ওঠেগা, তো তুম্‌কো ফাঁসি দেগা!—বলে চলে গেল।

তখন ভজগৌরাঙ্গ আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বাবা টেনি, তুমি আমায় ধনে প্রাণে বাঁচিয়েছ! একথা কাউকে বোলো না—তাহলে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না! তোমাকে আমি চারটে পয়সা দিচ্ছি, ডালমুট খেয়ো। আমি বললুম, অত শস্তায় হবে না স্যার! যদি আমাকে আর প্যালাকে কাল সন্ধেয় পোলাও-মাংস খাওয়াতে পারেন, তবেই ব্যাপারটা চেপে যাব।

শুনে বুড়োর চোখ কপালে চড়ে গেল। বলে, এই গরমে পোলাও-মাংস খেতে নেই বাবা—শেষে অসুখ করে পড়বে। তার-চে' বরং দু-আনা পয়সা দিচ্ছি—তুমি আর প্যালারাম বোঁদে কিংবা গুঁজিয়া কিনে খেখো। পাকৌড়িও খেতে পার।

আমি বললুম, এই আশ্বিন মাসে মোটেই গরম নেই—ওসব বাজে কথা চলবে না। জেলের হাত থেকে বাঁচালুম, একশো দু-শো টাকা ফাইনও হতে পারত, তার বদলে কিনা বোঁদে আর পাকৌড়ি! বেশ, কিছু খাওয়াতে হবে না আপনাকে। সকাল হতেই আমি আর প্যালা দুটো চোঙা মুখে নিয়ে রাস্তায় বেরুব। আমি বলব—'পটলডাঙার ভজগৌরাঙ্গ', প্যালা বলবে—'তার-চোর!' আমি বলব—'পুলিশ ধরে কাকে?' প্যালা বলবে—

'ভজগৌরাঙ্গকে' ! ব্যাস্, বুড়ো একদম ঠাণ্ডা ! সুড়-সুড় করে রাজি হয়ে গেল। বুঝলি প্যালা, একেই বলে পলিটিক্স্ !

—তাহলে আজ সন্ধেয় আমরা পোলাও-কালিয়া খাচ্ছি ? ভজগৌরাঙ্গের বাড়িতে ?

—নিশ্চয় ! ঠেকাচ্ছে কে ?

এবারে সত্যি-সত্যিই আমি নেচে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম ঃ ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

টেনিদা বললে ঃ ইয়াক্—ইয়াক্ !

সন্ধের পরে ভজগৌরাঙ্গের বাড়ি গিয়ে তো সমানে কড়া নাড়ছি দুজনে। পুরো পনেরো মিনিট কড়া নাড়বার পরেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। বুড়ো চুপ্ করে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে ভেতরে। সারারাত কড়া নাড়লেও দরজা খুলবে বলে মনে হল না।

আমি বললুম, হল তো ? খাও এখন পোলাও-কালিয়া ! পিঁপড়ে দিয়ে চা খায়—ওর কথায় তুমি বিশ্বাস করলে ?

টেনিদা ক্ষেপে গেল। খাড়া নাকটাকে গণ্ডারের মতো উঁচু করে বললে, দরজা খুলবে না ? দাঁড়া খোলাচ্ছি ! আমি বলছি—'ভজগৌরাঙ্গ'—তুই সঙ্গে সঙ্গে বলবি—

—মনে আছে। হাঁক পাড়ো—

টেনিদা যেই আকাশ-ফাটা চিৎকার তুলেছে—'ভজগৌরাঙ্গ', আর আমি কাঁসরের মতো ক্যানকেনে গলায় জবাব দিয়েছি—'তার-চোর',—অমনি চিচিং ফাঁক ! ক্যাঁচ্ করে দরজা খুলে গেল। একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে ভজগৌরাঙ্গ বেরিয়ে এলেন সুট্ করে।

—আহা-হা, করছ কী! চুপ—চুপ!

—চুপ—চুপ মানে? আধ ঘণ্টা ধরে করা নাড়ছি—কোন সাড়াই নেই? ভেবেছেন কী আপনি? প্যালা—এগেইন!—

ভজগৌরাঙ্গ তাড়াতাড়ি বললেন, না—না—এগেইন নয়! আহা-হা, বড় কষ্ট হয়েছে তো তোমাদের! আমি কড়ার আওয়াজ শুনতেই পাইনি। মানে—এই পেট-ব্যথা করছিল কিনা, তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এস—এস—ভেতরে এস—

বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা, তার একপাশে কতকগুলো হিসেবের কাগজপত্র। একটা লণ্ঠন মিট্-মিট্ করে জ্বলছে। বাড়িতে ইলেকট্রিকের লাইন নিয়ে পয়সা খরচ করবেন, এমন পাত্রই নন ভজগৌরাঙ্গ। কাগজপত্রগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন: বস, বাবা, বস জিরোও আগে।

টেনিদা বললে: জিরোবার দরকার নেই, দোরগোড়ায় আধ-ঘণ্টা জিরিয়েছি আমরা। পোলাও-কালিয়া কোথায় তাই বলুন।

—পোলাও-কালিয়া?—ভজগৌরাঙ্গবাবু খাবি খেলেন।

—হুঁ, পোলাও-কালিয়া!—টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে: সেইরকমই কথা ছিল। কোথায় সে?

ভজগৌরাঙ্গ বললেন: এঃ, তাই তো—একেবারে মনেই ছিল না! মানে সারা দিন খুব পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলুম কিনা, সেইজন্যেই—তা ইয়ে, তোমাদের বরং চার আনা পয়সা দিচ্ছি। শেয়ালদায় পাঞ্জাবীদের দোকানে গিয়ে দু-আনার মাংস আর দু-আনার পুরী—

আমি বললুম: দু-আনায় মাংস দেয় না, চিবুনো হাড় দিতে পারে এক টুকরো।

টেনিদা গর্জন করে বললে ঃ চালাকি ? ফাঁকি দেবার মতলব করেছেন ? জেল থেকে বাঁচিয়ে দিলুম—তার এই প্রতিদান ? যাক, আমরা কিচ্ছু খেতে চাই না। প্যালা—আয় এখুনি বেরিয়ে পড়ি চোঙা নিয়ে !

—আহা-হা চোঙা আবার কেন ?—ভজগৌরাঙ্গ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ চোঙা-টোঙা খুব খারাপ জিনিস। ছিঃ বাবা টেনি, চোঙা নিয়ে চ্যাচাতে নেই—ওতে লোকের শান্তিভঙ্গ হয় !

—সে আমরা বুঝব। আমরা চোঙা ফুঁকে আপনাকে শিঙে ফুঁকিয়ে ছাড়ব ! প্যালা—চলে আয়—

—আহা, থাম—থাম !—ভজগোবিন্দ টেনিদার হাত চেপে ধরলেন। তারপর ডিমভাজার মতো করুণ মুখ করে মিহিদানার মতো মিহি গলায় বললেন ঃ নিতান্তই যদি খাবে, তাহলে আমার খাবারটাই খেয়ে যাও। আমি নয় আজ রাত্তে এক গ্লাস জল খেয়েই শুয়ে থাকব।—বলেই ভজগৌরাঙ্গের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—আপনার খাবারটা কী ?—আমার সন্দেহ হল।

—ভাল মাছ আছে আজকে—পুঁটিমাছ ভাজা। সেইসঙ্গে পান্তা ভাত। দশদিন পরে দু-গণ্ডা পয়সা দিয়ে একটুখানি মাছ এনেছিলুম আশা করে, কিন্তু কপালে না থাকলে—! আবার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ভজগৌরাঙ্গের।

শুনে আমার মায়া হচ্ছিল, কিন্তু টেনিদা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল ঃ

—বটে, পুঁটিমাছ ভাজা আর পান্তা ভাত ! ও রাজভোগ আপনিই খান মশাই ! প্যালা, চোঙাদুটো রেডি আছে তো ? চল্ বেরিয়ে পড়ি—

ভজগৌরাঙ্গ কাঁউ-কাঁউ করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ খটখট করে বাজের মতো বেজে উঠল দরজার কড়া। সঙ্গে সঙ্গে বিদঘুটে মোটা গলায় কে বললে : ভাজগুড়ুংবাবু হ্যায়—ভাজগুড়ুং বাবু ?

ভজগৌরাঙ্গ থমকে থেমে গেলেন। টেনিদা জিজ্ঞেস করলে : কোন্ হ্যায় ?

আবার সেই মোটা গলা শোনা গেল : হামি লালবাজার থানা থেকে আসছে !

ভজগৌরাঙ্গ ঠক-ঠক করে কেঁপে উটলেন।

—এই সেরেছে ! টিকিটা টেনে দিয়েও পাহারাওলার রাগ যায়নি—নির্ঘাত লালবাজারে গিয়ে নালিশ করেছে—আর পুলিশে আমায় ধরতে এসেছে ! বাবা টেনি, কাল মাংস-পোলাও চপ-কাটলেট সব খাওয়াব ! আমাকে আজ যেমন করে হোক বাঁচাও !

বাইরে থেকে আবার আওয়াজ এল : জল্‌দি দরজা খুলিয়ে দেন—হামি লালবাজারসে আসছে !

—ওকে বলে—ইয়ে তোমরা আমার ভাইপো, আমি তিন মাসের জন্যে দিল্লী গেছি—বলেই ভজগৌরাঙ্গ চট্ করে অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়লেন, তারপরই একেবারে তক্তপোশের তলায়। সেখান থেকে কুকুরের বাচ্চার ডাকের মতো কুঁ-কুঁ করে আওয়াজ উঠতে লাগল। বোঝা গেল, ভজগৌরাঙ্গ প্রাণ-পণে কান্না চাপবার চেষ্টা করছেন।

—ও ভাজগুড়ুং বাবু—দরজা খোলিয়ে—

টেনিদা ফিস-ফিস কর বললে : ব্যাপার সুবিধের নয় রে প্যালা, লালবাজারের পুলিশ কেন আবার ? বুড়োর সঙ্গে আমরাও ফেঁসে যাব নাকি ?

আমি বললুম ঃ আমরা তো কখনও ল্যাম্প-পোস্টে উঠিনি, আমাদের ভয় কিসের ? দরজা খুলে দেখাই যাক।

তক্তপোশের তলায় আবার কুঁ-কুঁ করে আওয়াজ উঠতে লাগল।

টেনিদা দরজা খুলল ভয়ে-ভয়ে। বাইরে খাকি জামা পরা এক পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে—তার হাতে একটা মস্ত বড় হাঁড়ি। আমাদের দেখেই এক প্রকাণ্ড স্যালুট ঠুকল। তারপর একটা চিঠি দিয়ে বললে, চাটার্জি সাহাব দিয়া। হামি সাহাবকো আরদালি আছে।

রাস্তার আলোয় চিঠিটা পড়ে দেখলুম আমরা। কেষ্টনগর থেকে লিখছে রামগোবিন্দ ঃ

'বাবা, পুলিশ অফিসার মিস্টার চ্যাটার্জি আমার বন্ধু। কেষ্টনগরে বেড়াতে এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে তোমার জন্যে এক হাঁড়ি ভাল সরপুরিয়া আর সরভাজা পাঠালুম। ঘরে রেখে পচিয়ো না—খেয়ো। আমি আর মা ভাল আছি। প্রণাম নিয়ো।

—রামগোবিন্দ।

টেনিদা একবার আমার দিকে তাকালো, আমি তাকালুম টেনিদার দিকে। আমি বললুম, আচ্ছা আরদালি সাহেব, সব ঠিক হ্যায় !

'আরদালি সাহেব' আবার স্যালুট করে, জুতো মচ্‌মচিয়ে চলে গেল।

আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম, টেনিদা ঝট্‌ করে আমাকে দরজার বাইরে টেনে নিয়ে এল।

—চুপ্‌, স্পীক-টি নট্‌! একহাঁড়ি সরভাজা আর সরপুরিয়া

—খাঁটি কেষ্টনগরের জিনিস ! পোলাও-কালিয়া কোথায় লাগে এর কাছে !

দরজাটা টেনে দিতে দিতে টেনিদা হাঁক পাড়ল : ভজগৌরাঙ্গ-বাবু লাইন ক্লিয়ার ! পুলিশ তাড়িয়েছি ! কাল আর ঘর থেকে বেরুবেন না ! পরশু সন্ধ্যায় আমরা পোলাও-কালিয়া খেতে আবার আসব । এখন দরজাটা বন্ধ করে দিন ।

তারপর ?

তারপর সেই সরভাজা আর সরপুরিয়ার হাঁড়ি নিয়ে আমরা দু-জন সোজা টেনিদাদের তেতলার ছাদে । টেনিদা একখানা গোটা সরভাজা মুখে দিয়ে বললে : ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টো-ফিলিস—

আমি সরপুরিয়ায় কামড় দিয়ে বললুম : ইয়াক্—ইয়াক্ !

তত্ত্বাবধান মানে—জীবে প্রেম !

রবিবারের সকালে ডাক্তার মেজদা কাছাকাছি কোথাও নেই দেখে আমি মেজদার স্টেথিসকোপ কানে লাগিয়ে বাড়ির হুলোবেড়াল টুনির পেট পরীক্ষা করছিলুম। বেশ গুরগুর করে আওয়াজ হচ্ছে, মানে এতদিন ধরে যতগুলো নেংটি ইঁদুর আরশোলা টিকটিকি খেয়েছে তারা ওর পেটের ভেতরে ডাকাডাকি করছে বলে মনে হচ্ছিল। আমি টুনির পেট সম্পর্কে এইসব দারুণ দারুণ চিন্তা করছি, এমন সময় বাইরে থেকে টেনিদা ডাকল : প্যালা, কুইক—কুইক !

স্টেথিসকোপ রেখে একলাফে বেরিয়ে এলুম বাড়ি থেকে।

—কী হয়েছে টেনিদা ?

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে, পুঁদিচ্চেরি !

মনে কোনরকম উত্তেজনা এলেই টেনিদা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে থাকে। তখন কে বলবে, স্রেফ ইংরিজির জন্যেই ওকে তিন-তিনবার স্কুল ফাইন্যালে আটকে যেতে হয়েছে !

আমি বললুম, পুঁদিচ্চেরি মানে ?

—মানে, ব্যাপার অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক। এক্ষুনি তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। ক্যাবলা কিংবা হাবুল সেন কাউকে বাড়িতে পেলুম না—তাই তোকেই নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায় নিয়ে যাবে ?

—কালীঘাটে।

—কালীঘাটে কেন ?—আমি উৎসাহ বোধ করলুম—কোথাও খাওয়া-টাওয়ার ব্যবস্থা আছে বুঝি ?

—এটার দিন রাত খালি খাওয়ার চিন্তা !—বলে টেনিদা আমার মাথার দিকে তাক করে চাঁটি তুলল, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে তিন হাত দূরে ছিটকে গেলুম আমি।

—মারামারি কেন আবার ? কী বলতে চাও, খুলেই বলো না।

চাঁটিটা কষতে না পেরে ভীষণ ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে, বলতে আর দিচ্ছিস কোথায় ?—সমানে চামচিকের মতো চ্যাক-চ্যাক করছিস তখন থেকে। হয়েছে কী জানিস, আমার পিসতুতো ভাই ভোম্বলদার ফ্ল্যাটটা একটু তত্ত্বাবধান—মানে সুপারভাইজ করে আসতে হবে।

—তোমার ভোম্বলদা কী করছেন ? কম্বল গায়ে দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছেন ?

—আরে না না ! ভোম্বলদা—ভোম্বল বৌদি, মায় ভোম্বলদার মেয়ে ব্যাম্বি—সবাই মিলে ঝাঁসি না গোয়ালিয়র কোথায় বেড়াতে গেছে। আজই সকালে সাড়ে দশটার গাড়িতে ওরা আসবে। এদিকে আমি তো স্রেফ ভুলে মেরে বসে আছি, বাড়ির কী হাল হয়েছে কিচ্ছু জানি না। চল্—দু-জনে মিলে এইবেলা একটু সাফ-টাফ করে রাখি।

শুনে পিত্তি জ্বলে গেল ঃ—আমি তোমার ভোম্বলদার চাকর নাকি যে ঘর ঝাঁট দিতে যাব ? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও।

টেনিদা নরম গলায় আমাকে বোঝাতে লাগল তখন ঃ—ছি প্যালা, ওসব বলতে নেই—পাপ হয়। চাকরের কথা কেন বলছিস র‍্যা—এ হল পরোপকার। মানে জীবসেবা। আর

জানিস তো—জীবে প্রেম করার মতো এমন ভাল কাজ আর কিচ্ছুটি নেই ?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, তোমার ভোম্বলদাকে প্রেম করে আমার লাভ কী ? তার চেয়ে আমার হুলো বেড়াল টুনিই ভাল। সে ইঁদুর টিঁদুর মারে।

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কলেজে ভর্তি হয়ে তুই আজকাল ভারি পাখোয়াজ হয়ে গেছিস—ভারি ডাঁট হয়েছে তোর ! আচ্ছা চল্ আমার সঙ্গে—বিকেলে তোকে চাচার হোটেলে কাটলেট খাওয়াব।

—সত্যি ?

—তিন সত্যি। কালীঘাটের মা কালীর দিব্যি।

এরপরে জীবকে—মানে ভোম্বলদাকে প্রেম না করে আর থাকা যায় ? দারুণ উৎসাহের সঙ্গে আমি বললুম, আচ্ছা চল তাহলে।

বাড়িটা কালীঘাট পার্কের কাছেই। তেতলার ফ্ল্যাটে ভোম্বলদা থাকেন, ভোম্বল-বৌদি থাকেন, আর তিন বছরের মেয়ে ব্যাম্বি থাকে।

টেনিদা চাবি খুলতে যাচ্ছিল, আমি হাঁ-হাঁ করে বাধা দিলুম।

—আরে আরে, কার ঘর খুলছ ? দেখছ না—নেম-প্লেট রয়েছে অলকেশ ব্যানার্জি এম্. এস্-সি ?

—ভোম্বলদার ভাল নামই তো অলকেশ।

শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এমন নামটাই বরবাদ ? ভোম্বলদার পোশাকী নাম দোলগোবিন্দ হওয়া উচিত। ভূতেশ্বর হতেও বাধা নেই, এমনকি করালীচরণও হতে পারে। কিন্তু

অলকেশ একেবারেই বেমানান—আর অলকেশ হলে কিছুতেই ভোম্বলদা হওয়া উচিত নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব ভাবছি আর নাক চুলকোচ্ছি, হঠাৎ টেনিদা হাঁক ছাড়ল।

—ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি হাঁ করে? ভেতরে আয়।

ঢুকে পড়লুম ভেতরে।

গোছাবার সাজাবার কিছু নেই—সবই ভোম্বল-বৌদি বেশ পরিপাটি করে রেখে গেছেন। দিব্যি বসবার ঘরটি—আমি আরাম করে একটা সোফার ওপর বসে পড়লুম।

—এই, বসলি যে?

—কী করব, করবার তো কিছুই নেই।

—তা বটে। টেনিদা হতাশ হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার,—ধূলো-টুলোও তো বিশেষ পড়েনি দেখছি।

—বন্ধ ঘরে ধুলো আসবে কোত্থেকে?

—হুঁ, তাই দেখছি। কিছুক্ষণ নাক-টাক চুলকে টেনিদা বললে, কোন উপকার না করে চলে গেলে মনটা যে বড্ড হু-হু করবে র‍্যা! আচ্ছা—একটা কাজ করলে হয় না? ঘরে ধুলো না থাকলেও মেঝের ঐ কার্পেটটায় নিশ্চয় আছে। আর ধুলো থাকবে না অথচ কার্পেট থাকবে—এ কখনো হতেই পারে না এমন কোনদিন হয়নি। আয়—বরং এটাকে—

কার্পেট ঝাড়বার প্রস্তাবটা আমার একেবারেই ভাল লাগল না। আপত্তি করে বললুম, কার্পেট নিয়ে আবার টানাটানি কেন? ও যেমন আছে তেমনি থাক না। খামোকা—

—শাট আপ! কাজ করবি নে তো মিথ্যেই ট্রাম ভাড়া

দিয়ে তোকে কালীঘাটে নিয়ে এলুম নাকি? সোফায় বসে আর নবাবি করতে হবে না প্যালা, নেমে আয় বলছি—

অগত্যা নামতে হল, সোফা আর টেবিল সরাতে হল, কার্পেট টেনে তুলতে হল, তারপর একবার—মাত্র একটি বার ঝাড়া দিতেই—ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!

ঘরের ভেতরে যেন ঘুর্নি উঠল একটা! চোখের পলকে সব অন্ধকার!

টালা থেকে ট্যাংরা আর শেয়ালদা থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত যত ধুলো ছিল একসঙ্গে পাক খেয়ে উঠল।—সেরেছে, সেরেছে, বলে এক বাঘা চিৎকার দিলুম আমি, তারপর দু-লাফে আমরা বেরিয়ে পড়লুম ঘর থেকে—নাকে ধুলো, কানে ধুলো, মুখে ধুলো, মাথায় ধুলো। পুরো দশটি মিনিট খক-খক খকাখক করে কাশির প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে আবার কোত্থেকে গোটা-দুই আরশোলা আমার নাকের ওপর ডিগবাজি খেয়েও গেল।

কাশি বন্ধ হলে মাথা-টাথা ঝেড়ে, মুখ-ভর্তি কিচ্‌কিচে বালি নিয়ে আমি বললুম, এটা কী হল টেনিদা?

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, হুঁ! কেমন বেয়াড়া হয়ে গেল রে! মানে এত ধুলো যে ওর ভেতরে থাকতে পারে—বোঝাই যায় নি! ইস্—ঘরটার অবস্থা দেখছিস?

হ্যাঁ—দেখবার মতো চেহারাই হয়েছে এবার! দরজা দিয়ে তখনো ধোঁয়ার মতো ধুলো বেরুচ্ছে—সোফা, টেবিল, টিপয়, বুক-কেস, রেডিয়ো—সবকিছুর ওপর নীট তিন ইঞ্চি ধুলোর আস্তর। ভোম্বল-বৌদি ঘরে পা দিয়েই স্রেফ অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

দু-হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে টেনিদা বললে, ইঃ—একেবারে নাইয়ে দিয়েছে রে !

আমি বললুম, ভালই তো হল। কাজ করতে চাইছিলে, কর এবার প্রাণ খুলে ! সারা দিন ধরেই ঝাঁট দিতে থাকো !

দাঁত খিচোতে গিয়েই বালির কিচ্‌কিচানিতে টেনিদা খপাৎ করে মুখ বন্ধ করে ফেলল।

—তা ঝাঁট তো দিতেই হবে ! বাড়িতে এসে এই দশা দেখবে নাকি ভোম্বলদা ? আয়—

—আবার কার্পেট !

—নিকুচি করেছে কার্পেটের ! চল্‌—ঝাঁটা খুঁজে বের করি।

ঝাঁটা আর পাওয়া যায় না। বসবার ঘরে নয়—শোবার ঘরে নয়, শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরে এসে হাজির হলুম আমরা।

—আরে ঐ তো ঝাঁটা !

তার আগেই জাল-দেওয়া মীট-সেফের দিকে নজর পড়েছে আমার।

—টেনিদা !

—কী হল আবার ?—টেনিদা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে, সারা ঘর ধুলোয় একাকার হয়ে রয়েছে—এখন আবার ডাকাডাকি কেন ? আয় শিগ্‌গির—একটু পরেই তো ওরা এসে পড়বে !

আমি বলছিলুম কি—কানদুটো একবার চুলকে নিয়ে জবাব দিলুম : মীট-সেফের ভেতর যেন গোটা-তিনেক ডিম দেখা যাচ্ছে !

—তাতে কী হল ?

—একটা মাখনের টিনও দেখতে পাচ্ছি।

টেনিদার মনোযোগ আকৃষ্ট হল।

—আচ্ছা বলে যা।

—দুটো কেরেসিন স্টোভ দেখতে পাচ্ছি—দু-বোতল তেল দেখা যাচ্ছে—ওখানে শেলফের ওপর একটা দেশলাইও যেন চোখে পড়ছে।

—হুঁ, তারপর ?

আমি ওয়াশ-বেসিনটা খুললুম।

—এতেও জল আছে—দেখতে পাচ্ছ তো ?

—সবই দেখতে পাচ্ছি। তারপর ?

আমি আর একবার বাঁ কানটা চুলকে নিলুম ঃ মানে সামনে এখন অনেক কাজ—যাকে বলে দুরূহ কর্তব্য ! ঘর থেকে ঐ মণখানেক ধুলো ঝেঁটিয়ে বের করতে ঘণ্টাখানেক তো মেহনত করতে হবে অন্তত ? আমি বলছিলুম কি, তার আগে একটু কিছু খেয়ে নিলে হয় না ? ধর তিনটে ডিম দিয়ে বেশ বড়-বড় দুটো ওমলেট হতে পারে—

—ব্যাস-ব্যাস, আর বলতে হবে না। টেনিদার জিভ থেকে সড়াক করে একটা আওয়াজ বেরুল ঃ এটা মন্দ বলিসনি। পেট খুশি থাকলে মেজাজটাও খুশি থাকে।—আর এই যে একটা বিস্কুটের টিনও দেখতে পাচ্ছি—

পত্রপাঠ টিনটা টেনে নামালো টেনিদা, কিন্তু খুলেই মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, ধেৎ !

—কী হল, বিস্কুট নেই ?

—নাঃ, কতগুলো ডালের বড়ি। ছ্যা-ছ্যা !—টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, জানিস, ভোম্বল-বৌদি এম. এ. পাশ, অথচ বিস্কুটের টিনে বড়ি রাখে। রামোঃ !

আমি বললুম, তাতে কী হয়েছে ? আমার এলাহাবাদের

সোনাদিও তো কি-সব থিসিস লিখে ডাক্তার হয়েছে—সেও তো ডালের বড়ি খেতে খুব ভালবাসে!

—রেখে দে তোর সোনাদি!—টেনিদা ঠক্ করে বড়ির টিনটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বললে, বলি, মতলব কী তোর? খালি তক্কোই করবি আমার সঙ্গে, না ওমলেট-টোমলেট ভাজবি?

—আচ্ছা, এস তাহলে, লেগে পড়া যাক।

লেগে যেতে দেরি হল না। সস্‌প্যান বেরুল, ডিম বেরুল, চামচে বেরুল, লবণ বেরুল, লঙ্কার গুঁড়োও পাওয়া গেল খানিকটা। শুধু গোটা-দুই পেঁয়াজ পাওয়া গেলেই আর দুঃখ থাকত না কোথাও।

টেনিদা বললে, ডি লা গ্র্যাণ্ডি! আরে, ওতেই হবে। তুই ডিম তিনটে ফেটিয়ে ভ্যাল্—আমি স্টোভ ধরাচ্ছি ততক্ষণে।

ওমলেট বরাবর খেয়েই এসেছি, কিন্তু কী করে ফোটাতে হয় সেটা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। নাকি, ফেটাতে বলছে? তা হলে তো তা দিতে হয়। কিন্তু তা দিতে থাকলে ও কি আর ডিম থাকবে? তখন তো বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। আর বাচ্চা বেরিয়ে এলে আর ওমলেট খাওয়া যাবে না—তখন চিকেন কারি রান্না করতে হবে। আর তাহলে—

টেনিদা বললে, অমন টিকটিকির মতো মুখ করে বসে আছিস কেন র‍্যা? তোকে ডিম ফেটাতে বললুম না?

—ফেটাতে বলছ? মানে, ফাটাতে হবে? নাকি ফোটাতে বলছ? ফোটাতে আমি পারব না সাফ বলে দিচ্ছি তোমাকে।

—কী জ্বালা!—টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল: কোন কাজের নয় এই হতচ্ছাড়াটা—খালি খেতেই জানে! ডিম কী করে ফেটাতে হয় তাও বলে দিতে হবে?

একটু ভেঙে নে—তারপর পেয়ালায় ঢেলে চামচ দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাক্। বুঝেছিস ?

আরে তাই তো! এতক্ষণে মালুম হল আমার। আমাদের পটলডাঙার 'দি গ্রেট আবার-খাবো রেস্তোরাঁ'র বয় কেষ্টাকে অনেকবার কাঁচের গেলাসে ডিমের গোলা মেশাতে দেখছি বটে।

পয়লা ডিমটা ভাঙতেই একটা বিচ্ছিরি বদ গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠল। দোসরা ডিম থেকেও সেই খোশবু।

নাক টিপে ধরে বললুম, টেনিদা—যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কিন্তু ডিম থেকে!

টেনিদা স্টোভে তেল ভরতে-ভরতে বললে, ডিম থেকে কবে আবার গোলাপ ফুলের গন্ধ বেরোয় ? নাকি ডিম ভাঙলে তা থেকে হালুয়ার সুবাস বেরুবে ? নে—নিজের কাজ করে যা।

—পচা বলে মনে হচ্ছে আমার।

—তোর মাথার ঘিলুগুলোই পচে গেছে—টেনিদা চটে বললে, একটা ভাল কাজের গোড়াতেই তুই বাগড়া দিবি! নে—হাত চালা। তোর ইচ্ছে না হয় থাস নি—আমি যা পারি ম্যানেজ করে নেব।

—করো, তুমিই করো তবে—বলে যেই তেস্‌রা নম্বর ডিম মেজেতে ঠুকেছি—

গল্-গল্ করে মেঝে থেকে যে বস্তু বেরিয়ে এল, তার যে কী নাম দেব তা আমি আজও জানি না। আর গন্ধ ? মনে হল দুনিয়ার সমস্ত বিকট বদ গন্ধকে কে যেন ওর মধ্যে ঠেসে রেখেছিল—একেবারে বোমার মতো ফেটে বেরিয়ে এল তারা! মনে হল, এক্ষুনি আমার দম আটকে যাবে!

—গেছি—গেছি—বলে আমি একদম ঠিকরে পড়লুম

বাইরে। সেই দুর্ধর্ষ মারাত্মক গন্ধের ধাক্কায় বোঁ করে যেন মাথাটা ঘুরে গেল, আর আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লুম শিবনেত্র হয়ে।

—উঁরে ব্বাঁপ—ইঁ কীঁ গন্ধ র‍্যা!—টেনিদার একটা আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর—

এবং তার পরেই—

টেনিদাও খুব সম্ভব একটা লাফ মেরেছিল। এবং পেল্লায় লাফ। পায়ের ধাক্কায় জ্বলন্ত কেরোসিন স্টোভটা তেল ছড়াতে ছড়াতে বলের মতো গড়িয়ে এল—সোজা গিয়ে হাজির হল ভোম্বলদার শোবার ঘরের দরজার সামনে। আর ভোম্বল-বৌদির সাধের সম্বলপুরী পর্দা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল তৎক্ষণাৎ।

টেনিদা বললে, আগুন—আগুন—ফায়ার ব্রিগেড—বসবার ঘরে টেলিফোন আছে প্যালা—দৌড়ে যা—জিরো ডায়েল—ফায়ার ব্রিগেড—

ঊর্ধ্বশ্বাসে ফোন করতে ঢুকেছি, সেই স্তূপাকার কার্পেটে পা আটকে গেল। হাতে টেলিফোনও তুলেছিলুম, সেইটে শুদ্ধুই ধপাস্ করে রাম-আছাড় খেলুম একটা। ক্র্যাং—কড়াৎ করে আওয়াজ উঠল। টেলিফোনের মাউথ-পীসটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দু-টুকরো। যাক, নিশ্চিন্দি! ফায়ার ব্রিগেডকে আর ডাকতে হল না।

উঠে বসবার আগেই ঝপাস্—ঝপাস্!

টেনিদা দৌড়ে বাথরুমে ঢুকেছে, আর দু-বালতি পনেরো দিনের পচা জল চৌবাচ্চা থেকে তুলে এনে ছুড়ে দিলে সম্বলপুরী পর্দার ওপর। আধখানা পর্দা পুড়িয়ে আগুন নিভেছে, কিন্তু শোবার ঘরে জলের ঢেউ খেলছে—বিছানা-পত্র ভিজে একাকার,

খানিকটা জল চল্‌কে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলটাকেও সাফ-সুফ করে দিয়েছে।

নিজেদের কীর্তির দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম আমরা। বাড়ি-ভর্তি পচা ডিম আর পোড়া কাপড়ের গন্ধ—বসবার ঘরে দু-ইঞ্চি ধুলোর আস্তর—শোবার ঘর আর বারান্দা জলে থই-থই—আধ-পোড়া পর্দাটা থেকে জল চুইয়ে পড়ছে, টেলিফোনটা ভেঙে চুরমার।

একেই বলে বাড়ি সুপারভাইজ করা—এর নামই জীবে প্রেম।

ঠিক তখনই নিচ থেকে ট্যাক্সির হর্ন বেজে উঠল—ভ্যাঁ—ভ্যাঁ-প্‌!

টেনিদা নড়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে মাথা সাফ হয়ে গেছে ওর। চিরকালই দেখে আসছি এটা।

—প্যালা, কুইক!

কিসের কুইক সে কথাও কি বলতে হবে আর? আমিও পটলডাঙার ছেলে—ট্যাক্সির হর্ন শুনেই বুঝতে পেরেছি সব। সিঁড়ি দিয়ে তো নামলুম না—যেন উড়ে পড়লুম রাস্তায়।

ট্যাক্সি থেকে ভোম্বলদা নামছেন, ভোম্বল-বৌদি নামছেন, ভোম্বলদার ছোকরা চাকর জলধরের কোলে ব্যাম্বি নামছে।

আমাদের দেখেই ভোম্বলদা চেঁচিয়ে উঠলেন—কিরে টেমি, বাড়িঘর সব—

—সব ঠিক আছে ভোম্বলদা—একেবারে ছবির মতো সাজিয়ে দিয়ে এসেছি!—বলেই টেনিদা চাবির গোছাটা ছুড়ে দিলে ভোম্বলদার দিকে। তারপর হতভম্ব ভোম্বলদা একটা কথা বলবার আগেই দু-জনে দু-লাফে একটা দু-নম্বর চলতি বাসের ওপর।

আর দাঁড়ানো চলে এরপর? এক সেকেণ্ডও?

আপাতত গভীর অরণ্যে ধ্যানে বসে আছি। বেশ দম নিয়েই ধ্যান করছি। শুধু কতগুলো পোকা উড়ে উড়ে ক্রমাগত নাকে মুখে এসে পড়ছে আর এমন বিশ্রী লাগছে যে কী বলব! নাকে ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কানের ভেতরে ঢুকে ওই গভীর গহ্বরটার ভেতরে কোন জটিল রহস্য আছে কি না সেটাও বোঝবার চেষ্টা করছে। একবার ঢোক গিলতে গিয়ে ডজনখানেক খেয়ে ফেলেছি। খেতে বেশ মৌরি মৌরি লাগল—কিন্তু যা বিকট গন্ধ। বমি করতে পারতাম, কিন্তু ধ্যান করতে বসলে তো আর বমি করা যায় না! তাড়াব সে উপায়ও নেই, কারণ এখন আমি সমাধিস্থ —একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প হয়েই থাকতে হবে আমাকে।

আমি গোড়াতেই বুঝেছিলাম এরকম হবে! হাবুলকেও বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু সে তখন ইন্দ্রত্ব লাভ করে কৈলাসে শিবের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছে, আমলই দিলে না। বললে, যাঃ, যাঃ, এখন ওসব ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিস নি। অরণ্যে পোকা থাকেই এবং নাকে মুখেও তারা পড়ে। চুপচাপ বরদাস্ত করে যা—নইলে মহর্ষি হবি কেমন করে?

তা বটে। তবে একটা জিনিস বুঝেছি, মহর্ষিদের মেজাজ অমন ভীমরুলের চাকের মতো কেন, আর কথায় কথায়ই তাঁরা অমন তেড়ে ব্রহ্মশাপ ঝাড়েন কেন! আরে বাপু, ধৈর্যের একটা সীমা তো আছে মানুষের! নাকে মুখে অমন পোকার উপদ্রব

হলে শান্তনুর মতো শান্ত মানুষও যে দুর্বাসা হতে বাধ্য এ ব্যাপারে আমার আর তিলমাত্রও সন্দেহ নেই।

আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়া গেল বাস্তবিক। সত্যি বলছি, আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে, পালাজ্বরে ভুগি আর বাসকপাতার রস খাই, আমার কী দায়টা পড়েছে মহর্ষি-টহর্ষির মতো গোলমেলে ব্যাপারে পা বাড়িয়ে? পটলডাঙার গলিতে থাকি, পটল দিয়ে শিংমাছের ঝোল আর আতপ চালের ভাত আমার বরাদ্দ, এক-মুঠো চানাচুর খেয়েছি কি পেটের গোলমালে আমার পটল তোলবার জো! এ-হেন আমি—একেবারে গোরুর মতো বেচারা লোক—আমিই শেষে পড়ে গেলাম ছ-হাত লম্বা আর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুক-ওলা টেনিদার পাল্লায়।

আর টেনিদার পাল্লায় পড়া মানে যে কী, যারা পড়ো নি—উঁহু, ভাবতেই পারবে না। গড়ের মাঠের গোরা থেকে চোরা-বাজারের চালিয়াৎ দোকানদার পর্যন্ত ঠেঙিয়ে একেবারে রপ্ত। হাত তুললেই মনে হবে রদ্দা মারলে, দাঁত বার করলেই বোধ হবে কামড়ে দিলে বোধহয়। এই ভৈরব ভয়ঙ্কর লোকের খপ্পরে পড়েই আমাকে এমন মহর্ষি হয়ে ধ্যান করতে হচ্ছে।

কী আর করি! বসে আছি তো বসেই আছি। অরণ্যের ভেতরে একটা ফুটো—সেখান দিয়ে দেখছি হতভাগা হাবুলের নাক বেরিয়ে আছে। পোকার কামড়ে জেরবার হয়ে ভাবছি ওই নাকেই একটা ধাঁ করে ঘুসি বসাব কি না, এমন সময় শিষ্য দধি-মুখের প্রবেশ।

দধিমুখ বললে, প্রভু, আছে নিবেদন।

বললাম, কহ বৎস, শুনিব নিশ্চয়।

দধিমুখ বললে,   কালি নিশিশেষে

দেখিলাম আশ্চর্য স্বপন।

দেখিলাম, প্রভু যেন দেবদেহ ধরি,

আরোহিয়া অগ্নিময় রথে,

চলেছেন মহাব্যোমে ছায়া-পথ করি বিদারণ!

সত্রাসে কহিনু কাঁদি—

ওয়াক্—ওয়াক্ থুঃ!

আর কী, পোকা! থু-থু করে দধিমুখ সেটা আমার গায়েই ঝেড়ে দিলে, শিষ্যের আস্পর্দাখানা দেখো একবার! রাগে আমার শরীর জ্বলে গেল,—টিকি খাড়া হয়ে উঠে ব্রহ্মতেজে। কিন্তু শিষ্যকে শাপ দিলেই তো সব মাটি। মনে মনে ভাবলাম, দাঁড়াও চাঁদ, তোমাকে সায়েস্তা করতে হচ্ছে!

হেসে বললাম,   আছে, আছে রহস্য অদ্ভুত!

নিরেট মগজ তব সহজে তো বুঝিবে না সেটা,

কাছে এসো কহি কানে কানে।

দধিমুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমার মুখ থেকে যা আশা করছিল তা শুনতে পায় নি—কী যে করবে ঠিক বুঝতে পারছে না! দধিমুখ অসহায়ভাবে একবার চারদিকে তাকাল।

আমি বললাম,   দাঁড়াইয়া কেন?

কাছে এসো, মুখ আনো কানের নিকটে,

তবে তো জানিবে সেই অদ্ভুত বারতা।

এসো বৎস—

বালক, আরো কাছে আয়—কাছে আয় না—

দধিমুখের বয়স অল্প—একেবারে আনাড়ি। ইতস্তত করে যেই আমার কানের কাছে মুখ আনা, অমনি আমি পালটা জবাব

দিলাম। মস্ত একটা হাঁ করলাম, সঙ্গে সঙ্গেই একঝাঁক পোকা পড়ল মুখের ভেতর। আর পত্রপাঠ সেগুলো থু-থু্ শব্দে ফেরত গেল দধিমুখে গালে, নাকে, মুখে, কপালে। শিষ্যকে গুরুর স্নেহাশিস।

দধিমুখ অ্যাঁ-অ্যাঁ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়াং করে ড্রপ সীন। খট্ করে বাঁশটা আমার নাকে পড়ল, তারপর সোজা নিচে। সীন শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তক্ষুনি স্টেজের ভেতর ছুটে এল ইন্দ্রবেশী হাবুল আর বিশ্বকর্মা-বেশী টেনিদা। টেনিদা বললে, এটা কী হল—অ্যাঁ ? এর মানেটা কী, শুনি ?

আমি বিদ্রোহ করে বললাম, কিসের মানে ?

টেনিদা দাঁত খিচিয়ে উঠল ঃ প্লে-টা তুই মাটি করবি হতভাগা ! কেন ওভাবে থুথু্ দিলি ক্যাবলার মুখে ? একদম বরবাদ হয়ে গেল সীনটা ! কী রকম হাসছে অডিয়েন্স—তা দেখছিস ?

আমি বললাম, ক্যাবলাই তো থুথু্ দিয়েছে আগে।

টেনিদা বললে, হুম্ ! দুটোর মাথাই একসঙ্গে ঠুকে দেব এক-জোড়া বেলের মতো ! যাক, যা হয়ে গেছে সে তো গেছেই। এখন পরের সীনগুলোকে ভাল করে ম্যানেজ করা চাই—বুঝলি ? যদি একটু বেয়াড়াপনা করিস তো একটা চাঁটির চোটে নাক একেবারে নাসিকে পাঠিবে দেব !

আমি বললাম, তুমি তো বলেই খালাস। কিন্তু স্টেজে হাঁ করে বসে ওই পোকা হজম করবে কে, সেটা শুনি ?

টেনিদা হুঙ্কার করল, তুই করবি। আলবাত, তোকেই করতে

হবে। থিয়েটার করতে পারবি আর পোকা খেতে পারবি না ? দরকার হলে মশা খেতে হবে, মাছি খেতে হবে—

হাবুল যোগ দিয়ে বললে, ইঁদুর খেতে হবে, বাদুড় খেতে হবে—

টেনিদা বললে, মাদুর খেতে হবে, এমন কি খাট-পালং খাওয়াও আশ্চর্য নয়। হুঁ-হুঁ বাবা, এর নাম থিয়েটার !

—থিয়েটার করতে গেলে ওসব খেতে হয় নাকি ?—আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালাম।

—হয়, হয়। তুই এসবের কি বুঝিস র‍্যা—অ্যাঁ ? দানীবাবুর নাম শুনেছিস, দানীবাবু ? তিনি যখন সীতার ভূমিকায় প্লে করতেন তখন মনুমেণ্ট খেয়ে নামতেন, সেটা জানিস ?

—মনুমেণ্ট খেয়ে !

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনুমেণ্ট খেয়ে। যাঃ—যাঃ ক্যাঁচ্‌ম্যাচ্‌ করিস নি ! এক্ষুনি সীন উঠবে—কেটে পড়্‌—নিজের পার্ট মুখস্থ করগে।

বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়ানো কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে আমি স্টেজের একধারে এসে বসলাম। মনুমেণ্ট খাওয়া ! চালিয়াতির আর জায়গা পাও নি—মানুষে কখনো মনুমেণ্ট খেতে পারে ! কিন্তু প্রতিবাদ করলেই চাঁটি, তাই অমন বোম্বাই চালখানাও হজম করে গেছি।

থিয়েটার করতে এলেই পোকা খেতে হবে ! কেন রে বাপু, তোমাদের সঙ্গে থিয়েটার না করতে পারলে তো আমার আর শিঙি মাছের ঝোল হজম হচ্ছিল না কিনা ! আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে, আমার পেটজোড়া পিলে—দায় পড়েছিল আমার এক-মুখ কুট্‌কুটে দাড়ি নিয়ে দধীচি সাজতে ! যত সব জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে পড়ে এখন আমার এই হাড়ির হাল !

দিব্যি বসে ছিলাম চাটুজ্জেদের রোয়াকে—ওরা উঠোনে হাত-পা নেড়ে রিহার্সেল দিচ্ছিল। কিন্তু দধীচি সাজবার ছেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। টেনিদা তার ভাঁটার মতো চোখ পাকিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এসে খপ্ করে আমার কাঁধটা ধরে ফেলল ঃ অ্যাই পাওয়া গেছে!

আমি বললাম, অ্যাঁ—অ্যাঁ—

টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ-হ্যাঁ। দিব্যি মুনি-ঋষির মতো চেহারা তোর, বেশ অহিংস ছাগল-ছাগল ভাব। গালে ছাগলের মতো দাড়ি লাগিয়ে দেব,—যা মানাবে, আঃ! দেখাবে একেবারে রায়বাড়ির কেশো-বুড়োটার মতো!

আপাতত এই তার পরিণতি।

এ অঙ্কে আমার পার্ট নেই, তাই স্টেজের অন্ধকারে একটা কোণায় ঝিম্ মেরে বসে আছি। দাড়িটা হাতে খুলে নিয়েছি, আর মশা তাড়াচ্ছি প্রাণপণে। নাঃ—এ অসম্ভব! আবার স্টেজে গেলেই ধ্যানে বসতে হবে এবং ধ্যানে বসা মানেই পোকা। আর কী মারাত্মক সে পোকা!

কী করা যায়?

রাগে হাড়-পিত্তি জ্বলছে! দয়া করে পার্ট করছি এই ঢের তার ওপর আবার অপমান! এমন করে শাসানো! চাঁটি হাঁকড়ে নাক নাসিকে উড়িয়ে দেবে! ইস্, শখখানা দেখ একবার। না হয় তোমার আছেই পিরামিডের মতো উঁচু একটা অতিকায় নাক, আর আমার নাকটা না-হয় চীনম্যানদের মতো থ্যাবড়া, তাই বলে নাক নিয়ে অপমান! আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও! এই খাঁদা নাককেই—মৈনাকের মতো উঁচু করে তোমার ভরাডুবি করে ছাড়ব!

কিন্তু কী করা যায় বাস্তবিক ?

ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না, ওদিকে স্টেজে তখন দারুণ বক্তৃতা দিচ্ছে টেনিদা, এমন এক-একটা লাফ মারছে যে চাটুজ্জেদের ছারপোকাভরা পুরনো তক্তাপোশটা একেবারে মড়্-মড়্ করে উঠছে। থিয়েটার করছে না হাই-জাম্প দিচ্ছে বোঝা মুশকিল।

স্টেজ-মানেজার হাবুল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বললে, এই প্যালা, অমন ভূতের মতো অন্ধকারে বসে আছিস যে ?

বললাম, একটু চা খাওয়া না ভাই হাবুল, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে !

হাবুল নাকটা কুঁচকে বললে, নেঃ নেঃ, অত চা খায় না ! যা পার্ট করছিস, আবার চা !

অ্যাডিং ইনসাল্ট্ টু ইনজুরি—অ্যাঁ ! আমি অন্ধকারে দাঁত বের করে হাবুলকে ভেংচে দিলাম, হাবুল দেখতে পেলে না।

চম্পট দেব নাকি দাড়ি-ফাড়ি নিয়ে ? সোজা চলে যাব বাড়িতে ? দধীচির সীনে যখন দেখবে আমি বেমালুম হাওয়া—তখন টের পাবে মজাটা কাকে বলে ! উঁহু—তাতে সুবিধে হবে না। তারপর কাল সকালে আমাকে বাঁচায় কে ? পটলডাঙার বিখ্যাত টেনিদার বিখ্যাত চাঁটিতে স্রেফ পটল তুলে বসতে হবে।

না—না, ওসব নয়। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এমন জব্দ করে দেব যে কিল খেয়ে কিলটি সোনা মুখ করে গিলে নিতে হবে। টেনিদার বত্রিশ পাটি দাঁতের সঙ্গে আর একটি দাঁত গজিয়ে দেব—যার নাম আক্কেল-দাঁত। আর সেইসঙ্গে টেনিদার ধামাধরা ওই স্টেজ-ম্যানেজার শ্রীমান হাবুল সেনকেও টেরটি পাইয়ে দিতে হচ্ছে !

ভগবানকে ডেকে বললাম, প্রভু, আলো দাও—এ অন্ধকারে পথ দেখাও। এবং প্রভু আলো দিলেন।

হাবুলকে বললাম, ভাই, পাঁচ মিনিটের জন্যে একটু বাড়ি থেকে আসছি।

হাবুল আঁতকে বললে, কেন ?

—এই, পেটটা একটু কেমন কেমন—

হাবুল বললে, সেরেছে ! যত সব পেটরোগা নিয়ে কারবার—শেষটায় ডেবাবে বোধ হচ্ছে! একটু পরেই যে তোর পার্ট রে !

আমি বললাম, না, এক্ষুনি আসছি।

মনে মনে বললাম, পেট কার কেমন একটু পরেই দেখা যাবে এখন। মনুমেণ্ট খাইয়ে পার্ট করাতে চাও—দেখি আরো কত গুরুপাক জিনিস হজম করতে পারো !

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরলাম। ডাক্তার ছোট-কাকার ওষুধের আলমারিটা হাতড়াতে বেশি সময় লাগে নি—একেবারে মোক্ষম ওষুধ নিয়ে এসেছি। হিসেব করে দেখেছি আমার পার্ট আসতে আরো প্রায় ঘণ্টা-খানেক দেরি—এর মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।

চায়ের বড় কেটলিটা যেখানে উনানের ওপর ফুটছে, সেখানে গেলাম। তখন কেটলির দিকে কারো মন নেই, সবাই উইংসে ঝুঁকে পড়ে প্লে দেখছে। টেনিদা লাফাচ্ছে ভীমসেনের মতো—আর সে কী ঘন-ঘন ক্ল্যাপ! দাঁড়াও দাঁড়াও—কত ক্ল্যাপ চাও দেখব !

পিরামিডের মতো নাক উঁচু করে বিজয়-গৌরবে ফিরে এল টেনিদা। একগাল হাসি ছড়িয়ে বললে, কেমন পার্ট হল রে হাবুল ?

হাবুল কৃতার্থভাবে বললে, চমৎকার, চমৎকার! তুমি ছাড়া এমন পার্ট, আর কে করতে পারত? অডিয়েন্স বলছে, সাবাস সাবাস!

অডিয়েন্স কেন সাবাস্ সাবাস্ বলছে আমি জানি। তারা বুঝতেই পারে নি যে ওটা ভীমের না বিশ্বকর্মার পার্ট। কিন্তু আসল পার্ট আর একটুখানি দেরি আছে—আমি মনে মনে বললাম।

স্টেজ কাঁপিয়ে টেনিদা হুঙ্কার ছাড়লে, চা—ওরে চা আন্—

হাবুল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

আবার ড্রপ উঠেছে। দধীচির ভূমিকায় আমি ধ্যানস্থ হয়ে বসে পোকা খাচ্ছি। শিষ্য দধিমুখ এবার দূরে দাঁড়িয়ে আছে—আগের অভিজ্ঞতাটা ভোলে নি।

বিশ্বকর্মা আর ইন্দ্রের প্রবেশ। টেনিদা আর হাবুল।

হাবুল বললে, প্রভু, গুরুদেব,
আসিয়াছি শিবের আদেশে।
তব অস্থি দিয়া
যেই বজ্র হইবে নির্মাণ—

টেনিদা বললে, দেখাইব বিশ্বকর্মা-যশ।
হেন অস্ত্র তুলিব গড়িয়া,
দীপ্ততেজে দগ্ধ হবে স্থাবর-জঙ্গম,—

তারপরেই স্বগতোক্তি করলে, উঃ, জোর কামড় মেরেছে পেটে মাইরি!

হাবুল চাপা গলায় বললে, আমারও পেটটা যেন কেমন গোলাচ্ছে রে !

অড়েচোখে আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম মাত্র। মনুমেণ্ট খেয়ে হজম করতে পারো, দেখিই না হজমের জোর কত !

আমি বললাম, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ—

আগে করি ইষ্ট-নাম ধ্যান—
ধ্যান-ভঙ্গ যতক্ষণ নাহি হয়,
চুপচাপ থাকো ততক্ষণ !
তারপরে তনুত্যাগ করিব নিশ্চয়।

আমি ধ্যানে লসলাম। সহজে এ ধ্যান ভাঙছে না। পোকার উপদ্রব লেগেই আছে—তা থাক। আমি কষ্ট না করলে টেনিদা আর হাবুলের কেষ্ট মিলবে না। গরম চায়ের সঙ্গে কড়া পার্গেটিভ—এখনই কী হয়েছে !

টেনিদা মুখ বাঁকা করলে, শীগগির ধ্যান শেষ কর্ মাইরি ! জোর পেট কামড়াচ্ছে রে !

আমি বললাম, চুপ ! ধ্যান-ভঙ্গ করিও না,

ব্রহ্মশাপ লাগিবে তাহলে—

ধ্যান কী সত্যি-সত্যিই করছি নাকি ? আরে ধ্যাৎ ! আমি আড়চোখে দেখছি, টেনিদার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে মেরে গেছে।

হাবুলের অবস্থাও তথৈবচ। ভগবান করুণাময় !

টেনিদা কাতর স্বরে বললে, ওরে প্যালা, গেলাম যে ! দোহাই তোর, গিগগির ধ্যান শেষ কর্—তোর পায়ে পড়ছি প্যালা—

হাবুল বললে, ওরে আমার যে প্রাণ যায়—

আমি একেবারে নট্-নড়ন-চড়ন। সামলাও এখন! মুনি-ঋষির ধ্যান—দেহত্যাগের ব্যাপার—এ কি সহজে ভাঙবার জিনিস!

—বাপ্‌স্ গেলাম—এক লম্ফে টেনিদা অদৃশ্য। একেবারে সোজা অন্ধকার আমতলার দিকে। পেছনে পেছনে হাবুল।

আর থিয়েটার?

সে কথা বলে কী হবে!

সমাপ্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কম্বল নিরুদ্দেশ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রকাশ করেছেন

ননীগোপাল সিংহরায়

দীপঙ্কর প্রকাশন

১৫, নিউ সন্তোষপুর ফার্স্ট লেন

কলকাতা-৩২

ছেপেছেন

সুশীলকুমার ঘোষ

মনোরম প্রিণ্টার্স

৪০এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ ও ছবি এঁকেছেন

নীতীশ মুখোপাধ্যায়

২'৫০

'সন্দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার সময় এ কাহিনী প্রচুর কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল। 'চারমূর্তি' কোম্পানির টেনিদাদের নতুন কীর্তি।

ভিতরের ছবির ব্লকগুলির জন্যে 'সন্দেশ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

অনেক ভেবে চিন্তে চারজন শেষ পর্যন্ত বদ্রীবাবুর 'দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রিন্টিং হাউসে' ঢুকে পড়লুম। নাম যতই জাঁদরেল হোক, প্রেসের ভেতরটায় কেমন আবছা অন্ধকার। এই দিনের বেলাতেও রাম-ছাগলের ঘোলাটে চোখের মতন কয়েকটা হলদে হলদে ইলেকট্রিকের বাল্‌ব্‌ জ্বলছিল এদিকে ওদিকে ; পুরোনো কতগুলো টাইপ-কেসের সামনে ঝুঁকে পড়ে ঘষা কাচের মতো চশমা পরা একজন বুড়ো কম্পোজিটার চিমটে দিয়ে অক্ষর খুঁটে খুঁটে 'গ্যালি' সাজাচ্ছিল ; ওধারে একজন ঘটাং ঘটাং করে প্রেসে কি ছেপে যাচ্ছিল, উড়ে পড়ছিল নতুন-ছাপা-হওয়া কাগজ—আর একজন তা গুছিয়ে রাখছিল। পুরোনো নোনাধরা দেওয়াল, কুলুংগিতে সিদ্ধিদাতা গণেশ রয়েছেন, তাঁর পায়ের কাছে বসে একজোড়া আরশোলা বোধহয় ছাপার কাজই তদারক করছিল, হাত-কয়েক দূরে পেটমোটা একটা টিকটিকি জ্বলন্ত চোখে লক্ষ্য করছিল তাদের। ঘরময় কালির গন্ধ, কাগজের গন্ধ, নোনার গন্ধ, আর তারই ভেতরে টেবিল চেয়ার পেতে, খাতা-কাগজপত্র—কালি কলম—টেলিফোন

এইসব নিয়ে বজ্রীবাবু একমনে মস্ত একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি থেকে তেলমাখা মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা খাচ্ছিলেন।

টেনিদা আর হাবুলের পাল্লায় পড়ে বজ্রীবাবুর প্রেসে ঢুকে পড়েছি, নইলে আমার এখানে আসবার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। ক্যাবলারও না। আমরা দু-জনেই প্রতিবাদ করে বলেছিলুম, 'কী দরকার? যাদের বাড়ির ছেলে, তাদের যখন কোন গরজ নেই, আমরা কেন খামোকা নাক গলাতে যাই?'

কিন্তু টেনিদার নাকটা একটু বেয়াড়া রকমের লম্বা, আর লম্বা নাকের মুস্কিল এই যে পরের ব্যাপারে না ঢোকালে সেটা সুড়সুড় করতে থাকে। টেনিদা খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'বা রে, তাই বলে পাড়ার একটা জলজ্যান্ত ছেলে ডুম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে?'

'হয়ে যাক না'—ক্যাবলা খুশি হয়ে বললে, 'অমন ছেলে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকলেই পাড়ার লোকের হাড় জুড়োয়। কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দেবে, গোরুর পিঠে আছাড়ে পটকা ফাটাবে, বেড়ালছানাকে চৌবাচ্চার জলে চুবোবে, গরিব ফিরিওলার জিনিস হাতসাফাই করবে, ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে অকারণে মারধোর করবে, ঢিল ছুড়ে লোকের জানালার কাচ ভাঙবে—ও আপদ একেবারেই বিদায় হয়ে যাক না! হনোলুলু কিংবা হণ্ডুরাস যেখানে খুশি যাক, মোদ্দা পাড়ায় আর না ফিরলেই হল।'

শুনে নাকটাকে ঠিক বাদাম-বরফির মতো করে টেনিদা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ক্যাবলার দিকে। তারপর বললে, 'ইস্-স্, কী পাষাণ প্রাণ নিয়ে জন্মেছিস ক্যাবলা! তুই শুধু পরীক্ষাতেই স্কলারশিপ পাস, কিন্তু মায়া-দয়া কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। না-হয় কম্বল এক আধটু দুষ্টুমি করেই, তাই বলে একটা নিরীহ শিশুকে—'

'নিরীহ শিশু!'—ক্যাবলা বললে, 'দু-বার ক্লাস সেভেনে ডিগবাজি খেল, তলা থেকে ও পোক্ত হয়ে আসছে—এখনো শিশু! তাহলে দেড় হাত দাড়ি গজানো পর্যন্তও কম্বল শিশুই থাকবে, ওর বয়েস আর বাড়বে না। আর—নিরীহ! অমন বিচ্ছু, অমন বিট্‌লে, অমন মারাত্মক—'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মারাত্মক বলে মারাত্মক! কম্বলকে সাধুভাষায় সর্বার্থসাধক, কিঞ্জল্ক, ডিণ্ডিম, এমনকি স্থপস্থপা সমাস বললেও অন্যায় হয় না! এই তো সেদিন পয়লা বোশেখে আমায় বললে, প্যালাদা, তোমায় একটা নববর্ষের পেন্নাম করব। আমি অবাক হয়ে ভাবছি ব্যাপারটা কী, কম্বলের মত ভক্তি কেন—আর ভাবতে ভাবতেই পেন্নামের নাম করে আমার দু-পায়ে বিছুটির পাতা ঘষে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। তারপর এক ঘণ্টা ধরে আমি দাপিয়ে মরি! ওরকম বহুব্রীহি-মার্কা ছেলের চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হওয়াই ভাল—আমি ক্যাবলার কথায় ডিটো দিচ্ছি।'

টেনিদা রেগে বললে, 'শাটাপ! ফের যদি কুরুবকের মতো বক-বক করবি, তাহলে এক চড়ে কানগুলো কানপুরে পাঠিয়ে দেব!'

হাবুল অনেকক্ষণ ধরে একমনে কী যেন খাচ্ছিল, মুখটা বন্ধ ছিল তার। এতক্ষণে সেটাকে সাবাড় করে ঘাড় নেড়ে বললে, 'কানগুলান্ কর্ণাটেও পাঠাইতে পারো।'

'তাও পারি। নাক নাসিকে পাঠাতে পারি, দাঁত দাঁতনে পাঠাতে পারি, আরো অনেক কিছুই পারি। আপাতত কেবল ওয়ার্নিং দিয়ে রাখলুম। ক্যাবলা, প্যালা—নো তর্ক, ফলো ইওর লীডার—মার্চ!'

ক্যাবলা গোঁজ হয়ে রইল, আমি গোঁ-গোঁ করতে লাগলুম।

হাবুল আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'আরে না হয় দিছেই তর পায়ে বিছুটি ঘইষ্যা—তাতে অত রাগ করস্ ক্যান ? ক্ষমা কইরা দে। ক্ষমাই পরম ধর্ম—জানস্ না ?' শুনে আমি হাবুলের কানে কুটুস করে এমটা চিমটি দিলুম—হাবুল চ্যাঁ করে উঠল।

আমি বললুম, 'রাগ করিস নি হাবলা, ক্ষমাই পরম ধর্ম, জানিস না ?'

টেনিদা বললে, 'কোয়ায়েট ! নিজেদের মধ্যে আর ঝগড়া-ঝাটির কোন মানে হয় না। এখন অতি কঠিন কর্তব্য আমাদের সামনে। আমরা বদ্রীবাবুর ওখানে যাব। গিয়ে তাঁকে জানাব যে কম্বলকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমরা তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

ক্যাবলা কান চুলকে বললে, 'কিন্তু তিনি তো আমাদের সাহায্য চান নি !'

'আমরা উপযাচক হয়ে পরোপকার করব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু বদ্রীবাবু যদি আমাদের তাড়া করেন ?'

ভুরু কুঁচকে টেনিদা বললে, 'তাড়া করবেন কেন ?'

'বদ্রীবাবু সকলকে তাড়া করেন। দরজায় ভিখিরী গেলে তেড়ে আসেন, রিক্‌শাওয়ালাকে কম পয়সা দিয়ে ঝগড়া বাধান—তারপর তাকে তাড়া করেন, ঝি-চাকরকে দু-বেলা তাড়া করেন, বাড়ির কার্নিশে কাক বসলে তাকে—'

টেনিদা এবার ঠুকুস্ করে আমার চাঁদিতে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে :

'ওফ্—এই কুকুরটার মুখ তো কিছুতেই বন্ধ হয় না ! আমরা ভিখিরী, না রিকশাওয়ালা, না দাঁড়কাক, না ওঁর ঝি-চাকর ? যাচ্ছি উবগার করতে, ভদ্রলোক আমাদের তেড়ে আসবেন ? কী যে বলিস তার ঠিক নেই ! পাগল, না পেটখারাপ ?'

'প্যাটই খারাপ'—হাবুল মাথা নেড়ে বললে, 'চিরটা কালই দেখতাছি প্যাট নিয়াই প্যালার যত ঝ্যাটা।'

টেনিদা বললে, 'চুলোয় যাক ওর পেট! এখানে বসে আর গুলতানি করে দরকার নেই—নাউ টু অ্যাকশন! চল এবার বদ্রীবাবুর কাছেই যাওয়া যাক।'

আমরা কেন এসেছি, বদ্রীবাবু সে কথা শুনলেন। প্যাঁচার মতো গম্ভীর মুখে মুড়ির বাটিটা একটু একটু করে সাবাড় করলেন, শেষে আধখানা কাঁচালঙ্কা কচমচ করে চিবিয়ে খেলেন। তারপর কোঁচায় মুখ মুছে বললেন, 'হুঁ!'

টেনিদা বললে, 'কম্বলকে খোঁজবার জন্যে আপনি কী করছেন?'

বদ্রীবাবু খ্যারখেরে মোটা গলায় বললেন, 'আমি আবার কী করব? কী-ই-বা করার আছে আমার?'

হাবুল বললে, 'হাজার হোক, পোলাডা তো আপনার ভাইপো!'

'নিশ্চয়!'—বদ্রীবাবু মাথা নাড়লেন: 'আমার মা-বাপ-মরা একমাত্র ভাইপো, আমারও কোন ছেলেপুলে নেই। আমার প্রেস, পয়সা-কড়ি—সবই সে পাবে।'

'তবু আপনি তাকে খুঁজবেন না?'—টেনিদা জানতে চাইল।

'কী করে খুঁজব?'—বদ্রীবাবু হাই তুললেন।

'কেন, কাগজে তো বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।'

'কী লিখব? বাবা কম্বল, ফিরিয়া আইস? তোমার খুড়িমা তোমার জন্য মৃত্যুশয্যায়? ঠিকানা দাও—টাকা পাঠাইব? সে অত্যন্ত ঘোড়েল ছেলে। ঠিকানা দেবে, আমি টাকা পাঠাব—টাকাও সে নেবে, কিন্তু বাড়ি ফিরবে না।'

'কেন ফিরবে না?'—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'তার কারণ'—বদ্রীবাবু একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁতের গোড়া খুঁটতে খুঁটতে বললেন, 'দু-দুবার ক্লাস সেভেনে ফেল করায়

আমি তার জন্যে যে মাস্টার এনেছি, সে নামকরা কুস্তিগীর। তার হাতের একটা রদ্দা খেলে হাতি পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যায়। কম্বল স্বেচ্ছায় আসবে না। মাস্টার নিরুদ্দেশ না হলে তার উদ্দেশ মিলবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আপনে থানায় খবর দিলেন না ক্যান?'—হাবুল বললে, 'তারা

'থানা?'—বদ্রীবাবু একটা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেললেন: 'মাস-দুই আগে আমার প্রেসের কিছু টাইপ চুরি হয়ে গিয়েছিল, আমি থানায় গিয়েছিলুম। সঙ্গে ছিল কম্বল। দারোগা এজাহার নিচ্ছিলেন, টেবিলের তলায় তাঁর পেয়ারের কুকুরটা ঘুমুচ্ছিল। কম্বল নিচু হয়ে কী করছিল কে জানে, কিন্তু হঠাৎ একটা বিটকেল কাণ্ড ঘটে গেল। বিকট সুরে ঘ্যাও-ঘ্যাও আওয়াজ ছেড়ে কুকুরটা এক লাফে টেবিলে উঠে পড়ল, আর-এক লাফে চড়ল একটা আলমারির মাথায়, সেখান থেকে একরাশ ধুলোভরা ফাইল নিয়ে নিচে আছড়ে পড়ে গেল। একজন পুলিশ তাকে ধরতে যাচ্ছিল—ঘোয়ঙ বলে তাকে কামড়ে দিয়ে—ঘ্যাঁকো ঘ্যাঁকো বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দরজা দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল কুকুরটা। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার! এজাহার চুলোয় গেল, থানায় হুলুস্থুলু কাণ্ড—পাকড়ো পাকড়ো বলে দারোগা কুকুরের পেছনে ছুটলেন। কী হয়েছিল জান?'

বদ্রীবাবু একটু থেমে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। ক্যাবলা বললে, 'কী হয়েছিল?'

'কম্বল পকেটে হোমিয়োপ্যাথিক শিশিতে ভর্তি করে লাল পিঁপড়ে নিয়ে গিয়েছিল আর সেগুলো ঢেলে দিয়েছিল কুকুরটার কানে। দারোগা কম্বলকে ঠাস-ঠাস করে কয়েকটা চড় দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তাকে কিংবা আমাকে থানার কাছাকাছি

দেখলেও পুরোপুরি সাতদিন হাজতে পুরে রেখে দেবেন।

টেনিদা বললেন, 'আপনার কী দোষ? আপনি তো আর কুকুরের কানে পিঁপড়ে দেন নি!'

'কিন্তু দারোগার ধারণা, মন্ত্রটা আমিই দিয়েছি কম্বলের কানে। অভিভাবকের কাছ থেকেই তো ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়।'

'হুঁ, তাহলে আপনার থানায় যাবার পথ বন্ধ'—টেনিদা মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা, আমরা যদি আপনার হয়ে—'

বাধা দিয়ে বদ্রীবাবু বললেন, 'কিচ্ছু করতে হবে না। আমি জানি, কম্বলকে আর পাওয়া যাবে না। সে যেখানে গেছে, সেখান থেকে আর ফিরে আসবে না।'

'কী সর্বনাশ!'—আমি আঁতকে উঠে বললুম, 'মারা গেছে নাকি?'

'মারা যাওয়ার পাত্র সে নয়!'—বদ্রীবাবু কান থেকে একটা বিড়ি নামিয়ে ফস্ করে সেটা ধরালেন : 'সে গেছে দূরে—বহু দূরে।'

হাবুল বললে, 'কই গেছে? দিল্লী?'

'দিল্লী?' বদ্রীবাবু বললেন, 'ফুঃ!'

'তবে কোথায়?'—টেনিদা বললে, 'বিলেতে? আফ্রিকায়?'

একমুখ বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে বদ্রীবাবু বললেন, 'না, আরো দূরে। ছেলেবেলা থেকেই তার সেখানে যাওয়ার ন্যাক ছিল। সে গেছে চাঁদে।'

'কী বললেন?'—চারজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম আমরা।

'বললুম কম্বল চাঁদে গেছে'—এই বলে বদ্রীবাবু আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা মুখের ওপর একরাশ বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন।

দুই

আমরা চারজন বদ্রীবাবুর কথা শুনে পরোটার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর টেনিদার উঁচু নাকটা ঠিক একটা ডিম ভাজার মতো হয়ে গেল। বদ্রীবাবু আমাদের ঠাট্টা করছেন কি না বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অমন হাঁড়ির মতো যাঁর মুখ আর বিতিকিচ্ছিরি তিরিক্ষি যাঁর মেজাজ—এই ঝুপসি প্রেসটার ভেতরে একটা হুতোম প্যাঁচার মতো বসে বসে আর কচর-মচর করে মুড়ি চিবুতে চিবুতে তিনি আমাদের ঠাট্টা করবেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

ঠিক সেই সময় প্রেসের পেছন দিকে, বদ্রীবাবুর রান্নাঘর থেকে কড়া রসুন আর লঙ্কার ঝাঁঝের সঙ্গে উৎকট গন্ধ ভেসে এল একটা। খুব সম্ভব শুঁটকি মাছ। সে গন্ধ এমনি জাঁদরেল যে আমরা চার-জনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম—আমাদের ঘোর কেটে গেল।

টেনিদা একবার মাথা চুলকে বললে, 'আপনি ঠিক বলেছেন স্যার, কম্বল চাঁদেই—'

বদ্রীবাবু বললেন, 'আই আম শিয়োর।'

ক্যাবলা তার চশমার ভেতর দিয়ে প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। গত বছর চশমা নেবার পর থেকেই ওকে খুব ভারিক্কি-গোছের দেখায়। মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বললে, 'আপনি এত শিয়োর হলেন কী করে, জানতে পারি কি? যে চাঁদে রাশিয়ানরা এখনো যেতে পারল না, আমেরিকানরাও আজ পর্যন্ত—'

'ওরা না পারলেও কম্বল পারে'—সংক্ষেপে জবাব দিলেন বদ্রীবাবু।

রান্নাঘর থেকে শুঁটকি মাছের সেই বিকট গন্ধটা আসছিল, তাতে নাক-টাক কুঁচকে বেজায়-রকম একটা হাঁচতে যাচ্ছিল হাবুল। কী কায়দায় যে ও হাঁচিটাকে সামলে নিলে আমি জানি না। বিচ্ছিরি মুখ করে কেমন একটা ভুতুড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলে: 'ডানা আছে বুঝি কম্বলের? উইড়্যা যাইতে পারে?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।' বক্রাবাবু ভাবুকের মতো ঘাড় নাড়তে লাগলেন: 'তবে ও যা ছেলে, ওর এতদিনে যে ডানা গজায় নি এ কথাও আমি বিশ্বাস করি না। খুব সম্ভব জামার তলায় ওর ডানা লুকোনো থাকত—আমি দেখতে পাই নি।'

'তাহলে আপনি বলছেন', টেনিদা খাবি খেয়ে বললে, 'সেই ডানা মেলে কম্বল পরীদের মতো উড়ে গেছে?'

'এগ্‌জ্যাকটলি।'

ক্যাবলা বিড়বিড়িয়ে বললে, 'গাঁজা! ক্লীন গাঁজা!'

'তুমি ওখানে হুড়মুড় করে কী বলছ হে ছোকরা?' বক্রাবাবুর চোখ চোখা হয়ে উঠল, বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন: 'কী বকছ—অ্যাঁ?'

'কিছু না স্যার—কিচ্ছু না!' হাবুল সেন চটপট সামলে নিলে: 'কইতাছিল—আহা, কী মজা!'

'মজা বই কি, দারুণ মজা!' বক্রাবাবুর প্যাঁচার মতো প্যাঁচালো মুখে একবার একটুকরো হাসি দেখা দিল: 'জানো, ছেলেবেলা থেকেই ওর চাঁদের দিকে ঝোঁক। পাঁচ বছর বয়সে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে 'চাঁদ খাব' বলে পেল্লায় চিৎকার জুড়ল—রাত দুটো পর্যন্ত পাড়ার লোকে ঘুমুতে পারে না। শেষে পুরো একখানা পাটালি খাইয়ে ওকে থামাতে হয়। বারো বছরের সময় চাঁদ ধরবার জন্যে একটা নিমগাছে উঠে বাদুড়ের ঠোকর খেয়ে পানা-পুকুরের ভেতরে পড়ে গিয়েছিল—ভাগ্যিস বেশি জল ছিল না,

তাই রক্ষে। তারপর বড় হয়ে চাঁদা আদায় করতে ওর কী উৎসাহ! সরস্বতী পুজো হোক, ঘেঁটু পুজো হোক আর ঘণ্টাকর্ণ পুজোই হোক—চাঁদার নাম শুনলেই স্রেফ নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। সেইজন্যেই বলছিলুম, চাঁদ সম্পর্কে ওর বরাবরই একটা ন্যাক আছে।'

'চাঁদার ব্যাপারে ন্যাক অনেকেরই থাকে, সে কিছু নতুন কথা নয়।' টেনিদা একবার গলা-খাঁকারি দিলে: 'কিন্তু আমরা যদি কম্বলকে খুঁজে বের করতে পারি, আপনার কোনো আপত্তি আছে বদ্রীবাবু?'

'খুঁজে বের করতে পারলে আপত্তি নেই, না পারলেও আপত্তি নেই।' বদ্রীবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু পয়সা-কড়ি কিছু দিতে পারব না। তোমরা যে গোয়েন্দাগিরির ফী চেয়ে বসবে সেটি হচ্ছে না। সেইটে বুঝে তাকে চাঁদ থেকেই ধরে আনো, কিংবা চাঁদোয়ার ওপর থেকেই টেনে নামাও।'

'আজ্ঞে কিছুই দিতে হবে না।' টেনিদা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, 'একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না আপনাকে। শুধু একটু সাহায্য করতে হবে অন্যভাবে।'

'পয়সা খরচ না হলে আমি সবরকম সাহায্যেই রাজি আছি তোমাদের।' এবার বেশ উৎসাহিত দেখা গেল বদ্রীবাবুকে: 'বলো কী করতে হবে।'

টেনিদা এবার ক্যাবলার দিকে তাকালো। বললে, 'ক্যাবলা!'

'ইয়েস লীডার!'

'আমরা বদ্রীবাবুর কাছ থেকে কী সাহায্য পেতে পারি?'

ক্যাবলা বললে, 'উনি আমাদের কিছু দরকারি ইনফরমেশন দিতে পারেন।'

'জেনে নাও।' টেনিদা এর মধ্যেই বদ্রীবাবুর সামনে একখানা

'পারলে আপত্তি নেই, না পারলেও আপত্তি নেই'

চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছিল। এবারে গম্ভীর হয়ে পা নাচাতে লাগল।

ক্যাবলা তার চশমা-পরা ভারিক্কি মুখে এমনভাবে চারদিকে তাকালো যে ঠিক মনে হল যেন ইন্‌স্‌পেক্টর স্কুল দেখতে এসেছেন। তারপর মোটা গলায় বললে, 'আচ্ছা বদ্রীবাবু!'

'হুঁ।'

'নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে আপনি কোনরকম ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন কম্বলের?'

ক্যাবলার সেই দারুণ সীরিয়াস ভঙ্গি আর মোটা গলা দেখে আমার তাজ্জব লেগে গেল। হাঁ, পুলিশে ঠিক এমনিভাবেই জেরা-টেরা করে বটে। এমনকি, বদ্রীবাবুও যেন ঘাবড়ে গেলেন খানিকটা।

'ইয়ে—ভাবান্তর—মানে হ্যাঁ, একটু ভাবান্তর হয়েছিল বই-কি। অমন একখানা জাঁদরেল মাস্টার দেখলে কেই বা খুশি হয় বলো, যার একটা ঘুসিতেই কম্বল তেঁতুলের অম্বল হয়ে যেত!'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তাহলে ঘুসি কম্বল খায়নি?'

'খেপেছ তুমি!' বদ্রীবাবু মুখ বাঁকালেন: 'খেলে কি আর চাঁদে যেত? স্বর্গে পৌঁছুত তার আগে। আসলে মাস্টার প্রথম দিন এসে খুব শাসিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, কাল এসে যদি দেখি যে পড়া হয় নি, তাহলে পিটিয়ে তোকে ছাতু করে দেব।

হাবুল বললে, 'অ—বুঝছি। পলাইয়া আত্মরক্ষা কোরছে।'

'তা ওভাবেও বলতে পারো কথাটা। পালিয়েছে মাস্টারের ভয়েই, তাতে সন্দেহ নেই।' বদ্রীবাবু হাবুলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন: 'এবং পালিয়ে সে চাঁদে গেছে।'

টেনিদা দারুণ বিরক্ত হয়ে বললে, 'দেখুন বদ্রীবাবু, সব জিনিসের একটা লিমিট আছে। চাঁদে গেলেই হল—ইয়ার্কি

নাকি ? আর এত লোক থাকতে কম্বল ? সব জিনিস পাটালি খাওয়া নয়, তা মনে রাখবেন।'

বদ্রীবাবু বললেন, 'আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না।'

'বটে!—আমার ভারি উৎসাহ হল : 'কী প্রমাণ পেয়েছেন ? টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদের ভেতরে কম্বলকে লাফাতে দেখেছেন নাকি ?'

'টেলিস্কোপ আমার নেই।' বদ্রীবাবু হাই তুলে বললেন, 'কিন্তু যা আছে তা এই। আমার মতে, এই প্রমাণই যথেষ্ট।' বলে বদ্রীবাবু একটুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলেন আমাদের সামনে।

একসারসাইজ বুকের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তার ওপর শ্রীমান কম্বল তাঁর দেবাক্ষর সাজিয়েছেন। প্রথম মনে হল, কতগুলো ছাতারে পাখি এঁকেছে বোধহয়। তারপরে ক্রমে-ক্রমে পাঠোদ্ধার করে যা দাঁড়াল, তা এইরকম :

'আমি নিরুদ্দেশ। দূরে, বহু দূরে চলিলাম। লোটা-কম্বলও লইলাম না। আর ফিরিব না। ইতি ৺কম্বল।'

এই চিঠির নিচে আবার কতগুলো সাংকেতিক লেখা :

'চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল। ছল ছল খালের জল ত্রিভুবন থর-থর। চাঁদে চড়—চাঁদে চড়।'

সেগুলো পড়ে আমরা তো থ!

বদ্রীবাবু মুচকে হেসে বললেন, 'কেমন, বিশ্বাস হল তো ? চাঁদে চড়—চাঁদে চড়। নির্ঘাৎ চড়ে বসেছে। এমনকি ইতি লিখে চন্দ্রবিন্দু দিয়েছে নামের আগে, দেখতে পাচ্ছ না ? তার মানে কী ? মানে স্বর্গীয় হয় নি, চন্দ্রলোকে—'

ক্যাবলা বললে, 'হুঁ, নিশ্চয় চন্দ্রলোকে। তা আমরা এই লেখাটার এক কপি পেতে পারি ?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়। তাতে আর আপত্তি কী!'

ক্যাবলার হাতের লেখা ভালো, সে-ই ওটা টুকে নিলে। তারপর উঠে দাঁড়ালো টেনিদা।

'তাহলে আসি আমরা। কিন্তু ভাবলেন না বদ্রীবাবু। শিগগিরই কম্বলকে আপনার হাতে এনে দেব।'

'এনে দিতেও পারো, না দিলেও ক্ষতি নেই।' বদ্রীবাবু হাই তুললেন: 'সত্যি বলতে কি, ওটা এমনি অখাদ্য ছেলে যে আমার ওর ওপরে অরুচি ধরে গেছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করব? তোমরা কম্বলকে খুঁজে বের করতে চাও কেন? সে কি তোমাদের কারুর কিছু নিয়ে সটকান দিয়েছে?'

টেনিদা বললে, 'আজ্ঞে না, কিছুই নেয় নি। আর নেবার ইচ্ছে থাকলেও নিতে পারত না—আমরা অত কাঁচা ছেলে নই। কম্বলকে আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি নেহাতই নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যে।'

'পরোপকারের জন্যে? এ-যুগেও কেউ ও-সব করে নাকি?' বদ্রীবাবু খানিকক্ষণ হাঁ-করা কাকের মতো চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে: 'তোমরা তো দেখছি সাংঘাতিক ছেলে। তা, ভবিষ্যতে গুড ক্যারাক্টারের সার্টিফিকেট দরকার থাকলে এসো আমার কাছে, আমি খুব ভালো করে লিখে দেব।'

'আজ্ঞে, আসব বই কি।' ক্যাবলা খুব বিনীতভাবে এ-কথা বলবার পর আমরা বদ্রীবাবুর প্রেস থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় নেমে কেবল কয়েক পা হেঁটেছি, এমন সময়—

'বোঁ-ও-ও!'

টেনিদার ঠিক কান ঘেঁসে কামানের গোলার মতো একটা পচা আম ছুটে বেরিয়ে গেল—ফাটল গিয়ে সামনে ঘোষেদের দেওয়ালে। খানিকটা দুর্গন্ধ কালচে রস পড়তে লাগল দেওয়াল বেয়ে। ওইটে

টেনিদার মাথায় ফাটলে আর দেখতে হত না—নির্ঘাত নাইয়ে ছাড়ত!

তক্ষুনি আমরা বুঝতে পারলুম, কম্বলের নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে আছে কোন গভীর চক্রান্ত-জাল, আর এরই মধ্যে আমাদের ওপর শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

তিন

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম। তারপর টেনিদা মোটা গলায় বললে, 'হুঁ উড্ডুম্বর।'

'উড্ডুম্বর ?'—আমি অবাক হয়ে বললুম, 'তার মানে কী ?'

'মানে উড়ন্ত আক্রমণ—অম্বর হইতে।' টেনিদা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, 'ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।'

হলেই বা প্রকাশ্য দিবালোকে শত্রুর আক্রমণ, ক্যাবলা ভুল ব্যাকরণ সইতে পারল না। সে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল: 'কখনো না, ওটা ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হতেই পারে না। আর অম্বর হইতে উড়ন্ত আক্রমণ—এ কিছুতেই উড্ডুম্বরের ব্যাসবাক্য নয়। তাছাড়া উড্ডুম্বর মানে—'

'শাটাপ্—তক্কো করবি না আমার সঙ্গে!' টেনিদা দুমদাম করে পা ঠুকল: 'আমি যা বলব তাই কারেক্ট্, তাই গ্রামার! আমি যদি ক্যাবলা মিত্তির সমাস করে বলি, মিত্তির হইয়াছে যে ক্যাবলা—সুপ্‌সুপা সমাস, তা হলে কে প্রতিবাদ করে তাকে একবার আমি দেখতে চাই!'

বেগতিক বুঝে ক্যাবলা চশমা-শুদ্ধ নাকটাকে আকাশের দিকে তুলে চিল-ফিল কি সব দেখতে লাগল, কোন জবাব দিলে না। হাবুল সেন বললে, 'না, তারে ছ্যাখ্‌তে পাইবা না। গঁট্টা খাওনের লাইগ্যা কারই বা চাঁদি সুড়্-সুড়্ কোরতাছে? কী কস্ প্যালা, সৈত্য কই নাই?'

আমি হাবুলের মতোই ঢাকাই ভাষায় জবাব দিলুম, 'হঃ, সৈত্যই কইছস্।'

টেনিদা বললে, 'না, এখন বাজে কথা নয়। গোড়াতেই দেখছি ব্যাপার বেশ পুঁদিচ্চেরি—মানে, দস্তুরমতো ঘোরালো। অর্থাৎ কম্বল মাস্টারের থাপ্পড়ের ভয়েই পালাক আর চাঁদে চড়বার চেষ্টাই করুক, সে নিশ্চয় কোন গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। তা না হলে একটা পচা আম অমনভাবে আমার কান তাক করে ছুটে আসত না। বুঝেছিস, ওটা হল ওয়ার্নিং। যেন বলতে চাইছে, টেক কেয়ার, কম্বলের ব্যাপারে তোমরা নাক গলাতে চেয়ো না।'

আমি বললুম, 'তাহলে আমটা ছুঁড়ল কে?'

টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল, যাকে বাংলায় বলে 'হাই ক্লাস।' তারপরে নাকটাকে কি রকম একটা ফুলকপির সিঙাড়ার মতো চোখা করে বললে, 'তা যদি এখুনি জানতে পারতিস রে প্যালা, তাহলে তো রহস্য-কাহিনীর প্রথম পাতাতেই সব রহস্য ভেদ হয়ে যেত! যেদিন কম্বলকে পাকড়াতে পারব, সেদিন আম কে ছুঁড়েছে তা-ও বুঝতে বাকি থাকবে না।'

বললুম, 'আচ্ছা, ছাতে ওই যে কাকটা বসে রয়েছে, ওর মুখ থেকেও তো হঠাৎ আমটা—'

ক্যাবলা বললে, 'বাজে বকিসনি। কাকে এক-আধটা আমের আঁটি ঠোঁটে করে হয়ত নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু অত বড়ো একটা আম তুলতে পারে কখনো? আর মনে কর, যদি ওই কাকটাকে ওয়েট্ লিফটিং চ্যাম্পিয়ান—মানে ওদের মধ্যেই—ধরা যায়, তা হলেও কি আমটা ও বুলেটের মতো ছুড়ে দিতে পারে?'

হাবুল ঘাড় নেড়ে বললে, 'যে কাগটা আম ফেইক্যা মারছে, সে হইল গিয়া ডিস্কাস্-থ্রোয়িং-এর চ্যাম্পিয়ান।

টেনিদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার আর হাবুলের মাথা কটাং

করে একসঙ্গে ঠুকে দিলে। খুব খারাপ মুখ করে বললে, 'আরে গেল যা! এদিকে-দ্বিপ্রহরে কলিকাতা শহরে আমার ওপর শত্রুর আক্রমণ—আর এ দুটোতে সমানে কুরুবকের মতো বক-বক করছে! শোন্—একটাও আর বাজে কথা নয়। আমটা যে আমার দিকেই তাক করে ছোড়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন্ বাড়ি থেকে ছুড়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু খামোকা আমার সঙ্গে লাগতে সাহস করবে, এমন বুকের পাটাও এ পাড়ায় কারো নেই। টেনি শর্মাকে সকলেই চেনে। অতএব প্রতিপক্ষ অতিশয় প্রবল। সেইজন্যে মনে হচ্ছে, এখন পচা আম পড়েছে, একটু পরে ধপাৎ করে একটা পেঁপেও পড়তে পারে। আর বড়ো সাইজের তেমন-তেমন একখানা পেঁপে যদি হয়, তাহলে সে চীজ যারই মাথায় পড়ুক, আমরা কেউই অনাহত থাকব না।'

হাবুল সেন বললে, 'আর দশ কিলো ওজনের একখান পচা কাঁঠাল পোড়লে সকলেরেই ধরাশায়ী কইর‍্যা দিবো। যদি আত্মরক্ষা কোরতে চাও, অবিলম্বে এইখান থিক্যা পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর।'

যুক্তিটা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, আমরা আর দাঁড়ালুম না। চটপট পা চালিয়ে একেবারে চাটুজ্জেদের রকে।

টেনিদা কি বলতে যাচ্ছিল, ক্যাবলা বললে, 'না—এখানে নয়। রাস্তার ধারে বসে কোন সীরিয়াস আলোচনা করা যায় না। চলো আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা ট্যুরে বেরিয়েছেন, কাকা গেছেন দিল্লীতে, বেশ নিরিবিলিতে বসে সব প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

এ প্রস্তাবে আমরা একবাক্যে রাজি হয়ে গেলুম। সত্যিই তো, এখন আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। শত্রুর চর সব সময় আমাদের গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখছে কি না, কিছুই তো বলা যায় না। তা ছাড়া ক্যাবলার মা নানারকম খাবার করতে

ভালোবাসেন, খাওয়াতেও ভালোবাসেন ; তাঁকেও তো একটু খুশি করা দরকার।

তা, খাওয়াটা মন্দ জমল না। ক্যাবলার মা কেক তৈরি করছিলেন, গরম-গরম আমাদের কেটে এনে দিলেন। 'হট কেকে'র সঙ্গে চা-টা খেয়ে আমাদের মেজাজ খুলে গেল।

টেনিদা আমাদের লীডার বটে, কিন্তু সে অ্যাকশনের সময়। মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি জোটাবার বেলায় ওই ক্ষুদে চেহারার ক্যাবলা মিত্তির। তা না হলে কি আর টপাটপ পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায়!

ক্যাবলা প্রথমেই পকেট থেকে কম্বলের লেখার সেই নকলটা বের করল।

'টেনিদা, এই লেখাটার মধ্যে একটা সূত্র আছে মনে হয়।'

টেনিদা বললে, 'আহা, সূত্র তো বটেই। পরিষ্কার লিখছে, নিরুদ্দেশ হচ্ছি। মাস্টারের ঠ্যাঙানি খাওয়ার ভয়ে যেদিকে হোক লম্বা দিয়েছে। কিন্তু কম্বলের মতো একটা অখাদ্য জীব চাঁদে গেছে, এ হতেই পারে না। আমি কখনো বিশ্বাস করব না—তা বদ্রীবাবুই বলুক আর কেদারবাবুই বলুক।'

ক্যাবলা হিন্দী করে বললে, 'এ জী, জেরা ঠহ্‌রো না! আরে চাঁদ-উঁদ ছোড় দো, উ তো বিলকুল দিল্লাগী মালুম হচ্ছে আমার। নিচের লেখাগুলোই একটু ভালো করে দেখা দরকার। ওদের কোনো মানে আছে।'

আমি বললুম, 'ওই চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর? তোর মাথা খারাপ হয়েছে ক্যাবলা! ওগুলো স্রেফ পাগলামি, ওদের কোনো মানেই হয় না।'

'বেশি ওস্তাদী করিস্‌নি প্যালা, আমি কী বলছি তাই শোন্। কম্বলকে আমরা সকলেই জানি। তার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়ও আমাদের

অজানা নয়। সেদিনও সে আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, ইটালির মুসোলিনি কি বেলেঘাটার মৃণালিনী মাসিমার বড়ো বোন? তার হাতের লেখা দেখলে উর্দু কিংবা কানাড়ি বলে মনে হতে থাকে। বন্ধুগণ, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যাকে স্রেফ পাগলামি বলে মনে হচ্ছে, তা হল ছ-লাইনের একটি কবিতা। তাতে ছন্দ আছে, মিলও আছে। কম্বলের সাধ্যও নেই ওভাবে ছন্দ মিলিয়ে, মিল রেখে, ছটা লাইন দাঁড় করায়।'

হাবুল মাথা নাড়ল : 'হ, বুঝছি। আর কেউ লেইখ্যা দিছে।'

'ঠিক, আর কেউ লিখে দিয়েছে। কিন্তু খামোকা লিখতে গেল কেন? নিশ্চয় ওর একটা মানে আছে।'—ক্যাবলা কাগজটা খুলে ধরে পড়তে লাগল : চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল—আচ্ছা টেনিদা—'

টেনিদা বললে, 'ইয়েস!'

'আমার মাথার প্ল্যান এসেছে একটা। একবার চাঁদনির বাজারে যাবে!'

'চাঁদনির বাজার!'—আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলুম। টেনিদা নাক কুঁচকে, মুখটাকে শোনপাপড়ির মতো করে বললে, 'কী জ্বালা, চাঁদনির বাজারে যেতে যাব কেন?'

ক্যাবলা আরো বেশি গম্ভীর হল।

'ধরো সেখানে যদি চক্রধরকে পেয়ে যাই? কিংবা কে জানে চন্দ্রকান্তের সঙ্গেই দেখা হয়ে যেতে পারে হয়তো!'

'নাকেশ্বরও বইস্যা থাকতে পারে—কেডা কইবো?' হাবুল জুড়ে দিলে।

'সবই হতে পারে'—ক্যাবলা বললে, 'চলো না টেনিদা, ঘুরেই আসি একটু। যদি কোনো খোঁজ না-ই পাওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কী? ছুটির দিন, একটু বেড়িয়েই নয় আসা যাবে।'

'কিন্তু বেড়াবি কোথায়?'—টেনিদা বিরক্ত হল: 'চাঁদনি তো আর একটুখানি জায়গা নয়। সেখানে চক্রধর বলে কেউ যদি থাকেই, তাকে কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

'একগাদা খড়ের ভেতর থেকে গোয়েন্দারা ছুঁচ খুঁজে বের করতে পারে, আর চাঁদনি থেকে একটা লোককে আমরা খুঁজে পাব না? এই কি আমাদের লীডারের মতো কথা হল? ছি-ছি, বহুৎ শরম কি বাত!'

আর বলতে হল না। তড়াক করে টেনিদা লাফিয়ে উঠল: 'চল্ তাহলে, দেখাই যাক একবার।'

আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চিনেবাদাম খেতে খেতে যখন চাঁদনির বাজারে যাওয়ার জন্যে ট্রামে চাপলুম, তখনও আমরা কেউ ভাবিনি যে সত্যি-সত্যিই আমরা এবারে একটা রহস্যের খাসমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াব, আমাদের সামনে এমন দুরন্ত অভিযান ঘনিয়ে আসবে।

চাঁদনির বাজারে ঢুকে টেনিদা কেবল এক ভদ্রলোককে বোকার মতো জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, 'মশাই, এখানে চক্রধর বলে কেউ'— হঠাৎ হাবুল থাবা মেরে তাকে থামিয়ে দিলে। বললে, 'টেনিদা— টেনিদা—ওই যে! লুক দেয়ার!'

একটি ছোট সাইনবোর্ড। ওপরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা: 'শ্রীচক্রধর সামন্ত। মৎস ধরিবার সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বিক্রেতা। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।'

অবশ্য 'মৎস্যে' য-ফলা নেই, তাছাড়া লেখা রয়েছে, 'পরিক্ষা প্রার্থনীয়।' কিন্তু তখন বানান ভুল ধরার মতো মনের অবস্থা ক্যাবলার মতো পণ্ডিতেরও নয়। আমরা চারজনেই হাঁ করে সাইনবোর্ডটার দিকে চেয়ে রইলুম কেবল।

চার

সাইনবোর্ডে যতই বানান ভুল থাক, মানে 'মৎস'-ই লিখুক আর 'পরিক্ষা'ই চালিয়ে দিক, আসল ব্যাপার হল : এটা চাঁদনির বাজার, আর চক্রধর সামন্তের দোকান একেবারে সামনেই রয়েছে। অর্থাৎ কবিতাটার প্রথম দু-লাইনের মানে এখানেই পাওয়া যাচ্ছে যে।

হাবুল বললে, 'টেনিদা, অখন কী করন যাইবো ?'

ক্যাবলা বললে, 'করবার কাজ তো একটাই রয়েছে। অর্থাৎ এখন সোজা ওখানে গিয়ে চক্রধর সামন্তের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'দেখা করে কী বলবি ?'

টেনিদা পেছন থেকে আমার মাথায় টুক করে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে : 'চক্রধর সামন্তকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে লুচি-পোলাও খাইয়ে দিবি। দেখা করে কী আবার বলব ? পরিষ্কার জানতে চাইব—এই কবিতাটির মানে কী, আর শ্রীমান কম্বল কোথায় আছেন।'

ক্যাবলা ছুটে গিয়ে বললে, 'হুঁ, তাহলেই সব কাজ চমৎকার-ভাবে পণ্ড হতে পারবে। কম্বলকে যদি এরাই কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গেই হুঁসিয়ার হয়ে যাবে। হয়ত কম্বলকে আমরা আর খুঁজেই বের করতে পারব না।'

হাবুল বললে, 'না পাইলেই বা কী হইবো। সেই পোলাখান না ? সে হইল গিয়া এক নম্বরের বিচ্ছু ! তারে ধইরা যদি কেউ চান্দে চালান কইর‍্যা দেয়, দুই দিনে চান্দের গলা দিয়াও কান্দন বাইরাইবো !'

টেনিদা ধমকে বললে, 'তুই থাম্! কম্বল যত অখাদ্য ছেলেই হোক, তার কাকার কাছে আমরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য, মানে ডিউটি বাউণ্ড। তারপর বদ্রীবাবু পিটিয়ে কম্বলের ধুলো ওড়ান কি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েই পড়ুন, সে তিনিই বুঝবেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ বক-বক করব আমরা? কিছু একটা করতে তো হবে!'

ক্যাবলা বললে, 'আলবৎ করতে হবে। চলো, আমরা মাছ ধরবার ছিপ-সুতো এইসব খোঁজ করিগে।'

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে প্রতিবাদ করে বললুম, 'আমি কিন্তু ছিপ সুতো নিয়ে বাড়ি যাব না। মেজদা তাহলে আমার কান কেটে নেবে।'

'তোর কান কেটে নেওয়াই উচিত,'—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে কট্‌কটিয়ে তাকালো ক্যাবলা: 'আরে বোকারাম, ছিপ-সুতো কিনছে কে? আমরা এটা-ওটা বলে হালচাল বুঝে নেব।'

টেনিদা খুব মুরব্বির মতো বললে, 'প্যালা আর হাবলাকে নিয়েই মুস্কিল। এ দুটোর তো মাথা নয়—যেন এক-জোড়া খাজা কাঁটাল! কি বলতে কী বলবে আর সব মাটি হয়ে যাবে। শোন, তোরা দু-জন একেবারে চুপ করে থাকবি, বুঝেছিস? যা বলবার আমরাই বলব—মানে আমি আর ক্যাবলা। মনে থাকবে?'

আমরা গোঁজ হয়ে ঘাড় নাড়লুম। মনে থাকবে বই কি! এদিকে কিন্তু ভীষণ রাগ হচ্ছিল টেনিদার ওপর। বলতে ইচ্ছে করছিল, 'আমাদের মাথা নয় খাজা কাঁটাল, আর তোমার? পণ্ডিত মশাই বলতেন না, 'বৎস টেনিরাম, ওরফে ভজহরি, জগদীশ্বর কি তোমার স্কন্ধের উপর মস্তকের বদলে একটি গোময়ের হাঁড়ি বসাইয়া দিয়াছেন?' রাগ হলেই তাঁর মুখ দিয়ে সাধুভাষা বেরিয়ে আসত।

সে যাই হোক, আমরা তো চক্রধর সামন্তের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে আঠারো-উনিশ বছরের একটা ছেলে খাকি হাফপ্যান্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জি পরে একটা শালপাতার ঠোঙা থেকে তেলেভাজা খাচ্ছিল।

আমাদের দেখেই বেগুনি চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই?'

ক্যাবলা বললে, 'আমরা ছিপ কিনব।'

'ওই তো রয়েছে, পছন্দ করুন না'—বলে সে এবার একটা আলুর চপে কামড় বসালো। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ছিপ বিক্রি করার চাইতে তেলেভাজাতেই মনোযোগ তার বেশি।

'আপনিই বুঝি চক্রধরবাবু?'—টেনিদা ভারি নরম-নরম গলায় ভাব করবার মতো করে জানতে চাইল।

'আমি চক্রধরবাবু হতে যাব কেন?'—আলুর চপের ভেতরে একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে বিচ্ছিরি মুখ করল ছেলেটা, 'তিনি তো আমার মামা।'

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক, ঠিক! তাই চক্রধরবাবুর মুখের সঙ্গে আপনার মুখের মিল আছে! ভাগনে বলেই!'

ভাগনে এবার চটে উঠল, শুনে আলুর চপের মতোই ঘোরালো হয়ে উঠল তার মুখ। খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে, 'কী—কার মুখের সঙ্গে মিল আছে বললেন? চক্রধরের? সে সাত পুরুষে আমার মামা হতে যাবে কেন? গাঁয়ের লোকে তাকে মামা বলে—আমিও বলি। আমার মুখ তার মতো ভীমরুলের চাকের মতো? আমার কপালে তার মতো আব আছে? আমার রঙ তার মতো কটকটে কালো? আমার নাকের তলায় একটা ঝোল্লা গোঁফ দেখতে পাচ্ছেন?'

ক্যাবলার মতো চটপটে ছেলেও কি-রকম ঘাবড়ে গেল এবার। বার-দুই বিষম খেলো।

'মানে—এই ইয়ে—'

'ইয়ে-টিয়ে নেই। ছিপ কিনতে এসেছেন কিনুন, নইলে ঝাঁ করে সরে পড়ুন এখান থেকে! খামোকা যা-তা বলে মেজাজ খারাপ করে দেবেন না স্যার!'

'সে তো বটেই, সে তো বটেই।'—টেনিদা মাথা নাড়ল: 'ওর কথা ছেড়ে দিন মশাই, ওটা কী বলে ইয়ে—মানে নেহাত নাবালক! আপনার মুখখানা—মানে—ঠিক চাঁদের মতো—অর্থাৎ কিনা চন্দ্রকান্তবাবুও বলা যায় আপনাকে।'

'আমার নাম হলধর জানা।'—বলেই সে হঠাৎ কিরকম চমকে উঠল: 'কী নাম বললেন? চন্দ্রকান্ত?'

টেনিদা ফস্ করে বলে বসল: 'নিশ্চয় চন্দ্রকান্ত। এমনকি আপনার টিকোলো নাক দেখে নাকেশ্বর বলতেও ইচ্ছে করছে।'

'কী বললেন? নাকেশ্বর? চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর?'—হলধর জানা তেলেভাজার ঠোঙাটা মুড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'আপনারা যান। ছিপ বিক্রি হবে না। দোকান বন্ধ।'

ক্যাবলা বললে, 'দোকান বন্ধ!'

'হ্যাঁ, বন্ধ।'—হলধর কি-রকম বিড়বিড় করতে লাগল: 'আজকে বিষ্যুদ্‌বার না? বিষ্যুদ্‌বারে আমাদের দোকান বন্ধ থাকে।'

'মোটেই না, আজকে মঙ্গলবার'—আমি প্রতিবাদ করলুম।

'হোক মঙ্গলবার'—হলধর কাঁচা উচ্ছে চিবুনোর মতো মুখ করে বললে, 'আমরা মঙ্গলবারেও দোকান বন্ধ করে রাখি।'—বলেই সে ঘটাং করে আমাদের নাকের সামনেই ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে। তারপর একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে নাক বের করে বললে, 'অন্য দোকানে গিয়ে ছিপ কিনুন, এখানে সুবিধে হবে না।'

ব্যাস, হলধরের সঙ্গে আলাপ এখানেই খতম। হলধর জানাকে আর জানা হল না—তার আগেই ঝাঁপের আড়ালে সে ভ্যানিস্‌ট্।

সে তো ভ্যানিস্‌ট্‌—কিন্তু আমাদের মাথার ভেতরে একেবারে চক্কর লাগিয়ে দিলে যাকে বলে। পচা চিনেবাদাম চিবুলে যে রকম লাগে, ঠিক সেইরকম বোকা-বোকা হয়ে আমরা এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

টেনিদা মাথা চুলকে বললে, 'ক্যাবলা—এবার?'

ক্যাবলা বললে, 'হুঁ। এখন চলো, কোথাও গিয়ে একটু চা খাই। সেখানে বসে প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা, নিরিবিলি কেবিনও পাওয়া গেল। ক্যাবলাই চা আর কেক আনতে বলে দিলে। এ-সব ব্যাপারে চিরকাল পয়সা-টয়সা ও-ই দেয়, আমাদের ভাববার কিছু ছিল না।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, 'ব্যাপারটা খুব মেফিস্টোফিলিস বলে মনে হচ্ছে। মানে, সাঙ্ঘাতিক। এত সাঙ্ঘাতিক, যে পুঁদিচ্চেরিও বলা যেতে পারে।'

হাবুল এতক্ষণ পরে মুখ খুলল: 'হ, সৈত্য কইছ!'

'চন্দ্রকান্ত আর নাকেশ্বর শুনেই হলধর কী রকন লাফিয়ে উঠল দেখেছ?'—আমি বললুম, 'তাহলে ছড়াটার দ্বিতীয় লাইনেরও একটা মানে আছে!'

'সবকিছুরই মানে আছে—বেশ গভীর মানে!'—ক্যাবলা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'এখন তো দেখছি ছড়াটার মানে বুঝতে পারলেই কম্বলেরও হদিশ পাওয়া যাবে।'

টেনিদা এক কামড়েই নিজের কেকটাকে প্রায় শেষ করে ফেলল। আমি চট্‌ করে আমারটা আধখানা মুখে পুরে দিলুম, পাছে ও-পাশ থেকে আমার প্লেটেও হাত বাড়ায়। টেনিদা আড়চোখে সেটা দেখল, তারপর ব্যাজার হয়ে বললে, 'কিন্তু পটলডাঙার কম্বল কী করে যে চাঁদনির বাজারে এল আর

চক্রধরের সঙ্গে জুটলই বা কিভাবে, সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না।'

'সেটা বুঝলে তো সবই বোঝা যেত।'—ক্যাবলা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল : 'ভেবেছিলুম কম্বলের পালানোটা কিছুই নয়—এখন দেখছি বদ্রীবাবুই ঠিক বলেছিলেন। কম্বল চাঁদে হয়তো যায়নি, কিন্তু যে রহস্যময় চাঁদোয়ার তলায় সে ঘাপটি মেরে বসে আছে সে-ও খুব সোজা জায়গা নয়! ওয়েল, টেনিদা!'

'ইয়েস ক্যাবলা!'

'চলো, আমরা চারজনে চারিদিক থেকে চক্রধরের দোকানের ওপর নজর রাখি। আমাদের তাড়াবার জন্যেই হলধর দোকান বন্ধ করছিল, আবার নিশ্চয় ঝাঁপ খুলবে। দেখতে হবে ঝোল্লা গোঁফ আর কপালে আব নিয়ে কটকটে কালো চক্রধর আসে কি না কিংবা লম্বা নাক নিয়ে চন্দ্রকান্ত দেখা দেয় কি না। কিন্তু টেক কেয়ার—সব্বাইকেই একটু গা—ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে—হলধর যাতে কাউকে দেখতে না পায়।'

আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলুম।

ক্যাবলা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাওয়াতে ওর বাবা ওকে একটা হাত-ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। সেটার দিকে তাকিয়ে ক্যাবলা বললে, 'এখন সাড়ে চারটে। পড়াশুনোয় সময় নষ্ট না করেও আমরা আরো দেড় ঘণ্টা থাকতে পারি এখানে। কে জানে, হয়ত আজকেই কোনো একটা ক্লু পেয়ে যেতে পারি কম্বলের। ফ্রেণ্ডস্—নাউ টু অ্যাকশ্যন—এবার কাজে লাগা যেতে পারে।'

চাঁদনির বাজারে এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকা কিছু শক্ত কাজ নয়। আমরাও পাকা গোয়েন্দার মতো চারদিকে চারটে জায়গা বেছে নিয়ে চক্রধরের দোকানের দিকে ঠায় চেয়ে রইলুম। টেনিদা আর ক্যাবলাকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠিক আমার মুখোমুখি

একটা লোহার দোকানের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কচ্ছপের মতো গলা বের করছিল হাবুল।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি, চক্রধরের দোকানের ঝাঁপ আর খোলে না। চোখ টনটন করতে লাগল। পা ব্যথা হয়ে

'ছল ছল খালের জল'—

গেল। এমন সময়, হঠাৎ—পেছন থেকে আমার কাঁধে কে যেন টুক-টুক করে দুটো টোকা মারল।

চমকে তাকিয়েই দেখি, ছিটের শার্ট গায়ে, তালগাছের মতো

চেহারা, নাকের নিচে মাছিমার্কা গোঁফ, বেশ ওস্তাদ চেহারার লোক একজন। মিটমিট করে হেসে বললে, 'ছল ছল খালের জল—তাই না?'

আমি এত অবাক হয়ে গেলুম যে মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না।

লোকটা বললে, 'তাহলে হলধরকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা কেন? কাল বেলা তিনটের সময় তেরো নম্বর শেয়ালপুকুর রোডে গেলেই তো হয়।'

বলে আমার পিঠে টকটক করে আবার গোটা দুই টোকা দিয়ে, টুক্ করে কোন্‌দিকে সরে পড়ল যেন।

পাঁচ

কলকাতায় কাঁটাপুকুর আছে, ফড়েপুকুর আছে, বেনেপুকুর, মনোহরপুকুর, পদ্মপুকুর সব আছে, কিন্তু শেয়ালপুকুর আবার কোন্ চুলোয়! হিসেবমতো শেয়ালদার কাছাকাছিই তার থাকা উচিত, কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় কলকাতার রাস্তার যে লিস্টি থাকে, তাই থেকেই শেষ পর্যন্ত জানা গেল, শেয়ালপুকুর সত্যিই আছে দক্ষিণের শহরতলীতে। জায়গাটা ঠিক কোন্খানে, তা আর তোমাদের না-ই বললুম।

শেয়ালপুকুরের সন্ধান তো পাওয়া গেল, তেরো নম্বরও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রশ্ন হল, জায়গাটাতে আদৌ যাওয়া হবে কি না? কাঁটাপুকুরে কোন কাঁটা নেই—সে আমি দেখেছি; মনোহরপুকুরে আমার মাসতুতো ভাই লোটনদা থাকে—সেখানে কোনো মনোহর পুকুর আমি দেখিনি, ফড়েপুকুরেও নিশ্চয়ই ফড়েরা সাঁতরে বেড়ায় না। শেয়ালপুকুরের চারপাশেও খুব সম্ভব এখন আর শেয়ালের আস্তানা নেই—বেলা তিনটের সময় সেখানে গেলে নিশ্চয় আমাদের খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কামড়ে দেবে না। কিন্তু—

কিন্তু চাঁদনির সেই সন্দেহজনক আবহাওয়া? সেই ঝোলা গোঁফ আর কপালে আবওলা চক্রধর সামন্ত কিংবা সেই নাকেশ্বর চন্দ্রকান্ত—যাদের এখনো আমরা দেখিনি? সেই তেলেভাজা-খাওয়া হলধর আর তালঢ্যাঙা সেই খলিফা-চেহারার লোকটা? এ-সবের মানে কী? ছড়াটা দেখছি ওরা সবাই-ই জানে, আর এই ছড়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে কোন সাঙ্কেতিক রহস্য। পটলডাঙার বিচ্ছুমার্কা

কম্বল ও-ছড়াটা পেলই বা কোথায়, আর কারাই বা তাকে নিরুদ্দেশ করল ?

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে ঝালমুড়ি খেতে খেতে এইসব ঘোরতর চিন্তার ভেতরে আমরা চারজন হাবুডুবু খাচ্ছিলুম। বাঙাল হাবুল সেন বেশ তরিবৎ করে একটা লাল লঙ্কা চিবুচ্ছিল, আর তাই দেখে গা শিরশির করছিল আমার। টেনিদার খাড়া নাকটাকে দু-আনা দামের একটা তেলেভাজা শিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছিল, আর ক্যাবলার নতুন চশমাটা ইস্কুলের ভূগোল-স্যারের মতো একেবারে ঝুলে এসেছিল ওর ঠোঁটের ওপর।

টেনিদা মুড়ি চিবুতে চিবুতে বললে, 'পুঁদিচ্চেরি! মানে, ব্যাপার খুব ঘোরালো।'

আমরা তিনজনেই বললুম, 'হুঁ!'

টেনিদা বললে, 'যতই ভাবছি, আমার মনটা ততই মেফিস্টোফিলিস হয়ে যাচ্ছে।'

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।'

'শাটাপ!'—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, 'বিদ্যে ফলাসনি! লোকগুলোকে কী রকম দেখলি ?'

আমি বললুম, 'সন্দেহজনক।'

হাবুল লঙ্কা চিবিয়ে জিভে লাল টেনে 'উস-উস' করছিল। তারই ভেতরে ফোড়ন কাটল: 'হ, খুবই সন্দেহজনক। ক্যামন শিয়াল-শিয়াল মনে হইল।'

আমি বললুম, 'তাই শেয়ালপুকুরে থাকে।'

ক্যাবলা বললে, 'খামোশ্! চুপ কর্ দেখি! আমি বলি কি টেনিদা, আজ দুপুরবেলা যাওয়াই যাক ওখানে।'

টেনিদা শিঙাড়ার মতো নাকটাকে খুচুর খুচুর করে একটুখানি

চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ফেঁসে যাই? মানে—লোকগুলো—'

'চার-চারজন আছি, দিন-দুপুরে আমাদের কে কী করবে?'

'তা ঠিক। তবে কিনা—' টেনিদা গাঁইগুঁই করতে লাগল।

'হ, সক্কল দিক ভাইবা-চিন্তাই কাম করন উচিত।'—ভাল্লুকের মতো মাথা নাড়তে লাগল হাবুল সেন: 'আর তোমার হইল গিয়া—কম্বলটা একটা অখাদ্য মানকচু! অরে শুয়ারেও খাইবো না! খামাকা সেইটারে খুঁজতে গিয়া বিপদে পড়ুম ক্যান?'

'হবে না! ছিঃ ছিঃ!'—এমনভাবে ধিক্কার দিয়ে কথাটা বললে ক্যাবলা, যে হাবুল একেবারে নেতিয়ে গেল, স্রেফ মানকচু-সেদ্ধর মতো। চশমাটাকে আরো ঝুলিয়ে দিয়ে এবারে সে অঙ্ক-স্যারের মতো কটকটে চোখে চাইল হাবুলের দিকে।

'তুই এত স্বার্থপর! একটা ছেলে বেঘোরে মারা যাচ্ছে, তার জন্যে কিছু না করে স্বার্থপরের মতো নিজের গা বাঁচাতে চেষ্টা করছিস! শেম্—শেম্!'

হাবুল জব্দ হচ্ছে দেখে আমিও বললুম, 'শেম্-শেম্!' কিন্তু বলেই আমার মনে হল, হাবুলও কিছু অন্যায় বলে নি। কম্বলের মতো একটা বিকট বাঁদর ছেলে—যে কুকুরের কানে লাল পিঁপড়ে ঢেলে দেয়, লোকের গায়ে পটকা ফাটায় আর প্রণামের ছল করে খ্যাচখেঁচিয়ে পায়ে খিমচে দেয়, সে যদি আর না-ই ফিরে আসে, তাতে দুনিয়ার বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু তক্ষুনি আমি ভাবলুম, কম্বলের মা-র কী হবে? ছেলে-হারানোর দুঃখ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন? আর, কোন ছেলে যদি খারাপ হয়েই যায়, তাহলেই কি তাকে বাতিল করা উচিত? খারাপ ছেলের ভাল হতে ক-দিনই বা লাগে? না হলে, ক্লাইভ কী করে ভারতবর্ষ জিতে নিলেন?

আমি ভাবছিলুম, ওরা কী বলছিল শুনতেই পাইনি। এবার কানে এল, টেনিদা বলছে, 'কিন্তু শেয়ালপুকুরে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে?'

'করুক না আক্রমণ। আমাদের লীডার টেনিদা থাকতে কী ভয় আমাদের?'—ক্যাবলা টেনিদাকে তাতিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার এক-একটা ঘুসি লাগবে, আর এক-একজন দাঁত ছরকুটে পড়বে।'

'হেঁ—হেঁ, মন্দ বলিসনি।'—সঙ্গে সঙ্গে টেনিদার দারুণ উৎসাহ হল আর সে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দেবার জন্যে হাত বাড়ালো। কিন্তু ক্যাবলা চালাক, চট করে সরে গেল সে, তার পিঠ সঙ্গে-সঙ্গেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, আর চাঁটিটা এসে চড়াৎ করে আমার পিঠেই চড়াও হল।

আমি চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠলুম, আর হাবলা দারুণ খুশি হয়ে বললে, 'সারছে—সারছে—দিছে প্যালার পিঠখান অ্যাক্কেবারে চ্যালা কইরা! ইচ্-চ্—পোলাপান!'

টেনিদা বললে, 'সাইলেন্স্—নো চ্যাঁচামেচি! পোলাপান! বেশি গণ্ডগোল করবি তো সবগুলোকে আমি একেবারে জলপান করে ফেলব! যা—বাড়ি পালা এখন। খেয়েদেয়ে সব দেড়টার সময় হাজিরা দিবি এখানে। এখন ট্রুপ ডিসপার্স—কুইক্!'

বাস থেকে নেমে একটু হাঁটতেই আমরা দেখলুম দুটো রাস্তা বেরিয়েছে দু-দিকে। একটা ধোপাপাড়া রোড, আর একটা শেয়ালপুকুর রোড। হাবুল আমাকে বললে, 'এই রাস্তার ধোপারা গিয়া না, ওই রাস্তার শিয়ালপুকুরে কাপড় কাচে। বোঝছস্ না প্যালা?'

আমি বললুম, 'তুই থাম্, তোকে আর বোঝাতে হবে না।'

'তরে একটু ভালো কইর‍্যা বুঝান্ দরকার। তর মগজ বইল্যা

তো কিছুই নাই, তাই উপকার করবার চেষ্টা কোরতে আছি। বুঝস নাই ?'

এমন বিচ্ছিরি করে বলছিল যে ইচ্ছে হল হাবুলের সঙ্গে আমি মারামারি করি। কিন্তু তার আর দরকার হল না, বোধহয় ভগবান কান খাড়া করে সব শুনছিলেন, একটা আমের খোসায় পা দিয়ে দুম করে আছাড় খেল হাবুল।

টেনিদা আর ক্যাবলা আগে আগে যাচ্ছিল। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আঃ, এই প্যালা আর হাবলাকে নিয়ে কোন কাজে যাওয়ার কোন মানে নেই, দুটোই পয়লা-নম্বরের ভণ্ডুলরাম। এই হাবলা—কী হচ্ছে ?'

আমি বললুম, 'কিছু হয় নি। হাবলার মগজে জ্ঞান একটু বেশি হয়েছে কিনা, তাই বইতে পারছে না—ধপাধপ আছাড় খাচ্ছে।'

'হয়েছে, তোমার আর ওস্তাদি করতে হবে না। শিগগির আয় পা চালিয়ে।'

রাস্তার দু-ধারে কয়েকটা সেকেলে বাড়ি, কাঁচা ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ উঠছে। গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়েছে এখানে ওখানে। ভর-দুপুরে লোকজন কোথাও প্রায় নেই বললেই চলে। কোথায় যেন মিষ্টি গলায় দোয়েল ডাকছিল। এখানে যে কোন রকম ভয়ের ব্যাপার আছে, তা মনেই হল না।

আরে, এই তেরো নম্বর! উঁচু পাঁচিল-দেওয়া বাগানওলা একটা পুরোনো বাড়ি। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে বাংলা হরফে নাম লেখা। গেট খোলাই আছে, কিন্তু ঢোকবার জো নেই। গেট জুড়ে খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে পেল্লায় এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান, তার হাতির মতো পেট দেখে মনে হল, সে বাঘা কুস্তিগীর আর দারুণ জোয়ান—আমাদের চারজনকে সে এক কিলে চিড়ে-চ্যাপটা করে দিতে পারে।

আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে তাকালুম। এই জগদ্দল লাসকে ঘাঁটানো কি ঠিক হবে ?

টেনিদা একবার নাক-টাকগুলো চুলকে নিলে। চাপা গলায় বললে, 'পুঁদিচ্চেরি !' তারপর আস্তে আস্তে ডাকল :

'এ দারোয়ানজী !'

কোন সাড়া নেই।

'ও দারোয়ান স্যার !'

এবারেও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না !

'পাঁড়ে মশাই !'

দারোয়ান জাগল। ঘুমের ঘোরে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল। আর তাই শুনেই আমরা চমকে উঠলুম।

দারোয়ান সমানে বলছিল : 'চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর—চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর—'

টেনিদা ফস করে বলে বসল : 'চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর'।

কথাটা মুখ থেকে পড়তেই পেল না। তক্ষুনি—যেন ম্যাজিকের মতো উঠে বসল দারোয়ান। হড়-হড় করে খাটিয়া সরিয়ে নিয়ে, আমাদের লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, 'যাইয়ে—অন্দর যাইয়ে—'

আমরা বোধহয় বোকার মতো মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছিলুম। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানি দেবে নাকি ? যা রাক্ষসের মতো চেহারা, ওকে বিশ্বাস নেই !

দারোয়ান আবার মুচকে হেসে বললে, 'যাইয়ে—যাইয়ে—'

এরপরে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। আমরা দুরু-দুরু বুকে দারোয়ানের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। আর ঢুকতেই তক্ষুনি খাটিয়াটা টেনে গেট জুড়ে শুয়ে পড়ল দারোয়ান—যেন অঘোর ঘুমে ডুবে গেল।

কিন্তু আমরা কোথায় যাই ?

সামনে একটা গাড়িবারান্দাওলা লাল রঙের মস্ত দোতলা বাড়ি। তার জানলার সবুজ খড়খড়িগুলো সাদাটে হয়ে কবজা থেকে ঝুলে পড়ছে, তার গায়ের চুন বালির বার্নিশ খসে যাচ্ছে, তার মাথায় বট অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। একটা ভাল ফুলের বাগান ছিল, এখন সেখানে আগাছার জঙ্গল। একটা মরকুটে লিচু গাছের ডগায় কে যেন আবার খামোকা একটা কালো কাক-তাড়ুয়ার হাঁড়ি বেঁধে রেখেছে।

আমরা এখানে কী করব বোঝবার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে তালঢ্যাঙা লোকটা—সেই যাকে আমরা চাঁদনির বাজারে দেখেছিলুম—মাছি-মার্কা গোঁফের নিচে মুচকি হাসি নিয়ে বেরিয়ে এল।

'এই যে, এসে গেছেন। তিনটে বেজে দু-সেকেণ্ড—বাঃ, ইউ আর ভেরি পানচুয়েল।'

আমরা চারজনে গা ঘেঁসে দাঁড়ালুম। যদি বিপদ কিছু ঘটেই, একসঙ্গেই তার মোকাবেলা করতে হবে।

টেনিদা আমাদের হয়ে জবাব দিলে, 'আমরা সর্বদাই পাংচুয়াল!'

'গুড—ভেরি গুড!'—লোকটা এগিয়ে চলল, 'তাহলে আগে চলুন মা নেংটীশ্বরীর মন্দিরে। তিনি তো এ-যুগের সবচাইতে জাগ্রত দেবতা!'

'নেংটীশ্বরী!'

লোকটি অবাক হয়ে ফিরে তাকালো : 'নাম শোনেন নি ?' মা নেংটীশ্বরীর নাম শোনেন নি ? অথচ চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের খবর পেয়েছেন ? এটা কীরকম হল ?'

আমরা বুঝতে পারছিলুম, একটা কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলে : 'না—না, নাম শুনব না কেন ? না হলে আর এখানে এলুম কী করে ?'

'তাই বলুন !'—লোকটা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল : 'আমায় একেবারে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন । জয় মা নেংটীশ্বরী !'

আমরাও সমস্বরে নেংটীশ্বরীর জয়ধ্বনি করলুম

ছয়

আমরা যেই বলেছি, 'জয় মা নেংটীশ্বরীর জয়,' সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিচিংচন্দ্র ফাঁক হয়ে গেলেন। মানে তক্ষুনি সেই সরু-গুঁফো তালঢ্যাঙা চেহারার রোগা লোকটা হুড়মুড় করে একটা নকসা-কাটা কালো দরজা টেনে খুলে ফেললে। আর সেই দরজা দিয়ে তাকিয়েই আমরা চারজনে একেবারে থ!

মা কালী, মা দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী-বিশ্বকর্মা-শীতলা-শিব, মায় ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর পর্যন্ত অনেক দেবতাই তো আমরা দেখেছি—মানে দেবতা আর কী করে দেখব, তাঁদের মূর্তি-টুর্তি তো সব সময়েই দেখে থাকি। পাটনার সেই কংগ্রেস ময়দানে দেখেছি, বাঁশ, কাগজ আর সেইসঙ্গে আরো কিসব দিয়ে তৈরি রাবণ-কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিতের আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি—দশহরার দিন যাদের আগুনের তীর মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দরজা খুলতে আজ যা দেখতে পেলুম—এমন ঠাকুর এর আগে কোথাও কেউ দেখেছে বলে মনে হল না!

টেনিদা বিড়-বিড় করে বললে, 'ডি লা গ্র্যাণ্ডি!'

আমি বললুম, 'মেফিস্টোফিলিস!'

হাবুল যেন বললে, 'খাইছে!'

আর ক্যাবলা কিছুই বললে না, হাঁ করে চেয়ে রইল কেবল। তার চশমাটা নাকের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ল নিচের দিকে।

কী দেখলুম, সে আর কী বলব তোমাদের! ছোট্ট ঘরটা এই দিন-দুপুরেই অন্ধকার, তার ভেতরে মালার মতো করে লাল নীল

অনেকগুলো ইলেকট্রিকের বাল্‌ব্‌ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্‌বগুলো মিটমিটে হলেও অনেক ক-টা একসঙ্গে জ্বলছে বলে একটা অদ্ভুত রঙিন আলো থম-থম করছে ঘরময়। সেই আলোয় চিকচিক করছে মস্ত একটা সিংহাসন—রুপো-টুপো তাতে লাগানো আছে বোধহয়। সিংহাসনের মাথায় একটা সাদা ছাতা, আর সেই ছাতার তলায় ভেলভেটের গদিতে বসে—

স্বয়ং মা নেংটীশ্বরী! অর্থাৎ কিনা—ইয়া জাঁদরেল একটা নেংটি ইঁদুর।

নেংটি ইঁদুরটার মূর্তি একটা তুমশো হুলোবেড়ালের চাইতেও তিনগুণ বড়ো। সামনের পা-দুটো জড়ো করে, কান খাড়া করে, ল্যাজটাকে পিঠের ওপর দিয়ে বাঁকিয়ে এমন কায়দায় বসে আছে যে আচম্‌কা দেখলে জ্যান্ত বলে মনে হয়। চোখদুটো বোধ করি কালো কাঁচ কিংবা পুঁতি দিয়ে তৈরি—লাল-নীল আলোতে সে দুটো যেন শয়তানিতে চিকচিক করছে। তার সামনে একটা মস্ত বারকোষে ছোলা-কলা-বাতাসা-চাল-ডাল এইসব সাজানো রয়েছে, দেবী নেংটীশ্বরীর ভোগ নিশ্চয়।

তাকিয়ে তাকিয়ে প্রাণ চমকে উঠল। রাত-বিরেতে ও-রকম একখানা পেল্লায় ইঁদুর যদি কারুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে আর দেখতে হবে না! কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দেবে একেবারে!

লোকটা ধমক দিয়ে বললে, 'কিহে—হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছ যে বড়ো? বোম্বাচাক লেগে গেল নাকি তোমাদের? মা-কে পেন্নাম করলে না?'

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা চারজনে একেবারে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লুম।

লোকটা বলে চলল, 'হেঁ-হেঁ, ভারি দুর্লভ মূর্তি! দুনিয়ায়

কোথাও দেখতে পাবে না! এঁর প্রিতিষ্ঠে করেছন কে জানো? বাবা বিটকেলানন্দ। তাঁর নাম শুনেছ তো?'

আমরা এ-ওর মুখের দিকে চাইলুম। বিটকেলানন্দ! স্বামী ঘুটঘুটানন্দের সঙ্গে একবার রায়গড়ের জঙ্গলে আমাদের দারুণ রকমের একটা মোলাকাত হয়েছিল—তাকে মূলো কাত-ও বলা যায়, কারণ তিনি আমাদের চারজনকে প্রায় কাত করে ফেলেছিলেন। বিটকেলানন্দ তাঁরই মাসতুতো ভাই কি না, কে জানে!

ক্যাবলা ঘাড়-টাড় চুলকে বললে, 'আজ্ঞে, তা—তা শুনেছি বইকি। বাবা বিটকেলানন্দের নাম কে-ই বা না জানে!'

লোকটা ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল: 'সে কথা আর বোলো না! তোমরা বুদ্ধিমান বলে তাঁর খবর রাখো, তাই চাঁদনিতে গিয়ে খালের জলের কবিতা আউড়ে এখানে আসতে পেরেছ। কিন্তু অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, ঠোঁট উল্টে অমনি বলে বসবে—অ্যাঁ, বিটকেলানন্দ! সে আবার কে!—লোকটার মুখ মনের দুঃখে যেন লম্বা হয়ে গেল: 'ছ্যাঃ, এইজন্যেই দেশটার কিছু হয় না!'

সঙ্গে সঙ্গে টেনিদাও কেমন বাজখাঁই গলায় বলে বসল, 'আজ্ঞে যা বলেছেন—এইজন্যেই দেশের কিছু হয় না।' কি রকম বাঘাটে গলায় টেনিদা বলে ফেলল কথাটা, ঘর গম্‌গম্ করে উঠল, লোকটাও যেন চমকে গেল। তারপর বললে, 'অথচ দ্যাখো—বাবা বিটকেলানন্দ স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। চালাকি নয়!'

'খাইছে!' হাবুল আর থাকতে পারল না।

'খাইছে?' লোকটা আবার চম্‌কে গেল: 'তার মানে? কী খেয়েছে? কোথায় খেয়েছে? কেনই বা খেল?'

ক্যাবলা বললে, 'যেতে দিন—যেতে দিন, ও মধ্যে মধ্যে ওইরকম বলে। কেউ কিচ্ছু খায়নি। এখন আপনি যা বলছিলেন বলুন।'

'আমি বলছিলুম, স্বপ্নাদেশ।'—লোকটা একবার গলা-খাঁকারি দিলে : 'বাবা বিটকেলানন্দ ছেলেবেলা থেকেই ভাবুক। ইস্কুলে মাস্টার পড়া জিজ্ঞেস করলে মৌনী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন—পাষণ্ড মাস্টারগুলো ভাবত—বাবার মাথায় কিছু নেই, তাই তাঁকে গোরুর মতো ঠ্যাঙাতো। তারা তো জানত না—বাবা তখন ধ্যান করছেন। কিছু না বুঝেই মহাপাপী মাস্টারেরা পিটিয়ে তাঁর ধুদ্ধুড়ি উড়িয়ে দিত—ক্লাসে প্রোমোশন দিত না।'

আমি বললুম, 'আহা।'

ক্যাবলা বললে, 'আহা-হা।'

হাবুলও যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঘাড়ে একটা থাবড়া বসিয়ে টেনিদা তাকে থামিয়ে দিলে। লোকটার গলার স্বর ভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল, সে বললে, 'অহো-হো! যাক, তারপরে শোন। ঠ্যাঙানি খেতে খেতে বাবা বিটকেলানন্দের মতো মহাপুরুষেরও ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি ভেবে দেখলেন, মাস্টারের গাঁট্টাতেই যদি তাঁকে মহাপ্রস্থানে যেতে হয়, তাহলে তিনি ধ্যান-জপ করবেন কী করে—আবার জীবেরই বা গতি হবে কী! তারপর একদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে সটকালেন।'

ক্যাবলা বললে, 'বুদ্ধের গৃহত্যাগ আর-কি।'

লোকটা মাথা নাড়ল : 'যা বলেছ, ব্যাপার প্রায় সেইরকম। কিন্তু কী জানো, বুদ্ধের কাল তো এটা না, মহাপুরুষকে এখন আর চেনে কে! তাই বাবা আর বোধিবৃক্ষের তলায় বসলেন না, তার বদলে গিয়ে চাকরি নিলেন বড়বাজারের পেটমোটা এক শেঠজীর গদিতে। সেখানে অনেক দেখলেন, অনেক শিখলেন। চালে কাঁকর মেশানো, আটায় ভুষি মেশানো, ওষুধে ভেজাল দেওয়া—সব জানলেন। জেনে শুনে বাবার মগজ সাফ হয়ে গেল—তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন।'

'কী স্বপ্ন?' টেনিদা জিজ্ঞেস করলে।

'দেখলেন, স্বর্গে পালে পালে নেংটি ইঁদুর হানা দিয়েছে—সেখানকার চাল-ডাল-মধু-সুজি-ফল-পাকড় সব খেয়ে ফেলেছে, দেবতাদের ঝাঁকে ঝাঁকে তাড়া করেছে, ইন্দ্র-চন্দ্র-কার্তিক-টার্তিক সবাই বাপরে মা-রে বলে ছুটে পালাচ্ছে। আর ইন্দ্রের ফাঁকা সিংহাসনে বসে গোঁফ ফুলিয়ে দেবী নেংটীশ্বরী বলছেন—"দেখছিস কি, এখন থেকে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে আমারই রাজত্ব শুরু হল। আমার হুকুম-মতোই সব চলবে। আজ থেকে তোদের কাজ হল নেংটি ইঁদুরের মতো চুরি করা—গর্ত কেটে, যেখানে যা পাওয়া যায়—সব লোপাট করা। বাঁচতে হলে এখন থেকে এই রাস্তাই তোদের ধরতে হবে।" দেবী এই পর্যন্ত বলতে বলতেই ছুটো হুলো বেড়ালের ঝগড়ার আওয়াজে বাবা বিটকেলানন্দের ঘুম ভেঙে গেল, হুলোর ভয়েই দেবী উধাও হলেন কি না কে জানে। আর বাবা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, "পেয়েছি—পেয়েছি!" তারপরেই দেবী নেংটীশ্বরীর এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা।'

ক্যাবলা বললে, উঃ, কী রোমাঞ্চকর!'

টেনিদা ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ, পয়লা নম্বরের মেফিস্টোফিলিস!'

'মেফিস্টোফিলিস?' লোকটা চোখ পিট্‌পিট্ করে বললে, 'তার মানে?'

আমি বললাম, 'তার মানে ইয়াক ইয়াক!'

'ইয়াক ইয়াক? সে আবার কী?' লোকটা খাবি খেলো: 'তোমরা কোন্ দেশের লোক হে? তোমাদের যে ভাষাই বোঝা যায় না!'

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, 'ছেড়ে দিন, ওদের ছেলেমানুষি ছেড়ে দিন। মানে, খুশি হলে ওরা অনেক সময় ও-সব বলে, ওগুলোর কোন মানে নেই। এখন আপনি যা বলছিলেন বলুন।'

লোকটা বিরক্ত হয়ে বললে, 'বলতেই তো চাচ্ছি, কিন্তু তোমরা কিসব বিচ্ছিরি ভাষা আউড়ে সব গোলমাল করে দিচ্ছ।'

আমি বললুম, 'বাবা বিটকেলানন্দ এখানে আছেন?'

লোকটা আরো ব্যাজার হল: 'থাকতেই তো চেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাও ম্যাও।'

'ম্যাও ম্যাও?'

'আবার কী?—ওরা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল, বলে কিনা, বাবা চোর, বাবা কালোবাজারী! সইবে না—সইবে না!'—ভীষণ চটে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলতে লাগল: 'বাবা যোগবলে জেলের গরাদে ভেঙে বেরিয়ে আসবেন। আর যে হাকিম তাঁকে জেলে দিয়েছে—'

টেনিদা বললে, 'তাঁর কী হবে?'

'কী হবে?'—দাঁত কিড়মিড় করে লোকটা বলতে লাগল: 'রাত্তিরে যখন সে ঘুমুবে, তখন মা নেংটীশ্বরীর ইঁদুরেরা দল বেঁধে গিয়ে তার ভুঁড়ি ফুটো করে দেবে। নির্ঘাৎ দেখে নিয়ো।'

বলতে বলতেই—

হঠাৎ কোত্থেকে বিকট গলায় যেন বিশটা হুলো বেড়াল একসঙ্গে ডেকে উঠল: 'ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও—'

আর দারুণ চমকে উঠল লোকটা।

'লুকোও—লুকোও—লুকোও! বাঁচতে চাও তো এখুনি লুকোও। নাহলে—'

সাত

ঘর-ঘর শব্দে মা নেংটীশ্বরীর মন্দিরের দরজা বন্ধ হল, সেই তাল-ঢ্যাঙা লোকটা জালে-পড়া গলদা চিংড়ির মতো ছটফটিয়ে উঠল, নেংটীশ্বরীর চোখদুটো ঘরের সেই নানা রঙের আলোতে ঝকঝক জ্বলতে লাগল, কেমন যেন মনে হতে লাগল—মা আলোর দিকে কটমটিয়ে চেয়ে রয়েছেন, এখুনি 'ইচ্-কিচ্-খিচ' বলে তেড়ে কামড়াতে আসবেন। তার উপরে আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিচ্ছিরি গুমোট গরমে আমরা সেদ্ধ হচ্ছিলুম—কেমন একটা বদখত গন্ধ আসছিল। একবার মনে হল ওটা নেংটি ইঁদুরের, তারপরেই মনে হল, না, চামচিকের গন্ধ।

একেবারে বেকুব বনে গিয়ে আমরা চার মূর্তি আলু-সেদ্ধর মতো চারটে মুখ করে এ-ওর দিকে চেয়ে রইলুম। আর টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে একবার চুলকে নিয়ে বললে, 'হুঁ, পুঁদিচ্চেরি!'

লোকটা কি-রকম চমকে গেল। বললে, 'পুঁদিচ্চেরি! সে আবার কী?'

হাবুল বললে, 'ওটা হৈল গিয়া ফরাসী ভাষা। তার মানে হৈল, ব্যাপার খুবই সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠছে।'

তাল-ঢ্যাঙা লোকটা তাই শুনে এমন ব্যাজার হয়ে গেল যে মনে হল, এক্ষুনি কেউ তাকে জোর করে একমুঠো নিমপাতা খাইয়ে দিয়েছে। সে বললে, 'ব্যাপার খুবই সাঙ্ঘাতিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ফরাসী ভাষা বলো আর যাই বলো—ফিসফিসিয়ে বলবে। শুনলে না—ম্যাও-ম্যাও এসেছে? যদিও

এ-ঘরে ঢুকতে পারবে না—আর ঘরটা, কী বলে, এমন কায়দায় তৈরি যে বাইরে বোঝাই যায় না এখানে ঘর আছে, তবু সাবধানের বিনাশ নেই—বুঝতে পারছ না?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু ম্যাও-ম্যাওটা—'

ক্যাবলা আমাকে একটা চিম্‌টি কাটল, কিন্তু যখন বলেই ফেলেছি, তখন কথাটা আর সামলে নেওয়া যায় না। লোকটা আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেন, ম্যাও-ম্যাও বুঝতে পারছ না? আচ্ছা, নেংটি ইঁদুরের শত্রু কে?'

হাবুল বুদ্ধি করে বললে, 'মানুষ।'

'উঁহু, হল না।' লোকটা হ-য-ব-র-ল-র কাক্কেশ্বর কুচ্‌কুচের মতো মাথা নেড়ে বললে, 'হয়নি, ফেল। তোমার মগজে দেখছি কিছু নেই।'

ক্যাবলা বললে, 'আজ্ঞে না, সেইজন্যেই তো ওর নাম হাবলা। নেংটি ইঁদুরের শত্রু হচ্ছে বেড়াল।'

'ইয়া, রাইট। তাহলে মা নেংটীশ্বরীর শত্রু কে হতে পারে?'

ক্যাবলা বললে, 'পুলিশ।'

'ঠিক্‌, একদম কারেক্‌ট্‌। এইবার বুঝতে পারছ তো? আড্ডায় পুলিশ হানা দিয়েছে। ধরতে যদি পারে আমাদের সকলকে একেবারে সোজা শ্রীঘর।'

'শ্রীঘর?' টেনিদা খাবি খেয়ে বললে, 'মানে, জেল?'

লোকটা ঠোঁটে আঙুল দিলে।

'স্‌-স্‌-স্‌! তোমার তো দেখছি একেবারে হাঁড়িচাঁচার মতো গলা হে! একটু আস্তে কথা বলতে পার না? তা ভেবেছ কী? পুলিশে একবার ধরতে পারলে তোমায় কি নেমন্তন্ন করে পোলাও

কালিয়া খাওয়াবে? একেবারে তিনটি বছর ঘানিগাছে ঘুরিয়ে দেবে—খেয়াল থাকে যেন।'

টেনিদা ধুপ করে সেই চামচিকের গন্ধভরা মেঝেটার ওপর বসে পড়ল, আমার পেটের ভেতরে পিলেটিলেগুলো যেন কি রকম তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল, হাবুল মুখটাকে ফাঁক করে এমন-ভাবে চেয়ে রইল যে মনে হল সে এখুনি হাউ-মাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠবে। এ আবার কী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল রে বাপু! সেই উনপাঁজুর বিশ্ববখাটে কম্বলকে খুঁজতে এসে শেষে জেল খাটতে হবে—কে জানে কোন্ চুরি বাটপাড়ির দায়েই জেল খাটতে হবে! আগে একটুখানি বুঝতে পারলেও কে এমন ফ্যাচাঙের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিত! কিংবা আমাদের গোড়াতেই বোঝা উচিত ছিল—টেনিদার নাক-বরাবর পচা আমটা যখন শত্রুর অদৃশ্য আক্রমণ থেকে ছুটে এসেছিল—সেই তখন!

আসলে, সব দোষ ক্যাবলার। ও-ই তো কি-রকম বক্তৃতা দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করে দিলে! মনে হল, নিরুদ্দেশ কম্বলকে খুঁজে বের করার মতন মহৎ কাজ দুনিয়ায় আর বুঝি দ্বিতীয় নেই। আমার একটা ভীষণ জিংঘাসা জাগল, ইচ্ছে করল ক্যাবলার গায়ে কয়েকটা লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দিই, কয়েকটা বিছুটির পাতা ঘষে দিই ওর পায়ে। কিন্তু এখানে লাল পিঁপড়েও নেই, বিছুটিও নেই। এখন কেবল পুলিশের হাতে পড়া, তারপর জেল খাটতে যাওয়া।

জেল খাটতেও নয় রাজি আছি, কিন্তু জেল থেকে বেরুবার পর? বড়দা কি পিঠের একফালি চামড়া বাকি রাখবে? কিম্বা জেলে যাওয়ার আগেই এসে এমন ধড়াধ্-ধম্ পিটুনি লাগিয়ে যাবে তাতেই ছ-মাস কাটাতে হবে হাসপাতালে।

আমার চোখের সামনে শর্ষের ফুল-টুল কিসব দুলতে লাগল। যেন দেখতে পেলুম মা নেংটীশ্বরী মুখটা একটুখানি ফাঁক করে আমার

দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচুচ্ছেন, তাঁর বাঁকা লেজটা যেন অল্প অল্প নড়ছে মনে হল, আমি যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ব, আমার দাঁত-কপাটি লেগে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে শুনতে পেলুম, টেনিদা তোতলা হয়ে বলতে লাগল : 'পুল্-পুল্ পুলিশ'—

তাই শুনে লোকটা উচ্চিংড়ের মতো ভেংচি কেটে বললে, 'ডোণ্ট বি ফুলিশ! বললুম তো, সাড়া কিছু কোরো না—তাহলেই আর টের পাবে না। আজই তো আর প্রথম নয়, এর আগে আরো তিন-চারবার তো ম্যাও-ম্যাও এসে গেছে, কিন্তু ধরতে পেরেছে কাউকে? নেংটি ইঁদুর একবার গর্তে ঢুকলে বেড়াল কিছু করতে পারে তার? এটা হল মা নেংটীশ্বরীর গর্ত, যতক্ষণ এখানে আছ—ততক্ষণ, ওই যে ইংরেজিতে কী বলে—একেবারে সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি।'

এর ভেতরেও ক্যাবলা পণ্ডিতি করবার লোভ সামলাতে পারল না। টিক্-টিক্ করে বলতে লাগল : 'আজ্ঞে ভুল করেছেন। ওটা সাউণ্ড এণ্ড ফিউরি নয়—সেফ অ্যাণ্ড সাউণ্ড।'

তাই শুনে লোকটার মুখ ঠিক একটা ছারপোকার মতো হিংস্র হয়ে গেল। বললে, 'তুমি থাম হে ছোকরা, বেশি পণ্ডিতি কোরো না! চল্লিশ বছর এই সাউণ্ড অ্যাণ্ড ফিউরি দিয়ে চালিয়ে দিলুম, তুমি এসেছ ওস্তাদি করতে! বেশি বকিয়ো না এখন, বাইরে শত্রু, ঝাঁ করে হয়ত বা কান ধরেই পেঁচিয়ে দেব তোমায়!'

ক্যাবলা রেগে ঠিক একটা টোমাটোর মতো রাঙা হয়ে গেল, তারপর কি একটা গোঁ গোঁ করে বলে উঠেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাবলার পণ্ডিতি আমরা অবশ্য কেউ-ই পছন্দ করি না, কিন্তু তাই বলে বাইরের একটা উট্কো লোক এসে তার কান ধরতে চাইবে—সে স্কলারশিপ-পাওয়া কলেজের ছাত্র, এ-ও তো আমাদের পটলডাঙার একটা জ্বালাময়ী অপমান!

যা ভেবেছি তাই—আমাদের লীডার টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে গাঁ গাঁ করে উঠল।

'কী বলছেন মশাই, কান ধরে পেঁচিয়ে দেবেন? আমরা পটলডাঙার ছেলে—খেয়াল রাখবেন সেটা! হয় আপনার কথা উইথ্‌ড্র করুন, নইলে এগিয়ে আসুন—হয়ে যাক এক হাত!'

লোকটা বোধহয় এতটা আশা করেনি, কিরকম ভেবড়ে গেল কথাটা শুনে। একটু আগেই আমি অজ্ঞান হব-হব ভাবছিলুম, এখন মনে হল মারামারিটা না দেখে অজ্ঞান হবার কোন মানেই হয় না। চোখ-কান খুলে খুব খুশি হয়ে দেখতে পেলুম, টেনিদা আস্তিন গোটাচ্ছে।

'শিগরির উইথ্‌ড্র করুন বলছি, নইলে'—

লোকটা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা হলে কী হয়, বেজায় কাপুরুষ। আড়চোখে টেনিদার চওড়া চিতোনো বুকের দিকে তাকিয়ে দেখল

একবার। তারপর বললে, 'আহা—যেতে দাও, মানে—বাইরে পুলিশ, এখন আত্মকলহ করে দরকার নেই। গোলমাল শুনলেই টের পেয়ে যাবে। তার চেয়ে এসো—সন্ধি বলে ফেলা যাক। ওই যে ইংরেজীতে কী বলে—ফরফিট অ্যাণ্ড্ ফরগেট—'

ক্যাবলা বললে, 'উঁহু, আবার ভুল হল। ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরগেট।'

লোকটার মুখ আবার একটা ছারপোকার মুখের মতো হিংস্র হতে যাচ্ছিল, কিন্তু টেনিদার আস্তিনের দিকে তাকিয়ে কিরকম বিবর্ণ হয়ে গেল, তার মুখটাকে ফড়িংয়ের মুখের মতো মনে হল এখন। সে কেমন যেন পিঁপড়ের গলায় চুঁ চুঁ করে বললে, 'আচ্ছা-আচ্ছা, তাই হল, ফরগিভ অ্যাণ্ড ফরফিট।'

'আবার ভুল করলেন। ফরফিট নয়, ফরগেট।'

'তাই হবে, ফরগেট। আমি উইথ্‌ড্র করলুম। ওহে ছোকরা, তুমি আর আস্তিন-ফাস্তিন গুটিয়ো না। ওদিকে বাইরে পুলিশ, এদিকে আমার হার্ট খারাপ, এর মধ্যে তুমি আবার যদি দুড়ুদ্দুম করে আমাকে ঘুসি লাগিয়ে দাও—তাহলে আর আমি বাঁচব না।'

টেনিদা খুশি হয়ে বললে, 'বেশ আসুন, হ্যাণ্ডশেক করি। ভাব হয়ে যাক।'

'হ্যাণ্ডশেক?' লোকটা সন্দেহে মিটমিটে চোখে চেয়ে রইল: 'শেষকালে পাঞ্জা ধরে আঙুল-টাঙুল ভেঙে দেবে নাতো? আমার শরীর ভাল নয়, সে আগেই বলে রাখছি।'

টেনিদা বললে, 'না-না, কোন ভয় নেই আপনার। মা কালী, মা নেংটীশ্বরীর দিব্যি, আপনার আঙুলে চাপ দেব না। নিন—আসুন, হা ডু ডু—'

লোকটা বললে, 'হা-ডু ডু? আমি তো কপাটি খেলিনে। আমি—'

কিন্তু কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে থেকে পর-পর কয়েকটা জোরালো চিঁচির আওয়াজ উঠল। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বললে, 'জয় গুরু—লাইন ক্লিয়ার! ম্যাও-ম্যাও চলে গেছে!'

ঘড়ঘড়িয়ে দরজাটা খুলে গেল। যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম আমরা। আর সব ভুলে-টুলে গিয়ে টেনিদা গলা খুলে চেঁচিয়ে উঠল: 'ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—'

সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বললাম: 'ইয়াক্-ইয়াক্!'

লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল—এবার ঠিক আরশোলার মতো হয়ে গেল ওর মুখটা: 'কী বলে তোমরা চেঁচালে?'

'ডি লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—ইয়াক্-ইয়াক্!' আমি জবাব দিলুম।

'মানে কী ওর?'

হাবুল সেন বললে, 'এটা হৈল ফরাসী ভাষা। মানেটা হৈল গিয়া বড়ই কঠিন।'

লোকটা পির্-পির্ করে বললে, 'তাই দেখছি! কিন্তু যাই বল বাপু, তোমাদের হালচাল আমি বুঝতে পারছি না। তোমরা কোন্ ব্র্যাঞ্চ থেকে আসছ? চট না চিড়েগুড়? সতরঞ্চি না ধুচনি?'

আমরা আর কেউ কিছু বলবার আগেই ফস করে ক্যাবলা বললে, 'কম্বল।'

'কম্বল?' লোকটা ভুরু কোঁচকালো: 'বুঝেছি, কোন নতুন ব্র্যাঞ্চ হবে। কিন্তু এখনো ও সম্বন্ধে আমরা কোনো খবর পাইনি। যাই হোক ছড়া যখন জানো আর চাঁদনি পর্যন্তও গেছ, তখন চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের কাছেই এবার চল। তার পারমিট পেলে তখনই ছল-ছল খালের জল বেরুতে পারবে। আর ঘর থেকে বেরুবার আগে আরো একবার মা নেংটীশ্বরীকে প্রণাম কর, তিনি সব সিদ্ধি দেবেন।'

আট

সেই তালঢ্যাঙা লোকটার সঙ্গে আমরা গুটি-গুটি পায়ে বেরোলুম নেংটীশ্বরীর মন্দির থেকে। লোকটা বললে, 'এবার হাওয়া-মহল। এই ডানদিকের সিঁড়ি।'

একটা চওড়া সিঁড়ি ওপরদিকে উঠে গেছে আমরা দেখতে পেলুম। এক সময়ে সিঁড়িটা খুব ভাল ছিল, পাথর-টাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল বলে মনে হয়। এখন এখানে-ওখানে পাথর উঠে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে, এই দুপুরবেলাতেও কেমন যেন একটা গুমোট অন্ধকার। মাঝে-মাঝে রেলিং ভেঙে গেছে। লোকটা বললে, 'একটু সাবধানে এস হে—ইয়ে, কী বলে, সিঁড়িটা তেমন সুবিধের নয়। আমরাই কখনো-কখনো আছাড়-টাছাড় খাই। দুঃখের কথা আর কী বলব হে, আমাদের গুরুদেব বিট্‌কেলানন্দ তো সিদ্ধপুরুষ, তা তিনিই একবার এমন কুমড়ো-গড়ান গড়ালেন যে—'

হাবুল বললে, 'সিদ্ধপুরুষ অ্যাকেবারে ভাজাপুরুষ হইয়া গেলেন!'

লোকটা থেমে দাঁড়িয়ে কট্‌কট্ করে হাবুলের দিকে তাকালো। বললে, 'তুমি তো দেখছি ভারি ফক্কড় হে ছোকরা! গুরুদেবকে নিয়ে মশ্‌করা!'

ক্যাবলা বললে, 'ছেড়ে দিন, ওর কথা ছেড়ে দিন! ওটা একটা ঢাকাই পরোটা!'

'ঢাকাই পরোটা! তার মানে?'

মানেটা বোঝাবার আগেই আমি একটা চিৎকার ছাড়লুম আর

গুরুজী বিট্‌কেলানন্দের মতোই একটা কুমড়ো-গড়ান অনেক কষ্টে সামলে গেলুম। আমার দু-কানে দুটো ঝাপ্‌টা মেরে ই-কিচঁ-কিচঁ বলতে বলতে একজোড়া চামচিকে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লোকটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল: 'ভয় নেই হে, ওরা আমাদের পোষা। কিচ্ছু বলে না কাউকে।'

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, 'কী যা-তা বলছেন! চামচিকে কারু পোষা হয়?'

'হয়—হয়। গুরুজী বিট্‌কেলানন্দ চামচিকে তো দূরের কথা ছারপোকাকে পর্যন্ত বশ মানাতে পারেন। হয়ত ডেকে বললেন, এই খাটমল—নিকাল আও বাচ্চা—জেরা ড্যান্‌স্ করো, অমনি তক্তপোষের ফাটল থেকে দলে দলে ছারপোকা বেরিয়ে ট্যাঙ্গো নাচ শুরু করেছে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'ট্যাঙ্গো নাচ কাকে বলে?'

লোকটা বললে, 'আমি কী করে জানব? অতই যদি জানব, তাহলে তো অ্যাদ্দিনে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারতুম। এ-সব ধাষ্টামো করে বেড়াতে হত না।'

হাবুল মাথা চুলকোতে লাগল। ভেবে-চিন্তে বললে, 'তাহলে পাট্‌কেলানন্দেরে ম্যাও-ম্যাওতে ধইর‍্যা লইয়া গ্যাল ক্যান্? তিনি তো তাগোও ট্যাঙ্গো ট্যাঙ্গো কইর‍্যা নাচাইতে পারতেন।'

লোকটা আরশোলার মতো ঘাবড়ানো-ঘাবড়ানো মুখ করে বললে, 'বোকো না। এখন সবাই বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ করে থাক দিকি! এইবারে কাজের কথা হবে। আমরা এসে গেছি।'

সত্যিই আমরা এসে গিয়েছিলুম। দোতলায়। সামনেই একটা ফাটল-ধরা ময়লা-মতন মস্ত বড়ো ন্যাড়া ছাদ। আর এক কোণায় একটা ঘর। ঘরের সামনে বড়ো একটা খাঁচা, তার ভেতরে একটা বাদুড়—নিচে মাথা দিয়ে ঝুলে রয়েছে। আমাদের দিকে ঘুম-ঘুম চোখ মেলে চেয়ে দেখল একবার।

ক্যাবলা বললে, 'ওকি স্যার—ওখানে একটা বাদুড় কেন?'

'বাদুড় বোলো না, ওর নাম অবকাশরঞ্জিনী।'

'অবকাশরঞ্জিনী।'—ক্যাবলা খাবি খেলো: 'বাদুড়ের কখনো ওমন নাম হয়?'

'হয়—হয়। নামের তোমরা কী জান হে? এ-সব গুরুদেবের লীলা। জানো—উনি একটা ছারপোকার নাম দিয়েছেন বিক্রম-সিংহ। আর এই যে বাদুড় দেখছ, ইটি সামান্যি নয়। এই যে অবকাশরঞ্জিনী—এ খুব ভাল ধামার গাইতে পারে।'

টেনিদা হঠাৎ গাঁ-গাঁ করে বললে, 'কিচ্ছু বিশ্বাস করি না—একদম গুল্।'

'গুল?'—লোকটা কিরকম যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল: 'বেশ, তাহলে এ-সব কথা থাক। এখন কাজের কথা হোক।'

'কার সঙ্গে কাজের কথা?' আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম: 'ওই অবকাশরঞ্জিনীর সঙ্গে নাকি?'

'চুপ!'—ঠোঁটে আঙুল দিয়ে লোকটা বললে, 'দাঁড়াও।'

সামনে ঘরটার দরজা ভেজানো ছিল। ঢ্যাঙা লোকটা আলগোছে একটা ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। আর তক্ষুনি ভেতর থেকে কে যেন ক্যাঁ-ক্যাঁ করে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমার জ্বর হয়েছে, ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছে, পেটের মধ্যে রিং-ওয়ার্ম হয়েছে, কে জানে জলাতঙ্কও হয়েছে কি না! আমি এখন যাকে-তাকে কামড়ে দিতে পারি! আমি কোন কথাই জানিনে হুজুর—আমাকে ছেড়ে দিন!'

আমরা দেখতে পেলুম, ঘরের ভেতর মাদুর পাতা। তার ওপর একটা লোক একরাশ কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, আর খালি খালি বিচ্ছিরি গলায় বলছে, 'আমার জলাতঙ্ক হয়েছে স্যার—মাইরি বলছি—এখন আমি লোক পেলেই কামড়ে দেব!'

তিন লাফ দিয়ে আমরা চারজন পিছিয়ে এলুম। ঢ্যাঙা লোকটা বললে, 'আঃ, কী হচ্ছে হে চক্রধর! খামোকা ভদ্দর-লোকের ছেলেদের ঘাবড়ে দিচ্ছ কেন? কম্বল ফেলে চেয়েই ছ্যাখো না একবার! ম্যাও-ম্যাও নেই, তারা অনেকক্ষণ চলে গেছে, আমি বিন্দেবন কথা কইছি।'

শুনেই, কাঁথা-কম্বলের ভেতর যেন তুফান উঠল একটা! সেগুলোকে চারদিকে ছিটকে ফেলে সোজা উঠে বসল একটা লোক—যার বর্ণনা এর আগেই আমরা শুনেছি। চোখ গোল-গোল করে আমরা চারজন দেখলুম, লোকটার কটকটে কালো রঙ, মুখে একটা ঝোল্লা গোঁফ, কপালের বাঁ-দিকে মস্ত আব। এই দারুণ গরমে কাঁথা-কম্বল চাপা দিয়ে সে ঘামে নেয়ে গেছে, কেমন ম্যাড়মেড়ে মুখ করে সে গঙ্গারামের মতো আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর সে বিন্দেবন—অর্থাৎ ঢ্যাঙা লোকটাকে বললে, 'তা তুমি এয়েছো, সেটা আগে কইতি কী হয়েচেলো?'

'কইব কখন?' বিন্দেবন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের সাড়া পেয়েই তো তুমি কঁ্যাথার ভেতরে সেন্ধিয়ে কঁ্যাচর-ম্যাচোর করতে লাগলে।' বিন্দেবন কলকাতার ঢং ছেড়ে দিয়ে দিব্যি দেশী ভাষায় কথা বলতে লাগল।

'সাবধানের বিনেশ নেই—বুয়েচো না?'—চক্রধর ফঁ্যাচ করে হেঁচে ফেলল: 'অ্যাই ছ্যাকো—গরমে কম্বল চাপিয়ে ঘেমে নেয়ে গিইচি, এখন বুঝি সর্দি লেগে গেল আবার! সে যাক—এঁয়ারা?'

'এঁয়ারা খদ্দের।'

খদ্দের? আমরা এ-ওর মুখের দিকে তাকালুম। টেনিদা কি একটা বলতেও যাচ্ছিল, ক্যাবলা তার পাঁজরায় ছোট্ট একটা চিমটি কাটল, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। আর চক্রধরও চোখ কুঁচকে

আমাদের দিকে চেয়ে রইল—যেন ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

বললে, 'খদ্দের? এত ছেলেমানুষ?'

টেনিদা বললে, 'আমরা কলেজে পড়ি। ছেলেমানুষ নই।'

'তা বটে—তা বটে—তাহলে তো আর ছেলেমানুষ কওয়া যায় না।'

বিন্দেবন মাথা নাড়ল: 'তা ছাড়া ওঁরা ছড়া বলেছেন; চাঁদনিতে তোমার দোকানেও গেছলেন।'—বিন্দেবন আমাদের দিকে তাকালো: 'বুঝেছেন তো, ইনিই হচ্ছেন গুরুদেবের প্রধান শিষ্য—পাট্‌কেলানন্দ। এঁকেই বাইরের লোকে চক্রধর সামন্ত বলে জানে। বসুন—বসুন আপনারা।'

আমরা মাদুরে বসে পড়লুম।

পাট্‌কেলানন্দ ওরফে চক্রধর এবার গম্ভীর হয়ে ঝোল্লা গোঁফে তা দিলে। তারপর খানিকক্ষণ ভাবুক-ভাবুক মুখ করে চোখ বুজে বসে রইল। সে যে আর চক্রধর নয়, একেবারে মূর্তিমান পাট্‌কেলানন্দ, সেইটেই যেন বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল আমাদের। এতক্ষণ যে কম্বলের তলায় পড়ে কঁ্যা-কঁ্যা করছিল, এখন আর তা বোঝবারও জো নেই।

বাইরে বাদুড়টা হঠাৎ খ্যাঁচম্যাচ আওয়াজ করে উঠল।

সেই আওয়াজে চক্রধর চোখ খুলল।

'ঠিক আছে। অবকাশরঞ্জিনী সাড়া দিয়েছে। ঠিক আছে।'

টেনিদা বোকার মতো বললে, 'মানে?'

'মানে অবকাশরঞ্জিনীর ভেতরে গুরুদেব যোগশক্তি সঞ্চার করেছেন। ও কঁ্যাচ্‌মেচিয়ে উঠলেই আমরা বুঝতে পারি, কোথাও কোন গোলমাল নেই।'

'যদি কঁ্যাচমাচ না করে?'—আমি জানতে চাইলুম।

'তাহলে খোঁচা দিতে হয়।'

'যদি তাও চুপ কইরা থাকে ?'—হাবুল কৌতূহলী হল।

'তখন বুঝতে হবে ব্যাপার খুব সঙিন। তখন তক্তোপোষের ফাটল থেকে বিক্রম সিংহকে ডাকতে হবে। যাক্‌গে, সে সব অনেক কথা'—চক্রধর বললে, 'তাহলে আপনারা চারজন ?'

টেনিদা বললে, 'হুঁ, চারজন।'

'কোথায় থাকেন ?'

'পটলডাঙা।'

'ছড়া বলুন'—

সঙ্গে সঙ্গে নাম্‌তা পড়ার মতো আমরা কোরাসে আরম্ভ করলুম :

'চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর—'

চক্রধর বললে, 'থাক—থাক, আর দরকার নেই! চন্দ্রকান্তকে ওখানে গিয়েই পাবেন—মানে মহিষাদলে। এই বিন্দেবনই আপনাদের নিয়ে যাবে। টাকার রসিদ আছে তো ?'

টাকার রসিদ! আমি চমকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, ক্যাবলা আমাকে একটা খোঁচা মারল। তারপর বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, রসিদ-টসিদ সব আছে। বাড়িতে রেখে এসেছি।'

'তাহলে আর কী ? কবে যাবেন ?'

ক্যাবলা ফস্‌ করে বললে, 'রবিবার।'

'সে তো বেশ কথা। আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবেন। ভোর ছ-টার মধ্যে এলে চটপট চলে যেতে পারবেন, সন্ধের মধ্যে ফিরেও আসতে পারবেন। রাজি ?'

আমরা কিছু বলার আগেই ক্যাবলা বললে, 'রাজি।'

'তাহলে এই কথা রইল।'—চক্রধর আবার ফ্যাঁচ করে হেঁচে উঠল : 'ইঃ, জব্বর সর্দিটাই লাগল! খামোকা কাঁথা-কম্বল চাপিয়ে—মরুকগে, এখন মা নেংটীশ্বরীকে প্রণাম করে বাড়ি যান। আর রবিবারে ভোর ছ-টায় আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবেন। ঠিক ?'

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক।'

'জয় মা নেংটীশ্বরী—তোমারই ইচ্ছে মা!'—চক্রধর শিবনেত্র হয়ে যেন ধ্যানে বসল। তারপর বললে, 'হ্যাঁ—আর একটা কথা। যাবার আগে অবকাশরঞ্জিনীর ভোগের জন্যে স-পাঁচ আনা পয়সা রেখে যাবেন মনে করে।'

সে তো হল। রবিবার না-হয় মহিষাদলেই আমরা গেলুম। কিন্তু তারপর ?

সবটাই কি-রকম গোলমেলে ঠেকছে। হতচ্ছাড়া কম্বলের আগাগোড়াই বিটকেল ব্যাপার। যখন নিরুদ্দেশ হয় নি, তখন পাড়াশুদ্ধ লোকের হাড় ভাজা-ভাজা করে ফেলছিল ; যখন উধাও হল, তখনও মাথার ভেতরে বন্‌বনিয়ে কুমোরের চাক ঘুরিয়ে দিলে।

আচ্ছা—তোমরাই বল, লোকে কি আর নিরুদ্দেশ হয় না ? পরীক্ষায় ফেল-টেল করে ঠ্যাঙানি খাওয়ার ভয়ে কিংবা হয়ত ঠাকুর্দার কাছ থেকে একটা গীটার আদায় করবার আশায়, কেউ হয়ত বন্ধুর বাড়িতে চম্পট দেয়—আবার কেউ বা মাসি-পিসির বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। তারপর যেই বিজ্ঞাপন বেরুল : 'প্রিয় ট্যাঁপা, শীঘ্র ফিরিয়া আইস, মা মৃত্যুশয্যায়, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না', কিংবা 'স্নেহের গ্যাদা, তোমার ঠিকানা দাও—সকলেই কাঁদিতেছে—' তখন গর্তের থেকে পিঁপড়ের মতো সব সুড়-সুড় করে একে একে বেরিয়ে এল। তারপর বরাত বুঝে কারুর অদৃষ্টে চাঁটানি, কারুর বা হাওয়াইন গীটার।

কিন্তু এইসব ভাল ছেলেদের মতো বুঝে-সুঝে 'নিরুদ্দেশ' হবে, কম্বলচন্দর কি সে জাতের নাকি ? তার কাকা বলে বসল—সে চাঁদে গেছে, তার নাকি ছেলেবেলা থেকেই চাঁদে যাওয়ার 'গ্যাক' আছে একটা। এ-সব বাজে কথা কে কবে শুনেছে ? তারপরে ল্যাঠার পর ল্যাঠা! কোত্থেকে কান ঘেঁষে একটা আমের আঁঠি, একটা যাচ্ছেতাই ছড়া—চাঁদনির বাজার, শেয়ালপুকুর, পাটকেলানন্দ,

মা নেংটীশ্বরী, ঝোল্লা-গোঁফ চক্রধর সামন্ত—বাদুড়ের নাম অবকাশ-রঞ্জিনী—ধুত্তোর, কোনো মানে হয় না এ-সবের ?

এতেও শেষ নয়। এখন আবার ঘাড়ে চড়াও হয়েছে এক তালঢ্যাঙা বিন্দেবন। আবার তার সঙ্গে রবিবারে মহিষাদলে যেতে হবে। মহিষাদল নামটাই যেন কি রকম—শুনলেই মনে হয় একদল বুনো মোষ শিং বাগিয়ে তাড়া করে আসছে। কপালে কী আছে কে জানে! চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর আমাদের কোন্ চাঁদে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে—তাই বা কে বলতে পারে!

তারপর আবার কি সব রসিদ-ফসিদের কথাও বলছিল চক্রধর। তার মানে, অনেক গণ্ডগোল আছে ভেতরে। ক্যাবলা সমানে তো টিক্-টিক্ করছে, কিন্তু মহিষাদলের মোষদের পাল্লায় পড়ে—

আমি আর হাবুল সেন এ-সব নিয়ে অনেক গবেষণা করলুম।

হাবুল ভেবে-চিন্তে বললে, 'সত্য কইছিস প্যালা! আমরা ফ্যাচাঙে পড়ুম!'

আমি বললুম, 'তাছাড়া পেছনে আবার পুলিশ আছে ওদের। কী করছে লোকগুলো কে জানে! শেষকালে আমাদের শুদ্ধু ধরে নিয়ে যাবে!'

হাবুল: 'তা লইয়া যাইবো। লইয়া গিয়া রাম-পিটানি দিবো।'

আমি বললুম, 'আর বাড়িতে ?'

'কান ধইর‍্যা ছিঁড়্যা দিবো। পুলিশের পিটানির থিক্যাও সেটা খারাপ।'

আমি বললুম, 'অনেক খারাপ। তোর হয়ত একটা কান ছিঁড়ে দেবে, কিন্তু মেজদার বরাবর নজর আমার দুটো কানের দিকেই। ওর ডাক্তারি কাঁচি দিয়ে কচাকচ করে কেটে নেবে।'

হাবুল কিছুক্ষণ ভাবুকের মতো আমার কানের দিকে চেয়ে

রইল। শেষে মাথা নেড়ে বললে, ‘তা কাইট্যা নিলে তোরে নেহাত মন্দ ছাখাইবো না। তোর খাড়া খাড়া কান দুইখান—’

আমি বললুম, ‘শাট-আপ! বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে হাবলা!’

হাবুল ফের বললে, ‘আইচ্ছা, মনে যদি কষ্ট পাস, তাহলে ওই সব কথা থাকুক। তোর আদরের কান দুইখ্যান লইয়া তুই ঘাস-ফাস চাবা। তা অখন কী করন যায়, তাই ক।’

আমার ইচ্ছে করছিল হাবলাকে একটা চড় কসিয়ে দিই, কিন্তু ভেবে দেখলুম এখন গৃহযুদ্ধের সময় নয়। এইসব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর হাবলার সঙ্গে একটা ফয়সলা করা যাবে।

রাগ-টাগ সামলে নিয়ে বললুম, ‘তাহলে চল্, ক্যাবলার কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি—যা হয়েছে বেশ হয়েছে। আর দরকার নেই, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের চাঁদ বদন না দেখলেও আমাদের চলবে।’

হাবুল বললে, ‘হ। ছাখনের তো কত কী-ই আছে। ইচ্ছা হইলেই তো চিড়িয়াখানায় গিয়া আমরা জলহস্তীর বদনখান দেইখ্যা আসতে পারি। আর কম্বলরে দিয়াই বা আমাগো কী হইবো? পোলা তো না—য্যান্ একখান চামচিকা! চক্রধরের অবকাশ-রঞ্জিনীর থিক্যাও খারাপ!’

আমি সায় দিয়ে বললুম, ‘বিক্রমসিংহের চাইতেও খারাপ। সে তো শুধু ছারপোকা, ও একটা কাঁকড়াবিছে!’

এইসব ভাল ভাল আলোচনা করে আমরা ক্যাবলার কাছে গেলুম। কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। তার মা—মানে মাসিমা ছানার মুড়কি তৈরি করছিলেন, আমাদের বসিয়ে তাই খেতে দিলেন। আমরা ক্যাবলার ওপর রাগ করে এত বেশি খেয়ে নিলুম যে ক্যাবলার জন্যে কিছু রইল বলে মনে হল না।

পেট ঠাণ্ডা হলে মন খুশি হয়, আমরা দুজনে ‘বঙ্গ আমার জননী

আমার' গাইতে গাইতে যেই টেনিদার বাড়ির কাছে পৌঁছেছি, অমনি কোত্থেকে হাঁ-হাঁ করে বেরিয়ে এল টেনিদা।

'বেলা দশটার সময় অমন গাঁক-গাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছিস যে দু-জনে? ব্যাপার কী?'

হাবুল বললে, 'আমরা সঙ্গীত-চর্চা করতে আছিলাম।'

'সঙ্গীত-চর্চা? ওকে চচ্চড়ি বলে! তোদের গানের চোটে পাড়ায় আর কুকুর থাকবে না মনে হচ্ছে! তা এত আনন্দ কেন? কী হয়েছে?'

'আমরা ক্যাবলার বাড়িতে গিয়ে ছানার মুড়কি খেয়ে এসেছি।' আমি জানালুম।

'অ, তাই এত ফুর্তি হয়েছে! তা আমাকে ডেকে নিলি না কেন? ক্যাবলাও এমন বিশ্বাসঘাতক?'

'ক্যাবলাকে বাড়িতে পাইনি। আর তোমার কথা আমাদের মনে ছিল না।'

'মনে ছিল না?' টেনিদা চটে গেল। মুখটাকে বেগুনভাজার মতো করে বললে, 'ভাল কাজের সময় মনে থাকবে কেন?—যা বেরো এখান থেকে, গেট আউট!'

আমি বললুম, 'আউট আবার কোথায় হবো? বেরুবার আর জায়গা কোথায়? আমরা তো কর্পোরেশনের রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।'

টেনিদার মুখটা এবারে ধোঁকার ডালনার মতো হয়ে গেল। আরো ব্যাজার হয়ে বললে, 'ইচ্ছে করছে দুই চড়ে তোদের দাঁত-গুলোকে দাঁতনে পাঠিয়ে দিই! তাহলে মরগে যা—রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে কুকুর তাড়াগে!'

হাবুল বললে, 'না, কুকুর তাড়ামু না। তোমার কাছে আসছি।'

'আমাকে তাড়াতে চাস?'

'বালাই, ষাইট্, তোমারে তাড়াইবো কেডা? তুমি হইলা আমাগো লীডার—যারে কয় ছত্রপতি। তোমার কাছে অ্যাকটা নিবেদন আছিলো।'

'ইস্—ছানার মুড়কি খেয়ে খুব যে ভালো ভালো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। টেনিদা একটা ভেংচি কাটল: 'তা নিবেদন কী?'

'আমরা মহিষাদলে যামু না। মইষে গুঁতাইয়া মারবো।'

'যাসনে!'—বাঘাটে গলায় টেনিদা বললেন, 'লোকের বাড়ি বাড়ি চেয়ে-চিন্তে খেয়ে বেড়া। কাপুরুষ কোথাকার! কাওয়ার্ডস্ মেনি ডেথ ডাইজ—ইয়ে—টাইম—মানে বিফোর—'

আমি বললুম, 'উঁহু, ভুল হল। কাওয়ার্ডস ডাই মেনি ডেথস্—'

ছানার মুড়কির রাগ টেনিদা ভুলতে পারছিল না, চিৎকার করে বললে, 'শাটাপ! তোকে আর আমার ইংরিজি শুদ্ধু করতে হবে না—নিজে তো একত্রিশের ওপরে নম্বর পাস না! মরুক গে, কোথাও যেতে হবে না তোদের। আমি আর ক্যাবলা যাব, একটা দারুণ চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করব কম্বলকে, বীরচক্র পুরস্কার পাব, আর তোরা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকবি! কম্বলের কাকা যখন খ্যাঁট দেবে, তখন পোলাওয়ের গন্ধে দরজায় তোরা ঘুর-ঘুর করবি, ঢুকতে দেবে না, পিটিয়ে তাড়িয়ে দেবে।'

এই বলে টেনিদা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর ধড়াস করে বন্ধ করে দিল দোরটা।

তখন আমি আর হাবুল সেন এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। আমি বললুম, 'বুঝলি হাবুল, ব্যাপারটা রীতিমতো সঙিন!'

হাবুল বললে, 'হ। টেনিদা যারে পুঁদিচ্চেরি কয়, তাই। কি-রকম য্যান মেফিস্টোফিলিস-মেফিস্টোফিলিস মনে হইত্যাছে।'

আমি বললুম, 'তাহলে তো ওদের সঙ্গে যেতেই হয়, কী বলিস ?'

'হইবোই তো। বীরচক্র আমরাই বা পামু না ক্যান ? আর কম্বলের কাকার যখন অরগো মাংস পোলাউ খাওয়াইবো'—

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'আর বলিস নি, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে ! দেখিস, আমরাও খাব, নিশ্চয় খাব !'

'যা থাকে কপালে—পটলডাঙা জিন্দাবাদ !'

আমরা চারজন সেই কথামতো চক্রধরের দোকানের সামনে থেকে বিন্দেবনের সঙ্গে মহিষাদলে বেরিয়ে পড়েছি। বাড়িতে বলে এসেছি, রবিবারে এক বন্ধুর ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, সন্ধেবেলায় ফিরে আসব।

আসবার আগে মেজদা বলে দিয়েছে, 'পরের বাড়িতে গিয়ে মওকা পেয়ে যা-তা খাসনে। ওই তোর পিলে-পট্‌কা শরীর, শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবি।'

কী খাওয়া যে কপালে আছে—সে শুধু আমিই বুঝতে পারছি। কিন্তু বেঁচে থাকতে কাওয়ার্ড হওয়া যায় না—না-হয় মোষের গুঁতোতেই প্রাণ দেব। আমি কেবল বললুম, 'আচ্ছা—আচ্ছা।'

'আচ্ছা-আচ্ছা কী ? যদি পেটের গোলমাল হয়, তাহলে তোকে ধরে আটটা ইনজেকশন দেব—সে-কথা খেয়াল থাকে যেন !'

বাড়ির ছোট ছেলে হওয়ার সবচাইতে অসুবিধে এই যে, কোথাও কোন সিম্প্যাথি পাওয়া যায় না। এমনি ভালমানুষ ছোটদি পর্যন্ত খ্যা-খ্যা করে হাসছিল। আমি চটে-মটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। এইসব অপমান সহ্য করার চাইতে মৃত্যুও ভাল।

পাঁশকুড়া লোক্যালে চেপে আমরা রওনা হয়েছি হাওড়া থেকে। বিন্দেবন বললে, 'আমাদের নামতে হবে মেচেদায়, সেখান থেকে বাসে করে তমলুক হয়ে মহিষাদল। শুনে যত দূর মনে হচ্ছে তা নয়—যেতে বেশি সময় লাগবে না।'

কিন্তু মেচেদা নাম শুনেই আমার কী একটা ভীষণভাবে মনে পড়েছিল। একবার মামার সঙ্গে মেদিনীপুরে যাওয়ার সময়—এই মেচেদাতে—ঠিক ঠিক!

আমি বলে ফেললুম, 'মেচেদায় খুব ভালো সিঙাড়া পাওয়া যায় কিন্তু!'

টেনিদার চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু বিন্দেবনের সামনে প্রেস্টিজ রাখবার জন্যেই বোধহয় দাঁত খিচিয়ে আমাকে ধমক দিলে একটা: 'এটা একটা রাক্ষস! রাত দিন কেবল খাই-খাই!'

বিন্দেবনকে যতটা খারাপ লোক ভেবেছিলুম দেখলুম সে তা নয়। মিট-মিট করে হেসে বললে, 'তা ছেলেমানুষ, খিদে তো পেতেই পারে। খাওয়াব—খাওয়াব খোকাবাবু—মেচেদার সিঙাড়া খাওয়াব, কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। তারপর কলেজের ছেলে হয়েও তোমরা যখন আমাদের দলে এয়েচ, তখন তো মাথার মণি করে রাখব তোমাদের!'

'দলে এয়েচ!' এই কথাটাই আমার কেমন ভাল লাগল না। মনে পড়ল মা নেংটীশ্বরীর সে মূর্তি—যেন দাঁত বের করে কামড়াতে আসছে! মনে পড়ল হঠাৎ সেই 'ম্যাও-ম্যাও' এসে হাজির—চারদিকে কি রকম সামাল-সামাল রব। এদের পাল্লায় পড়ে কোথায় চলেছি আমরা? কী আছে আমাদের কপালে?

টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম। হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রয়েছে। বীরচক্র পাবার জন্যে তখন খুব লাফালাফি করেছিল বটে, কিন্তু এখন যেন কেমন ভেবড়ে গেছে বলে মনে হল। হাবুলকে বোধহয় গাড়ির বেঞ্চিতে ছাড়পোকায় কামড়াচ্ছিল—সেই বিক্রমসিংহই কি না কে জানে—সে কিছুক্ষণ পা-টা চুলকে হঠাৎ বিচ্ছিরি গলায় গান ধরল:

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—

সকল দেশের রানী'—ইয়ে—একবার খুব জোরে গা চুলকে প্রায় দাপিয়ে উঠল : ইস্—কী কামড়াচ্ছে রে।—'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি—'

তার গান আর গা চুলকোনোতে প্রায় ক্ষেপে গেল টেনিদা। চেঁচিয়ে বললে, 'জন্মভূমি না তোর মুণ্ডু! চুপ কর্ বলছি হাবলা, নইলে জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেবো তোকে।'

বিন্দেবন বললে, 'আহা দাদাবাবু তো ভালই গাইছেন। থামিয়ে দিচ্ছেন কেন?'

তাহলে হাবুলের গানও কারুর ভাল লাগে! হাবুল এত আশ্চর্য হল যে গা চুলকোতে পর্যন্ত ভুলে গেল। ক্যাবলা একটা ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন পড়ছিল, সেটা খসে পড়ল হাত থেকে।

টেনিদা বললে, 'কী ভয়ানক!'

বিন্দাবন জানলার বাহিরে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'এই যে—কোলাঘাট এসে গিয়েছে। এর পরেই আমরা পৌঁছে যাব মেচেদায়।'

মেচেদায় সিঙাড়া-টিঙাড়া খেয়ে, সেখান থেকে বাসে করে তমলুক পৌঁছোনো গেল। সেখান থেকে আবার বাস বদলে মহিষাদল।

নাম শুনে যে-রকম ভয়-টয় ধরে যায়, গিয়ে দেখলুম আদৌ সেরকম নয়। বরং বেশ ছিমছাম জায়গাটা—দেখে-টেখে ভালই লাগে। খুব বড় একটা রাজার বাড়ি আছে, একটা উঁচু রথ আছে, বাজার আছে, অনেক লোকজন আছে। মানুষগুলোকেও তো বেশ সাদা-মাটা মনে হল, কোথাও যে কোন ঘোর-প্যাঁচ আছে সেটা বোঝা গেল না। আর একটা মোটে মোষ দেখতে পেলুম, একজন তার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, সে সুড়-সুড় করে চলে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে সে মোটেই গুঁতোতে চাইল না।

বিন্দেবন তিনটে রিকৃশা ডাকল। বললে, 'তাহলে চলুন, একেবারে মালখানাতেই যাওয়া যাক।'

টেনিদা বললে, 'মালখানা? সে আবার কোথায়?'

বিন্দেবন বললে, 'দেখা নেই তো সব। চন্দ্রকান্তদার সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে। তিনিই মালপত্তর সব দেখিয়ে দেবেন। তারপর কলকাতায় কোথায় আপনারা ডেলিভারি নেবেন, সে সবও ওখানেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'মালপত্তর!' আমি আর ক্যাবলা একটা রিকশায় চেপে বসেছিলুম। মালপত্তর শুনেই আমার কিরকম যেন বিচ্ছিরি লাগল, সেই শেয়ালপুকুরের কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল সেই ম্যাও-ম্যাও আসবার কথা। আমি ক্যাবলাকে চিমটি কাটলুম একটা।

ক্যাবলা আমাকে পালটা এমন আর-একটি চিমটি কাটল যে

আমি প্রায় চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিলুম। ক্যাবলা আমার কানে কানে বললে, 'এখন চুপ করে থাক্ না—গাধা কোথাকার!'

চিমটি আর গাধা শব্দটা এ অবস্থাতে আমাকে হজম করে নিতে হল—কী আর করা! সব ব্যাপারটাই এখন এমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে যে আমি গাধার মতোই চুপ করে বসে রইলুম। অবিশ্যি গাধা যে সব সময়ে চুপচাপ বসে থাকে তা নয়—মনে একটু ফুর্তি-টুর্তি হলেই বেশ দরাজ গলায় 'প্যাঁহোঁ হ্যাঁ হোঁ' বলে তারস্বরে গান গাইতে থাকে। আমার গলায় গান-টান শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু—

কিন্তু কুঁই-কুঁই করে কেমন একটা বেয়াড়া গানের আওয়াজ আসছে না? আসছেই তো। তাকিয়ে দেখলুম, সামনের রিকশাতে বসে গান ধরেছে তাল-ঢ্যাঙা বিন্দেবন।

'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল—'

এ যে দেখছি গানের একেবারে গন্ধর্ব! আমার চাইতেও সরেশ, হাবলার ওপরেও এক-কাঠি! এমন ভাল গানটারই বারোটা বাজিয়ে দিলে! তাছাড়া এমন সকালের রোদ্দুরে চাঁদের আলোই বা পেল কোত্থেকে! সেই চাঁদের আলোয় বিন্দেবন আবার মরতেও চাইছে! তা নিতান্তই যদি মরতেই চায়, তাহলে নয় মারাই যাক, আমরাও ওর জন্যে শোক-সভা করতে রাজি আছি, কিন্তু সেজন্যে অমন চামচিকের মতো গলায় গান গাইবার মানে কী? নিজে এমন গাইয়ে বলেই বোধহয় সে হাবলার গানের তারিফ করছিল।

রিকশা বেশ ঠুনঠুন করে নিরিবিলি রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিল। দু-দিকে বাড়ি-টাড়ি আছে, গাছপালা মাঠ এইসব আছে, ভারি সুন্দর হাওয়া দিয়েছে, আকাশটা যেন নীল চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে,

এদিকে আবার একটা খালের জল রোদে ঝিলমিল করে উঠছে। বিন্দেবনের মনে ফুর্তি হতেই পারে, কিন্তু তাই বলে—

আমি আর থাকতে পারলুম না। ক্যাবলাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'চামচিকের গান শুনেছিস কখনো!'

ক্যাবলা বললে, 'না।'

'তাহলে ওই শোন্। বিন্দেবন গান গাইছে।'

ক্যাবলা বললে, 'চামচিকে তো তবু ভাল। তুই গান গাইলে তো মনে হয় যেন হাঁড়িচাঁচা ডাকছে! এখন আর ইয়ার্কি করিসনে প্যালা—অবস্থা খুব সঙিন! আমরা দারুণ বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি!'

দারুণ বিপদ! শুনেই আমি খাবি খেলুম। বিন্দেবনের গান শুনে, সবুজ মাঠ, নীল আকাশ আর ঝিরঝিরে হাওয়ার ভেতরে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ক্যাবলা আমাকে এমন দমিয়ে দিল যে বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

চিঁ চিঁ করে বললুম, 'কী বিপদ?'

'একটু পরেই জানতে পারবি।'

'তাহলে আমরা রিকশা চেপে কেন যাচ্ছি বিন্দেবনের সঙ্গে? নেমে পড়ে সোজা চম্পট দিলেই তো পারি! ইচ্ছে করে কেন পা বাড়াচ্ছি বিপদের ভেতরে?'

ক্যাবলা আরো গম্ভীরভাবে বললে, 'আর ফেরবার পথ নেই, এখন একটা এস্‌পার-ওস্‌পার হয়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু ওস্‌পার করে কী লাভ? এস্‌পারে থাকলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

'তা যায়। কিন্তু কম্বলকে তাহলে পাওয়া যাবে কী করে?'

ঠিক কথা। ওই লক্ষ্মীছাড়া কম্বল। যত গণ্ডগোল ওকে নিয়েই। মাস্টারের ভয়ে পালালি তো পালালি—আবার বিটকেল

একটা ছড়া লিখে গেলি কী জন্যে ? চাঁদে গেছে না হাতি ! সেই যে কারা সব নরমাংস খায়, তাদের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে, আর তারা কম্বলকে দিয়ে অম্বল রেঁধে খেয়ে বসে আছে !

কিন্তু কম্বলকে কি কেউ খেয়েও হজম করতে পারবে ? আমার সন্দেহ হল। ও ঠিক বাতাপি কিংবা ইল্বলের মতো তাদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। যেদিন কম্বল কোত্থেকে ছুটো গুবরে পোকা এনে আমার শার্টের পকেটে ছেড়ে দিয়েছিল, সেদিন থেকেই ওকে আমি চিনে গেছি !

এইসব ভাবছি, হঠাৎ ক্যাবলা আমার কানে কানে বললে, 'প্যালা !'

আমি দারুণ চমকে গিয়ে বললুম, 'আবার কী হল ?'

'এই যে খালের ধার দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এ দেখে কিছু মনে হচ্ছে না তোর ?'

'কী আবার মনে হবে ?'

ক্যাবলা আরো ফিসফিস করে বললে, 'আভিতক্ তুম্ নেহি সম্‌ঝা ? আরে—সেই যে ছড়াটা—ছল-ছল খালের জল—

ঠিক, ঠিক ! 'নিরাকার মোষের দল'—মানে 'মোষ-টোষ' বিশেষ কিছু নেই অথচ 'মহিষাদল' আছে, আর দেখতেই 'ছল ছল'—আরে, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে যে !

ক্যাবলা মিট-মিট করে হেসে বললে, 'কী বুঝছিস ?'

'কিছুই না।'

'তোর মাথা তো নয়, যেন একটা খাজা কাঁটাল !' চশমাপরা নাকটাকে কুঁচকে, মুখখানাকে স্রেফ আমড়ার চাটনির মতো করে ক্যাবলা বললে, 'এটাও বুঝতে পারছিস না ? এবার রহস্য প্রায় ভেদ হয়ে এল।'

'কিন্তু ভেদ করবার পরে আমাদের অবস্থা কী হবে? আমাদের শুদ্ধ ভেদ করে দেবে না তো?'

'দেখাই যাক! আগেই ঘাবড়াচ্ছিস কেন?'

বলতে বলতে রিকশা থেমে গেল। সামনেই একটা হলদে দোতলা বাড়ি। তার নাম লেখা আছে বড়ো বড়ো হরফে: 'চন্দ্র-নিকেতন।'

রিকশা থেকে নেমে বিন্দেবন ডাকতে লাগল: 'আসুন দাদাবাবুরা, নেমে আসুন। এই বাড়ি।'

'ক্যাবলা আবার আমার কানে কানে বললে, 'এইবারে শেষ খেল্—বুঝেছিস? বাড়ির নাম চন্দ্র-ভবন—অর্থাৎ কিনা—চাঁদে চড়্—চাঁদে চড়্! এইটেই তাহলে শ্রীকম্বলের সেই চাঁদ!'

কম্বলের চাঁদ! এইখানে? আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ক্যাবলা বললে, 'বোকার মতো বসে আছিস কী? টেনিদা, হাবলা আর বিন্দেবন যে ভেতরে চলে গেল! নেবে আয়—নেবে আয়—'

ওদিক থেকে বিন্দেবনের হাঁক শোনা গেল: 'অ রিকশোওলারা —একটু দেঁইড়ো যাও, আমি এক্ষুনি তোমাদের পয়সা এনে দিচ্চি।'

বিন্দেবন একটা মস্ত ঘরের ভেতর আমাদের নিয়ে বসালো।

ঘরের আধখানা জুড়ে ফরাস পাতা—তার ওপর সাদা চাদর বিছানো। বাকি আধখানায় মস্ত একটা দাঁড়ি-পাল্লা আর কতগুলো কিসের বস্তা যেন সাজানো রয়েছে। একটা ছোট্ট কুলুংগিতে সিঁদুর-মাখানো গণেশের মূর্তি। দেওয়ালে একটা রঙিন ক্যালেণ্ডার রয়েছে—তাতে লেখা আছে, 'বিখ্যাত মশলার দোকান—শ্রীরামধন খাঁড়া, খড়্গাপুর বাজার, মেদিনীপুর।' দেওয়ালে আবার দু-তিন জায়গায় সিঁদুর দিয়ে লেখা রয়েছে, 'জয় মা!' মা যে কে ঠিক বুঝতে পারলুম না, বোধ হল নেংটীশ্বরীই হবেন। কিন্তু এ-সব

'জয় মা' আর খাঁড়া-টাঁড়া আমার একদম ভাল লাগল না, বুকের ভেতরটায় কি রকম ছাঁৎ করে উঠল, একেবারে পাঁঠা-বলির কথা মনে পড়ে গেল।

আমরা চারজনে বসে আছি। ক্যাবলা গম্ভীর, টেনিদা মিট-মিট করে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক, হাবুল একমনে পা চুলকোচ্ছে—বোধহয় ট্রেনের ছারপোকাগুলো এখনো ঢুকে আছে ওর জামা-কাপড়ের তলায়। আমি ভাবছি, ওই খাঁড়া-টাঁড়া দিয়ে ওরা 'জয় মা' বলে কম্বলকে বলি দিয়েছে কি না, এমন সময়—

দু-জন লোক ঘরে এল। বেশ ভালমানুষের মতোই তাদের চেহারা, তার চাইতেও ভাল তাদের হাতের প্লেটগুলো। আমাদের সামনে প্লেট নামিয়ে দিয়ে বললে, 'একটু জলযোগ করুন বাবুরা, কত্তা এখুনি আসচেন।'

মেচেদার সিঙাড়া এর মধ্যেই কখন তলিয়ে গিয়েছিল, আমরা খুশি হয়েই কাজে লেগে গেলুম। প্লেটে তিন-চার রকমের মিষ্টি, কাজুবাদাম, কলা। মোতিচুরের লাড্ডুতে কামড় দিয়েই আবার আমার মনটা ছটফটিয়ে উঠল। বলির পাঁঠাকেও তো বেশ করে কাঁটাল-পাতা-টাতা খাওয়ায়। এরাও কি—

আমি বললুম, 'ক্যাবলা—এরা—'

ক্যাবলা কেবল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে, 'চুপ।'

এর মধ্যেই দেখলুম টেনিদা হাবুলের প্লেটের থেকে কি একটা খপ করে তুলে নিলে। আর তুলেই গালে পুরল। হাবুল চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কি যেন বলতেও চাইল, সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথায় বাঁ-হাত দিয়ে ছোট্ট একটা গাঁট্টা মারল টেনিদা।

'যা-যা, ছেলেমানুষের বেশি খেতে নেই। অসুখ করে।'

একটা শান্তিভঙ্গ ঘটতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল বিন্দেবন। আর পেছনে যিনি ঢুকলেন—

বলবার দরকার ছিল না, তিনি কে। তাঁর নাকের দিকে তাকিয়েই আমরা বুঝতে পারলুম। আমাদের টেনিদার নাক চেয়ে দেখবার মতো—আমরা সেটাকে মৈনাক বলে থাকি, কিন্তু এর নাকের সামনে কে দাঁড়ায়! প্রায় আধ হাতটাক লম্বা হবে মনে হল আমার—এ নাক দিয়ে দস্তুরমতো লোককে গুঁতিয়ে দেওয়া চলে।

আধ-বুড়ো লোকটি চকচকে টাক আর কাঁচা-পাকা গোঁফ নিয়ে এক-গাল হাসল। সে হাসিতে নাকটা পর্যন্ত যেন জ্বল-জ্বল করে উঠল তার। বললে, 'দাদাবাবুরা দয়া করে আমার বাড়িতে এয়েচেন, বড্ড আনন্দ হল আমার। অধমের নাম হচ্ছে চন্দ্রকান্ত চাঁই—এঁরা আদর করে আমায় নাকেশ্বর বলেন।'

টেনিদা আবার কি একটা হাবুলের প্লেট থেকে তুলে নিয়ে গালে চালান করল। তারপর ভরাট মুখে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদেরও ভারি আনন্দ হল।'

চন্দ্রকান্ত ফরাসে বসে পড়ে বললে, 'অল্প বয়সেই আপনারা ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েচেন। এ ভারি সুখের কথা। দিনকাল তো দেখতেই পাচ্ছেন। চাকরি-বাকরিতে আর কিচ্ছু নেই, একেবারে সব ফক্কা! এখন এইসব করেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিটকেলানন্দ গুরুজী সেইজন্যেই আমাদের মন্তর দিয়েচেন: "ধনদাত্রী মা নেংটীশ্বরী, তোমারই ল্যাজ পাকড়ে ধরি।" আহা!'

শুনেই বিন্দেবনের চোখ বুজে এল। সেও বললে, 'আহা-হা!'

চন্দ্রকান্ত বলে চলল, 'মা নেংটীশ্বরীর অপার দয়া, যে আপনারা এই বয়সেই মা-র ল্যাজে আশ্রয় পেলেন! জয় মা!'

বিন্দেবনও সঙ্গে-সঙ্গেই বলে উঠল: 'জয় মা!' তাই দেখে আমরা চারজনও বললুম, 'জয় মা!'

আমরা তিনজন ভালোই খেয়ে নিয়েছিলুম এর ভেতর—কেবল হাবুল সেন হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে ছিল।

টেনিদা খেয়ে-দেয়ে খুশি হয়ে বললে, 'আপনাদের এখানে তো বেশ ভাল মিঠাই পাওয়া যায় দেখছি! মানে কলকাতায় আমরা তো বিশেষ পাই-টাই না—মানে ছানা-টানা বন্ধ—'

চন্দ্রকান্ত বললে, 'বিলক্ষণ! আমাদের এখানকার মিষ্টি তো নাম-করা। আরো কিছু আনাব?'

টেনিদা ভদ্রতা করে বললে, 'না—মানে ইয়ে—এই হাবুল একটা চমচম খেতে চাইছিল—'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়!' চন্দ্রকান্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ডাকল: 'ওরে বিধু, আরো ক'টা চমচম নিয়ে আয়। চমচম আন তো, কিন্তু তার আগে আরো কিছু এনো।'

'চন্দরদা, এত আদর করে খাওয়াচ্ছ কাকে?' বাজখাঁই গলায় সাড়া দিয়ে আর একটি লোক ঘরে ঢুকল। হাতকাটা গেঞ্জির নিচে তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ডুমো ডুমো হাতের মাস্‌ল্‌, ছাঁটা-ছাঁটা চুল, করমচার মতো টকটকে লাল তার চোখের দৃষ্টি।

চন্দ্রকান্ত বললে, 'এঁরা কলকাতা থেকে এয়েচেন— ছড়া বলেচেন —আমাদের হেড আপিসে গিয়েচেন'—

সেই প্রকাণ্ড জোয়ান লোকটা হঠাৎ ঘর ফাটিয়ে একটা হুঙ্কার করল। বললে, 'চন্দরদা, সর্বনাশ হয়েছে! এরা শত্রু!'

আমরা যত চমকালুম, তার চেয়েও বেশি চমকালো চন্দ্রকান্ত আর বিন্দেবন।

'শত্রু!'

'আলবাৎ!'—দাঁতে দাঁতে কিশ-কিশ করতে করতে একটা রাক্ষসের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল জোয়ানটা: ,আমি খগেন মাশ্চটক—আমার সঙ্গে চালাকি! এরা সেই

পটলডাঙার চারজন—চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে থাকে, আমার সেই বিচ্ছু ছাত্র কম্বলকে এদের পিছে-পিছেই আমি ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি!'—করমচার মতো চোখদুটোকে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে খগেন মাশ্চটক বললে, 'এত বড় এদের সাহস যে আজ একেবারে বাঘের গর্তে এসে মাথা গলিয়েছে! আজ যদি আমি এদের পিটিয়ে মোগলাই পরোটা না করে দিই, তাহলে আমি মিথ্যেই স্বামী বিট্‌কেলানন্দের চ্যালা!'

এগারো

একেই বলে আসল পরিস্থিতি—টেনিদার ভাষায় বলা যায়—'পুঁদিচ্চেরি!'

ঘরের ভিতরে বাজ পড়েছে—এইরকম মনে হল। চন্দ্রকান্ত আর বিন্দেবন হাঁউমাউ করে উঠল, আমরা চারজন একেবারে চারটে জিভেগজার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলুম। আর পাকা করমচার মতো ক্ষুদে-ক্ষুদে লাল চোখদুটোকে বন-বন করে ঘোরাতে ঘোরাতে ক্ষ্যাপা মোষের মতো চেঁচাতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর জোয়ান খগেন মাশ্চটক।

আর এতক্ষণে আমার মনে হল, এই মোষের মতো খগেনটা আছে বলেই জায়গাটা বোধহয় নাম হয়েছে মহিষাদল। সেইসঙ্গে আরো মনে পড়ল আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কেন যেন খামোখাই আমার বাঁ কানটা কটকট করছিল। তখনই বোঝা উচিত ছিল, আজ একটা যাচ্ছেতাই রকমের কিছু ঘটে যাবে।

আমরা পটলডাঙার চারজন—বিপদে পড়বে কি আর ভয়-টয় পাই না? আমি যখন আগে ছোট ছিলুম, পেট-ভর্তি পিলে নিয়ে প্রায়ই জ্বরে পড়তুম, তখন রাত্তিরে—জানলার বাইরে একটা হুতুম প্যাঁচা হুমহাম করে ডেকে উঠলেও ভয়ে আমার দম আটকে যেত। তারপর বড় হলুম, দু-একটা ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চারও জুটে গেল বরাতে। তখন দেখতে পেলুম, বিপদে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো বেকুবি আর কিছুই নেই। তাতে বিপদ কমে না—বরং বেড়েই যায়। তার চাইতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হয়, এখন কী করা যায়—কী

করলে সবচাইতে ভাল হয়। তাছাড়া আরো দেখছি—যারা আগ বাড়িয়ে ভয় দেখাতে আসে, তারা নিজেরাই মনে মনে ভীরু। পিঠ সোজা করে, বুক টান করে—মনে জোর নিয়ে রুখে দাঁড়ালে তারাই অনেক সময় পালাতে পথ পায় না।

আমি দলের তিনজনের দিকে চেয়ে দেখলুম। আমার বুকটা একটু দুর-দুর করছিল—হাবুল পা চুলকোতে চুলকোতে আমার কানে কানে ফিস-ফিস করে বললে, 'এখন একটা মজা করব, চুপ কইর‍্যা বইস্যা থাক্।' ক্যাবলার হাতে একটা ঘড়ি ছিল, সে বার-বার তাকাচ্ছিল তার দিকে। আর আমাদের টেনিদা—বিপদ এলেই সে সঙ্গে সঙ্গে লীডার হয়ে যাবে—আমি দেখলুম, সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে খগেনের দিকে, আর একটু-একটু করে শার্টের আস্তিন তুলছে ওপর দিকে।

তখন আমার মনে পড়ল—টেনিদা বক্সিং জানে, 'জুডো', মানে জাপানী কুস্তিটাও সে শিখে নিয়েছিল গত বছর। তক্ষুনি আমার বুকের ধুকধুকুনি থেমে গেল খানিকটা। বুঝতে পারলুম, খগেন মাশ্চটক যত সহজে আমাদের পিটিয়ে পরোটা করতে চাইছে, ব্যাপারটা অত সোজা হবে না। আর যদি টেনিদা একা ওকে সামাল দিতে না পারে—আমরা তিনজন তো আছি, একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব খগেনের ওপর। যদি কিছু অঘটন ঘটেই যায়—ও ঐ মোষের মতো খগেনটার ঘুসি-টুসি খেয়ে—আমি, রোগা পটকা প্যালারাম যদি বেমক্কা মারাই যাই, তাবেই বা কী আসে যায়! একবার বই তো দু-বার মরব না! ভয় পেয়ে পেয়ে—কেঁচোর অধম হয়ে মাটিতে মুখ লুকিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে একেবারে মরে যাওয়া ঢের ভাল।

আমি বুঝতে পারছিলুম—আমরা বাঘের গর্তে পা-ই দিই আর যাই করি, আমাদের চাইতেও ঢের বেশি ঘাবড়েছে বিন্দেবন-

চন্দ্রকান্তের দলবল! খগেন লম্ফ-ঝম্প করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল—চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরই হাত বাড়িয়ে তাকে আটকে দিলে।

'আহা-হা, আগে থেকেই অমন মার-মার করছ কেন হে খগেন? এঁয়ারা তো দেখছি ভদ্দর লোকের ছেলে সব—শত্তুর হতে যাবেন কী করে? বিত্তেন্তটা একবার খোলসা করে বলো দিকি!'

'বৃত্তান্ত আমার মাথা আর মুণ্ডু!'—খগেন গাঁ গাঁ করে উঠল—'কলকাতায় আমি একটা বিচ্ছু ছেলেকে পড়াতে গিয়েছিলুম একদিন—তার নাম কম্বল। অমন হতচ্ছাড়া উন্‌পাঁজুরে ছেলে দুনিয়ায় আর দুটো হয় না। গিয়ে তাকে পাঁচটা শক্ত-শক্ত অঙ্ক কষতে দিয়ে বললুম, এগুলো চট্‌পট্ করে ফ্যাল্—কাল সারা রাত পাড়ার জলসায় গান শুনে আমার গা ম্যাজ-ম্যাজ করছে, আমি আধ ঘণ্টা ঝিমিয়ে নিই। ঘুম ভেঙে যদি দেখি অঙ্ক হয়নি, তাহলে একটি কিলে তোকে একটা কোলা ব্যাঙ বানিয়ে দেব। বলেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হয়ে গেল। জেগে দেখি, ঘরে কম্বল নেই, একটা অঙ্কও সে কষে নি। উঠে খুব হাঁক-ডাক করতে তার কাকা এসে বললে, কম্বলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তোমাকে দেখেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

আমরা কান খাড়া করে শুনতে লাগলুম।

বিন্দেবন বললে, 'তাপ্পর?'

'তারপর আমার পকেটে হাত দিয়েই বুঝতে পারলুম, হতভাগা ছেলে আমার পকেট হাঁটকেছে। একটা কমলানেবু রেখেছিলুম খাব বলে—সেটা নেই, তার বদলে কাগজে মোড়া দুটো আরশোলা। আর সাঙ্কেতিক কবিতা লেখা আমাদের কাগজটা, তাতে কালির দাগ-টাগ লাগা—নিশ্চয় কিছু করেছে সেটা নিয়ে। এখন বুঝতে পারছি, ছড়াটা নকল করে সে এদের হাতে দিয়েছে, আর এরা তাই থেকে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছে এখানে!'

আমরা চারজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

'কিন্তু এঁয়ারা যে বললেন রসিদ-টসিদ—'

'একদম বাজে কথা, এরা রসিদ কোথায় পাবে? এ চারটেকে আমি পটলডাঙায় চাটুজ্জেদের রকে বসে অনেকদিন পকৌড়ি-ডালমুট খেতে দেখেছি। আর কম্বলটাও এদের পেছনে প্রায় ঘুর-ঘুর করত। চন্দরদা, আর দেরি নয়, তুমি পারমিশন দাও—আমি আগে এদের আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে নিই। তারপরে—হাতের সুখ হয়ে গেলে পোড়ো বাড়িটার ঠাণ্ডি গারদে সাতদিন আটকে রাখা যাক, কাঁকড়া বিছে আর চামচিকের সঙ্গে ক-দিন কাটাক—ব্যাস, দুরস্ত হয়ে যাবে। এর মধ্যে এখানকার মালপত্তর সরিয়ে দাও—শেয়ালপুকুরের আস্তানায় খবর পাঠাও।'

চন্দ্রকান্ত তার প্রকাণ্ড নাকটা চুলকে বললে, 'কিন্তুক খগেন—'

' "কিন্তু" পরে হবে, আগে আমি এদের দেখছি—'

যমদূতের মতো এগিয়ে এল খগেন। বিন্দেবন বললে, 'ওরে তোরা সব দেখছিস কী—দরজা-টরজাগুলো বন্ধ করে দে—'

অর্থাৎ খাঁচায় বন্ধ করে ইঁদুর মারবার বন্দোবস্ত।

আর তক্ষুনি দাঁড়িয়ে উঠল টেনিদা। ঘর কাঁপিয়ে সিংহনাদ ছাড়ল : 'বুঝে-সুঝে গায়ে হাত দেবেন মশাই, নইলে—'

'ওরে, এ যে বুলি পড়ছে!'—খগেন মাস্টারের দাঁত কিচ্-কিচ্ করে উঠল : 'তাহলে এইটেকেই আগে মেরামত করি। বাকিগুলো তো ছারপোকা, এক-একটা টিপুনি দিয়েই ম্যানেজ করে ফেলব।'

বলেই, খগেন টেনিদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই লম্বা ঘরটার ভেতরে—যেখানে দেওয়াল ভর্তি করে 'জয় মা' আর 'খাঁড়া-টাঁড়া' এইসব লেখা রয়েছে, দেখতে দেখতে তার ভেতরে যেন ভীম আর জরাসন্ধের যুদ্ধ বেধে গেল। আমরা সরে এলুম দেওয়ালের একদিকে—বিন্দেবনের দল আর এক দিকে। খগেন

টেনিদাকে জাপটে ধরতে গিয়েও পারল না—বক্সিংয়ের সাইড্‌ স্টেপিং করে সে চট করে সরে গেল একদিকে, আর দু-হাতে খানিক বাতাস জাপটে ধরে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে গেল খগেন।

টেনিদা ঠাট্টা করে বললে, 'আহা মাশ্চটক মশাই, ফসকে গেল বুঝি?'

রাগে খগেনের মুখটা নিটোল একটা খাজা কাঁটালের মতো হয়ে গেল। লাল করমচার মতো চোখদুটোকে ঘোরাতে ঘোরাতে খগেন বললে, 'অ্যাঁ আবার এয়ার্কি হচ্ছে! আমি খগেন মাশ্চটক—আমার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি! আমি যদি এক্ষুনি তোকে চটকে আলুসেদ্ধ বানিয়ে না দিই তো—'

খগেন আবার ঝাঁপ মারল।

আর তক্ষুনি বোঝা গেল টেনিদা কী, আর আমরাই বা তাকে লীডার বলে মেনে নিয়েছি কেন। এবার খগেন টেনিদাকে চেপে ধরল আর ধরার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ইলেকট্রিক কারেন্টের শক্‌ খেল একটা। জাপানী জুডোর একটি মোক্ষম প্যাঁচে দড়াম করে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল খগেন—চিৎপটাং। আর তার গলা দিয়ে বেরুল বিটকেল এক আওয়াজ: 'গাং!'

ঘরশুদ্ধ লোক একদম চুপ! চন্দ্রকান্ত, বিন্দেবন, দুটো চাকর—চোখ কপালে তুলে পাথর হয়ে রইল। টেনিদা বললে, 'কী মাশ্চটক মশাই, আমাকে মেরামত করবেন না?'

খগেন মাশ্চটক একবার ওঠবার চেষ্টা করেই আবার ধপাৎ করে শুয়ে পড়ল। কেবল বললে, 'গাং—ওফ্‌-ফ্‌!'

হঠাৎ বিন্দেবন লাফিয়ে উঠল: 'চন্দরদা—দেখচ কী? এরা ক্ষুদে ডাকাতের দল! খগেনের মতো অত বড়ো লাশকেও অমন করে শুইয়ে দিলে! আমি দলের আরো লোকজন ডাকি—সবাই মিলে এদের—'

টেনিদা আস্তিন গুটিয়ে বললে, 'কাম অন—'

সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে নিলুম লীডারের পাশে। বললুম, 'কাম অন—কাম অন—'

হাবুল আমার কানে কানে আবার বললে,—'অখন আরো মজা হইবো!'

ঠিক তখন—

ঠিক তখন বন্ধ দরজার গায়ে ঝন-ঝন করে ঘা পড়ল। কে যেন মোটা গলায় ডাক দিয়ে বললে, 'পুলিশ—শিগগির দরজা খোল—'

বারো

চাঁদ-চাঁদনির রহস্য তো বোঝা গেল। আসলে চোরা কারবারীর এক বিরাট দল—ওই ছড়াই হল ওদের সাংকেতিক বাক্য। ছড়া বলতে পারলে আর চক্রধর সামন্তের দোকানে একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই ওরা তাকে চিনে নেবে নিজের লোক বলে। তারপরে সব এক সুতোয় গাঁথা। শেয়ালপুকুরের বাড়ি, গুরু বিটকেলানন্দ, দেবী নেংটীশ্বরী—সব জলের মতো সোজা। ম্যাও-ম্যাও যে কেন ওখানে হানা দেয়, কেন ঝোল্লা গোঁফ আর আব নিয়ে চক্রধর কম্বলের তলায় শুয়ে পড়ে—সব পরিষ্কার। তারপর ছল-ছল খালের জল, নিরাকার মোষের দল থেকে একবারে মহিষাদল —একদম আদত ঘাঁটিতে।

সব রহস্যের সমাধান। জিওমেট্রিতে যাকে-বলে 'কিউ-ই-ডি'—অর্থাৎ কিনা—'ইহাই উপপাদ্য বিষয়।'

ক্যাবলা আগে থেকেই হুঁশিয়ার। তার যে মামা পুলিশে চাকরি করে, গোড়াগুড়িই তাঁকে সব খবর সে জুগিয়ে যাচ্ছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন, 'হুঁ, বদমায়েসদের একটা গ্যাঙ আছে মনে হচ্ছে। এবার ধরে ফেলব। তোরা চালিয়ে যা ওদের সঙ্গে। আমি পেছনে লোক রাখব। তাছাড়া মহিষাদলেও পুলিশকে খবর দিয়ে রাখছি।'

এমনকি পাঁশকুড়ো লোক্যালে, ঠিক আমাদের পাশের কামরায় বসে বৈরাগী বৈরাগী চেহারার যে ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে ট্রেনের বাইরে গলা বাড়িয়ে গেয়ে উঠছিলেন : 'হরিনাম বলো রে, নিতাই-গৌর ভজ রে'—তিনি নাকি আমাদের ওয়াচ করছিলেন। 'চন্দ্র-

ভবন' পর্যন্ত দূর থেকে আমাদের ফলো করেছিলেন এবং চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের ঘরে যখন টেনিদা খগেন মাশ্চটককে কীচক বধ করে ফেলেছে, তখন তিনিই থানা থেকে পুলিশ নিয়ে চলে এসেছিলেন।

পুলিশের লোকেরা ওদের তো দল-টল শুদ্ধ ধরে ফেলল, তারপর চন্দ্রকান্তের বাড়ি থেকে অনেক রকম কি-সব লুকোনো জিনিস-টিনিসও পেলো: আর আমাদের কী বলল? সে-সব শুনলে তোমাদের হিংসে হবে। আমরা তো লজ্জায় কান-টান লাল করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর পুলিশের দারোগা টেনিদার হাত-টাত ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তুমি তো দেখছি ছোকরা রীতিমত গ্রেট-ম্যান। অত বড়ো একটা তিন-মনী জোয়ানকে তক্তাপাট করে দিলে—অ্যাঁ। তোমরাই হচ্ছ দেশের গৌরব—তোমাদের মতো ছেলেই আমাদের এখন দরকার।'

শুনে টেনিদার মৈনাকের মতো উঁচু নাকটা বিনয়ে কি রকম যেন ছোট একটা সিঙাড়ার মতো হয়ে গেল। আমার কানে কানে বললে, 'জানিস প্যালা—খগেন মাশ্চটককে জুডোর প্যাঁচ কষিয়ে কি রকম খিদে পেয়ে গেল। পেটের ভেতরে চুঁই-চুঁই করছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'খিদে পেল? এক্ষুনি এতগুলো খেয়ে—'

'দারোগা শুনতে পেলেন। আমাকে আর কথাই বলতে দিলেন না। বললেন, 'খিদে পেয়েছে? বিলক্ষণ। এই রামভজন—জলদি রসগোল্লা-সন্দেশ-মোতিচুর-সিঙাড়া—বাজারসে যো মিলেগা—ঝুড়ি ভর্তি করকে লে আও।'

সবই তো হল। চোরাকারবারীরা তো ধরা পড়ল—অবকাশ-রঞ্জিনী আর বিক্রম সিংহও ওদের সঙ্গে হাজতে গেল কি না কে জানে! কিন্তু আসল গণ্ডগোল রয়েই গেল।

কম্বল এখনো নিরুদ্দেশ। তার টিকিরও তো খবর পাওয়া গেল

না। সে কি সত্যিসত্যিই চাঁদে চলে গেল নাকি? ওর কাকা তো গোড়াতেই বলেছিলেন—কম্বলের চাঁদে চলে যাওয়ার একটা স্কোপ আছে।

আমরা চোরাকারবারী ধরতে চাই নি, কম্বলকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। তার পাত্তাই পাওয়া গেল না। তার মানে, আমাদের অভিযান এ-যাত্রা ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন আমরা কী বলব বদ্রীবাবুকে, কী করে মুখ দেখাবো তাঁর কাছে?

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি, টেনিদা আর হাবুল এই নিয়ে গবেষণা করছিলুম। তাহলে কি আবার নতুন করে খোঁজা আরম্ভ করতে হবে? একটা ক্লু-টুলু তো চাই!

টেনিদা দাঁত কিড়মিড় করে বললে, 'পেতেই হবে হতচ্ছাড়াকে! তারপরে যদি কম্বলকে পিটিয়ে কার্পেট না বানিয়েছি, তাহলে আমার নাম টেনি শর্মাই নয়!'

হাবুল বললে, 'ছাড়ান দাও! অমন পোলার নিরুদ্দেশ থাকনই ভাল। পোলা তো না—য্যান অ্যাক্‌খান ভাউয়া ব্যাঙ!'

টেনিদা হাবুলের দিকে তাকালো: 'ভাউয়া ব্যাঙ কাকে বলে?'

'ভাউয়া ব্যাঙ কয় ভাউয়া ব্যাঙরে।'

'শাটাপ!'—বিচ্ছিরি মুখ করে টেনিদা বললে, 'ইদিকে নানান ভাবনায় মরে যাচ্ছি, এর মধ্যে উনি আবার এলেন মশকরা করতে! ফের যদি কুরুবকের মতো বকবক করবি, তাহলে এক থাপ্পড়ে তোর গাল'—

আমি জুড়ে দিলুম: 'গালুডিতে উড়িয়ে দেব!'

'বাঃ—এটা তো বেশ নতুন রকম বলেছিস!' বিরক্ত হতে গিয়েও টেনিদা খুশি হয়ে উঠল: 'এর আগে তো কখনো শুনিনি!'

'হুঁ হুঁ, আমি সব সময়েই ওরিজিন্যাল',—মাথা নেড়ে আমি বললুম।

'ওরিজিন্যাল তুই তো হবিই। তোর লম্বা লম্বা কান দুইখান দ্যাখলেই সেইডা বোঝন যায়'—হাবুল ফোড়ন কাটল।

'ওফ্!' টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : 'আমি মরছি নিজের জ্বালায়, এগুলোর বাজে বকুনিতে তো পাগল করে দিলে! এখন ওই কম্বলটাকে—'

বলতে বলতে আমাদের পেছনে এক রাম চিৎকার!

'কম্বল-সম্বল যথা দরবেশ কাঁপে চুপে-চুপে—'

আমরা ভীষণভাবে চমকে তাকিয়ে দেখি, ক্যাবলা। কচর-মচর করে পরমানন্দে কি চিবুচ্ছে।

টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে, 'খামোকা অমন করে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচালি যে ক্যাবলা?'

ক্যাবলা বললে, 'এমনি!'

'এমনি?'—ভেংচি কেটে টেনিদা বললে, 'একেবারে পিলেশুদ্ধ চমকে গেল! খাচ্ছিস কী?'

'কাজুবাদাম।'

হাত বাড়িয়ে টেনিদা বললে, 'আমায় ভাগ দে!'

'নেই, খেয়ে ফেলেছি।'

'খেয়ে ফেলেছিস?'—টেনিদা গজগজ করতে লাগল : 'এই-জন্যেই দেশের কিচ্ছু হয় না!'

হাবুল সেন বললে, 'হইবোও না। আমারেও দ্যায় নাই।'

টেনিদা হাবুলকে চড় মারতে গেল : 'এটা এমন বক্তিয়ার হয়েছে না—যে, কোন সিরিয়াস কথা এর জন্যে বলার জো নেই! ওয়েল ক্যাবলা—এখন কম্বলের কী করা যায় বল্ তো?'

ক্যাবলা বাদাম চিবুতে চিবুতে বললে, 'কিচ্ছুই করা যায় না। করার দরকার নেই।'

'মানে?'

'মানেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, এস। চল সবাই আমার সঙ্গে।'

বেশিদূর যেতে হল না। আমাদের পাড়াতেই একটুকরো পোড়ো জমি, কারা যেন বাড়ি-টাড়ি করছে। তিন-চারটে ছেলে সেখানে ইঁট পেতে একটা পুরোনো টেনিস বল নিয়ে ক্রিকেট খেলছে। তাদের একজনের মাথায় একটা ভাঙা শোলা হ্যাট, সে চিৎকার করে বল দিচ্ছিল—'এই সোবার্স বল দিচ্ছেন, এই ব্যারিংটন আউট হয়ে গেলেন,—

আমি, হাবুল আর টেনিদা চোখ গোল করে বললুম: 'ওই তো কম্বল!'

ক্যাবলা বললে, 'নির্ঘাত!'

আমি বললুম, 'ও এখানে কী করে এল?'

'তার মানে, ও কোথাও যায়নি। এখানেই ছিল।'

'এখানেই ছিল?'—টেনিদার মুখটা হালুয়ার মতো হয়ে গেল: 'তাহলে নিরুদ্দেশ হল কী করে? ওর কাকা যে বললেন, কম্বল নিশ্চয় চাঁদে চলে গেছে?'

ক্যাবলা বললে, 'চাঁদে ঠিক যায়নি, চাঁদের রাস্তায় খানিকটা গিয়েছিল।'

'চাঁদের রাস্তায়?'—হাবুল একটা হাঁ করল: 'রকেট পাইল কই?'

'রকেটের দরকার হয়নি।'—ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল: 'চিলে-কোঠার ঘরে লুকিয়ে ছিল দিন-কতক।'

'অ্যাঁ!'—আমরা তিনজনে খাবি খেলুম।

'হুঁ, সব খবরই আমি জোগাড় করে এনেছি। ওই দশাসই মাস্টার খগেন মাশ্চটকের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে কম্বলের কাকীমাই সে ব্যবস্থা করেছিলেন। কাকা তো বসে আছেন প্রেস নিয়ে, বাড়ির ভেতরে কতটুকু যান, কীই বা খবর রাখেন!

আমরা যখন কম্বলের খোঁজে চাঁদনি-ধোপাপুকুর মহিষাদল ছুটে বেড়াচ্ছি, তখন শ্রীকম্বল কাকিমার আদরে দিব্যি চিলেকোঠার ঘরে খেয়ে-দেয়ে মোটা হচ্ছেন। সেই প্রথম দিনে আমাদের দিকে কে পচা আম ছুড়েছিল—এবার বুঝতে পারছ টেনিদা?'

'বিলক্ষণ!' টেনিদা হুঙ্কার করল: 'ওই হতভাগাই চিলেকোঠা থেকে আমার নাকটাকে পচা আমের টার্গেট করেছিল!'

টেনিদার হুঙ্কারেই কি না কে জানে—কম্বল আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। আর তাকিয়েই বিকট ভেংচি কাটল একটা। স্বভাব যাবে কোথায়? এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ভাউয়া ব্যাঙ কাকে বলে! ভাউয়া ব্যাঙ না হলে অমন ভেংচি কেউ কাটতেই পারে না।

টেনিদা বললে, 'ধর্—ধর্ তো ওই কম্বলটাকে—'

কিন্তু কম্বলকে ধরে সাধ্য কার! সঙ্গে-সঙ্গে এক ছুট! কম্বল নয়—আরব্য উপন্যাসের সেই ম্যাজিক কার্পেটের মতোই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

টেনিদা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা।

'উফ্, বদ্রীবাবুর সেই খ্যাঁটটা! মাঠেই মারা গেল রে!'

'অ্যাকেবারে মারা যাইবো ক্যান? অ্যাকটা পচা আম তো পাইছ!'—সান্ত্বনার বাণী বেরুল হাবুলের গলা থেকে।
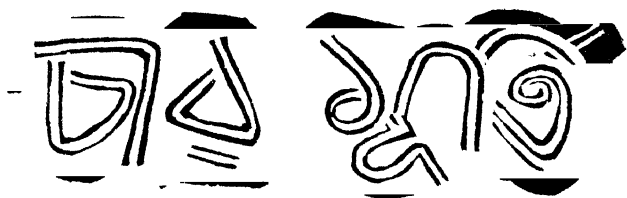
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৬৩
মার্চ, ১৯৫৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ
চৈত্র, ১৩৬৫
এপ্রিল, ১৯৫৯
তৃতীয় মুদ্রণ
পৌষ, ১৩৬৭
জানুয়ারি, ১৯৬১
চতুর্থ মুদ্রণ
শ্রাবণ, ১৩৭৩
জুলাই, ১৯৬৬
পঞ্চম মুদ্রণ
বৈশাখ, ১৩৭৬
এপ্রিল, ১৯৬৯
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ ও ছবি এঁকেছেন
শৈল চক্রবর্তী
৩.০০

শ্রদ্ধেয়

বিশু মুখোপাধ্যায়কে

যিনি ছোটদের জন্যে আমায় কলম ধরিয়েছিলেন

ছোটদের একটুখানি খুশি করবার খুশি নিয়ে 'চারমূর্তি' ধারাবাহিকভাবে 'শিশুসাথী'তে লিখেছিলাম। ছোটরা আশাতীতভাবে সাড়া দিয়েছে। সেই ভরসাতেই বইয়ের আকারে প্রকাশ করা গেল।

বইটিকে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে বের করবার জন্যে প্রকাশক বন্ধুবর অমিয়কুমার চক্রবর্তীকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৩

কলকাতা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

এক

মেসোমশায়ের অট্টহাসি

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

চাটুজ্জেদের রোয়াকে আমাদের আড্ডা জমেছে। আমরা তিনজন আছি। সভাপতি টেনিদা, হাবুল সেন, আর আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে—পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে সিঙিমাছের ঝোল খাই। আমাদের চতুর্থ সদস্য ক্যাবলা এখনো এসে পৌঁছয় নি।

চারজনে পরীক্ষা দিয়েছি। লেখাপড়ায় ক্যাবলা সবচেয়ে ভালো —হেডমাস্টার বলেছেন ও নাকি স্কলারশিপ পাবে। ঢাকাই বাঙাল হাবুল সেনটাও পেরিয়ে যাবে ফার্স্ট ডিভিশনে। আমি দু-বার অঙ্কের জন্যে ডিগবাজি খেয়েছি—এবার থার্ড ডিভিশনে পাশ করলেও করতে পারি। আর টেনিদা—

তার কথা না বলাই ভালো। সে ম্যাট্রিক দিয়েছে—কে জানে এনট্রান্সও দিয়েছে কি না। এখন স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে—এর পরে হয়তো হায়ার সেকেণ্ডারিও দেবে। স্কুলের ক্লাস টেন-এ সে একেবারে মনুমেন্ট হয়ে বসে আছে—তাকে সেখান থেকে টেনে এক ইঞ্চি নড়ায় সাধ্য কার!

টেনিদা বলে, হেঁ—হেঁ—বুঝলি নে? ক্লাসে দু-একজন পুরোনো লোক থাকা ভালো—মানে, সব জানে-টানে আর কি! নতুন ছোকরাদের একটু ম্যানেজ করা চাই তো!

তা নতুন ছেলেরা ম্যানেজ হচ্ছে বৈকি। এমনকি টেনিদার হঁদে বড়দা—যাঁর হাঁক শুনলে আমরা পালাতে পথ পাই না, তিনি-শুদ্ধু ম্যানেজ হয়ে এসেছেন বলতে গেলে। তিন-চার বছর আগেও টেনিদার ফেলের খবর এলে চেঁচিয়ে হাট বাধাতেন, আর টেনিদার

মগজে ক-আউন্স গোবর আছে তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। এখন তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। টেনিদার ফেল করাটা তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে হঠাৎ যদি পাশ করে ফেলে তাহলে সেইসঙ্গে তিনি একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়বেন।

অতএব নিশ্চিন্তে আড্ডা চলছে।

ওরই মধ্যে হতভাগা হাবুলটা একবার পরীক্ষার কথা তুলেছিল, টেনিদা নাক কুঁচকে বলেছিল, নেঃ—নেঃ—রেখে দে! পরীক্ষা-ফরীক্ষা সব জোচ্চুরি! কতগুলো গাধা ছেলে গাদা-গাদা বই মুখস্ত করে আর টকাটক পাশ করে যায়। পাশ না করতে পারাই সবচেয়ে শক্ত। ছ্যাখ না—বছরের পর বছর হলে গিয়ে বসছি, সব পেপারের অ্যানসার লিখছি—তবু ছ্যাখ, কেউ আমাকে পাশ করাতে পারছে না। সব এগজামিনারকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি! বুঝলি, আসল বাহাদুরি এখানেই!

আমি বললাম, যা বলেছ। এইজন্যেই তো দু-বছর তোমার শাকরেদি করছি। ছোটকাকা কানদুটো টেনে-টেনে প্রায় আধ হাত লম্বা করে দিয়েছে—তবু ইস্কুল কামড়ে ঠিক বসে আছি।

টেনিদা বললে, চুপ কর, মেলা বকিসনি! তোর ওপরে আমার আশা-ভরসা ছিল—ভেবেছিলুম, আমার মনের মতো শিষ্য হতে পারবি তুই। কিন্তু দেখছি তুইও এক-নম্বর বিশ্বাসঘাতক! কোন্ আক্কেলে অঙ্কের খাতায় ছত্রিশ নম্বর শুদ্ধ করে ফেললি? আর ফেললিই যদি, ঢ্যারা দিয়ে কেটে এলিনে কেন?

আমি ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, ভারি ভুল হয়ে গেছে!

টেনিদা বললে, দুনিয়াটাই নেমকহারাম! মরুক গে! কিন্তু এখন কী করা যায় বল দিকি? পরীক্ষার পরে স্রেফ কলকাতায় বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজব? একটু বেড়াতে-টেড়াতে না গেলে কি ভালো লাগে?

আমি খুশি হয়ে বললাম, বেশ তো চলো না। লিলুয়ায় আমার রাঙা-পিসিমার বাড়ি আছে—দুদিন সেখানে বেশ হৈ-হল্লা করে—

—থাম্ বলছি প্যালা—থামলি?—টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, যেমন তোর ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি ছাগলের মতো বুদ্ধি! লিলুয়া! আহা ভেবে-চিন্তে কী একখানা জায়গাই বের করলেন! তার চেয়ে হাতিবাগান বাজারে গেলে ক্ষতি কী! ছাতের ওপরে উঠে হাওয়া খেলেই বা ঠ্যাকাচ্ছে কে! যতসব পিলে রুগি নিয়ে পড়া গেছে, রামোঃ!

হাবুল সেন চিন্তা করে বললে, আর অ্যাকটা জায়গায় যাওন যায়। বর্ধমানে যাইবা? সেইখানে আমার বড়মামা হইল গিয়া পুলিশের ডি. এস. পি—

দু-দ্দুর! সেই ধ্যাড়ধেড়ে বর্ধমান!—টেনিদা নাক কোঁচকালোঃ ট্রেনে চেপেছিস কি রক্ষে নেই—বর্ধমানে যেতেই হবে। মানে, যে-গাড়িতেই চড়বি—ঠিক বর্ধমানে নিয়ে যাবে। সেই রেলের ঝক্-ঝক্ আর পিঁ পিঁ—প্ল্যাটফর্মে যেন রথের মেলা! তবে—চাঁদির ওপরটা একবার চুলকে নিয়ে টেনিদা বললে—তবে হ্যাঁ—সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায় বটে। সেদিক থেকে বর্ধমানের প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যেতে পারে বৈকি। অন্তত লিলুয়ার চাইতে ঢের ভালো।

রাঙা-পিসিমার বাড়িকে অপমান! আমার ভারি রাগ হল।

বললাম, সে তো ভালোই হয়। তবে, বর্ধমানের মশার সাইজ প্রায় চড়ুই পাখির মতো, তাদের গোটাকয়েক মশারিতে ঢুকলে সীতাভোগ মিহিদানার মতো তোমাকেই ফলার করে ফেলবে। তাছাড়া—আমি বলে চললাম—আরো আছে। শুনলে তো, হাবুলের মামা ডি. এস. পি। ওখানে গিয়ে যদি কারুর সঙ্গে মারামারি বাধিয়েছ তাহলে আর কথা নেই—সঙ্গে-সঙ্গে হাজতে পুরে দেবে।

টেনিদা দমে গিয়ে বললে, যাঃ—বাঃ—মেলা বকিস নি! কী রে হাবুল—তোর মামা কেমন লোক?

হাবুল ভেবে-টেবে বললে, তা, প্যালা নিতান্ত মিথ্যা কথা কয় নাই! আমার মামায় আবার মিলিটারিতে আছিল—মিলিটারি মেজাজ—

—এই সেরেছে! নাঃ—এ ঢাকার বাঙালটাকে নিয়ে পারবার জো নেই! ওসব বিপজ্জনক মামার কাছে খামোকা মরতে যাওয়া কেন? দিব্যি আছি—মিথ্যে ফ্যাচাঙের ভেতরে কে পড়তে চায় বাপু!

আলোচনাটা এ-পর্যন্ত এসেছে—হঠাৎ বেগে ক্যাবলার প্রবেশ। হাতে একঠোঙা আলু-কাবলি।

—এই যে—ক্যাবলা এসে পড়েছে। বলেই টেনিদা লাফিয়ে উঠল, তারপরেই চিলের মতো ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে কেড়ে নিলে আলু-কাবলির ঠোঙাটা। প্রায় আদ্ধেকটা একেবারে মুখে পুরে দিয়ে বললে, কোত্থেকে কিনলি রে? তোফা বাদিয়েছে তো!

আলু-কাবলির শোকে ক্যাবলাকে বিমর্ষ হতে দেখা গেল না। বরং ভারি খুশি হয়ে বললে, মোড়ের মাথায় একটা লোক বিক্রি করছিল।

—এখনো আছে লোকটা? আরো আনা-চারেকের নিয়ে আয় না!

ক্যাবলা বললে, ধ্যাৎ, আলু-কাবলি কেন? পোলাও—মুরগি—চিংড়ির কাটলেট—আনারসের চাটনি—দই—রসগোল্লা—

টেনিদা বললে, ইস্, ইস্—আর বলিসনি! এমনিতেই পেট চুঁই-চুঁই করছে, তার ওপরে ওসব বললে একদম হার্টফেল করব!

ক্যাবলা হেসে বললে, হার্টফেল করলে তুমিই পস্তাবে! আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে এ-সবই রান্না হচ্ছে কিনা! আর মা তোমাদের তিনজনকে নেমন্তন্ন করতে বলে দিয়েছেন।

শুনে আমরা তিনজনেই একেবারে থ ! পুরো তিন মিনিট মুখ দিয়ে একটা রা বেরুলো না।

তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে টেনিদা বললে, সত্যি বলছিস ক্যাবলা—সত্যি বলছিস ? রসিকতা করছিস না তো ?

ক্যাবলা বললে, রসিকতা করব কেন? রাঁচি থেকে মেসোমশাই এসেছেন যে ! তিনিই তো বাজার করে আনলেন।

—আর মুরগি ? মুরগি আছে তো ? দেখিস ক্যাবলা—বামুনকে আশা দিয়ে নিরাশ করিস নি ! পরজন্মে তাহলে মুরগি হয়ে জন্মাতে হবে—খেয়াল থাকে যেন !

—সে ভাবনা নেই। আধ-ডজন দড়ি-বাঁধা মুরগি উঠোনে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে দেখে এলাম।

ট্রিম—ট্রিম—ট্রা—লা—লা—লা—লা—

টেনিদা আনন্দে নেচে উঠল। সেইসঙ্গে আমরা তিনজন কোরাস ধরলাম। গলি দিয়ে একটা নেড়ি-কুকুর আসছিল—সেটা ঘ্যাঁক করে একটা ডাক দিয়েই ল্যাজ গুটিয়ে উল্টো দিকে ছুটে পালালো।

* * * *

রাত্তিরে খাওয়ার যা ব্যবস্থা হল—সে আর কী বলব ! টেনিদার খাওয়ার বহর দেখে মনে হচ্ছিল, এর পরে ও আর এমনি উঠতে পারবে না—ক্রেনে করে তুলতে হবে। সের-দুই মাংসর সঙ্গে ডজন-খানেক কাটলেট তো খেলোই—এর পরে প্লেট-ফ্লেট শুদ্ধু খেতে আরম্ভ করবে এমনি আমার মনে হল।

খাওয়ার টেবিলে আর-একজন মজার মানুষকে পাওয়া গেল। তিনি ক্যাবলার মেসোমশাই। ভদ্রলোক কত গল্পই যে জানেন ! একবার শিকার করতে গিয়ে বুনো মোষের ল্যাজ ধরে কেমন বন্-বন্ করে ঘুরিয়েছিলেন, সে গল্প শুনে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার জো হল। আর-একবার নাকি গাছের ডাল ভেঙে সোজা

বাঘের পিঠের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন—বাঘ তাঁকে টপাৎ করে খেয়ে ফেলা দূরের কথা—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান! বোধহয় ভেবেছিল, তাকে ভূতে ধরেছে। এমনকি সবাই মিলে জলজ্যান্ত বাঘকে যখন খাঁচায় পুরে ফেলল—তখনো তার জ্ঞান হয়নি। শেষকালে নাকে স্মেলিং সল্ট শুঁকিয়ে আর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তবে বাঘের মূর্ছা ভাঙাতে হয়।

খাওয়ার পরে ক্যাবলাদের ছাতে বসে এইসব গল্প হচ্ছিল। ইজি-চেয়ারে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে গল্প বল-ছিলেন ক্যাবলার মেসোমশাই—আর আমরা মাতুরে বসে শুনছিলাম। মেসোমশাইয়ের টাকের ওপর চাঁদের আলো চিকচিক করছিল—থেকে-থেকে লালচে আগুনে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তাঁর মুখখানা।

মেসোমশাই বললেন, ছুটিতে বেড়াতে যেতে চাও? আমি এক জায়গায় যাওয়ার কথা বলতে পারি। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা আশে-পাশে বেশি নেই।

ক্যাবলা বললে, রাঁচি?

মেসোমশাই বললেন, না—না, এখন বেজায় গরম পড়ে গেছে ওখানে। তাছাড়া বড্ড ভিড়—ও সুবিধে হবে না।

টেনিদা বললে, দার্জিলিং, না শিলং?

মেসোমশাই বললেন, বেজায় শীত। গরমে পুড়তে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শীতে জমে যেতেই বা কী সুখ, সে আমি ভেবে পাইনে। ও-সব নয়।

আমার একটা কিছু বলা দরকার এখন। কিন্তু কিছুই মনে এল না। ফস্ করে বলে বসলাম, তাহলে গোবরডাঙা?

—চুপ কর্ বলছি প্যালা—চুপ কর্!—টেনিদা দাঁত খিচোলো—নিজে এক-নম্বর গোবর-গণেশ—গোবরডাঙা আর লিলুয়া ছাড়া আর কী বা খুঁজে পাবি?

মেসোমশাই বললেন, থামো—থামো। ও-সব নয়। আমি যে জায়গার কথা বলছি, কলকাতার লোকে তার এখনো খবর রাখে না। জায়গাটা রাঁচির কাছাকাছি বটে—হাজারিবাগ আর রামগড় থেকে সেখানে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি চড়ে মাইল-তিনেক পথ। ভারি সুন্দর জায়গা—শাল আর মহুয়ার বন, একটা লেক রয়েছে—তাতে টলটলে নীল জল। দিনের বেলাতেই হরিণ দেখা যায়—খরগোস আর বন-মুরগি ঘুরে বেড়ায়। কাছেই সাঁওতালদের বস্তি, দুধ আর মাংস খুব শস্তায় পাওয়া যায়—লেকেও কিছু মাছ আছে—দু-পয়সা চার পয়সা সের। আর সেইখানে পাহাড়ের একটা টিলার ওপর একটা খাসা বাংলো আমি কিনেছি। বাংলোটা এক সায়েব তৈরি করিয়েছিল—বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে বেচে দিয়ে গেছে। চমৎকার বাংলো! তার বারান্দায় বসে কতদূর পর্যন্ত যে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক নেই। পাশেই ঝরনা—বারো মাস তির-তির করে জল বইছে। ওখানে গিয়ে যদি একমাস থাকো—এই রোগা প্যাঁকাটির দল সব একেবারে ভীম ভবানী হয়ে ফিরে আসবে।

টেনিদা পাহাড়-প্রমাণ আহার করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়ে ছিল, তড়াক করে উঠে বসল।

—আমরা যাবো! আমরা চারজনেই!

মেসোমশাই আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে!

—কী মুস্কিল?

—কথাটা হল—ইয়ে—মানে বাড়িটার কিছু গোলমাল আছে।

—গোলমাল কিসের?

—ওখানকার সাঁওতালেরা বলে, বাড়িটা নাকি দানো-পাওয়া। ওখানে নাকি অপদেবতার উপদ্রব হয় মধ্যে-মধ্যে। কে যেন দুম-দাম করে হেঁটে বেড়ায়—অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—অথচ কাউকে দেখতে

পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য বাড়িটা কেনবার পরে মাত্র বার-তিনেক গেছি—তাও সকালে পৌঁছেছি, আর সন্ধ্যাবেলার চলে এসেছি। কাজেই রাত্তিরে ওখানে কী হয় না হয় কিছুই টের পাইনি। তাই ভাবছি—ওখানে যেতে তোমাদের সাহসে কুলোবে কি না।

টেনিদা বললে, ছোঃ! ওসব বাজে কথা! ভূত-টুত বলে কিছু নেই মেসোমশাই। আমরা চারজনেই যাব। ভূত যদি থাকেই, তাহলে তাকে একেবারে রাঁচির পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসব কলকাতায়। আর—

কিন্তু তারপরেই আর কিছু বলতে পারল না টেনিদা—হঠাৎ থম্‌কে গিয়ে দু-হাতে হাবুল সেনকে প্রাণপণে জাপটে ধরল।

হাবুল ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আহা-হা—কর কী, ছাইড়্যা দাও, ছাইড়্যা দাও! গলা পর্যন্ত খাইছি, প্যাটটা ফ্যাইট্যা যাইবো যে!

টেনিদা তবু ছাড়ে না। আরো শক্ত করে হাবুলকে সাপটে ধরে বললে, ওকি—ওকি—বাড়ির ছাতে ও কী!

আকাশে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে একফালি কালো মেঘের আড়ালে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে পাশের বাড়ির ছাতে কার যেন দুটো অমানুষিক চোখ দপ্‌-দপ্‌ করে জ্বলছে।

আর সেই মুহূর্তেই ক্যাবলার মেসোমশাই আকাশ ফাটিয়ে প্রচণ্ড অট্টহাসি করে উঠলেন। সে হাসিতে আমার কান বোঁ-বোঁ করে উঠল, পেটের মধ্যে খটখটিয়ে নড়ে উঠল পালাজ্বরের পিলে—মনে হল মুরগি-টুরগিগুলো বুঝি পেট-ফেট চিরে কঁক-কঁক করতে করতে বেরিয়ে আসবে।

এমন বিরাট কিম্ভূত অট্টহাসি জীবনে আর কখনো শুনিনি।

দুই

যোগ-সর্পের হাঁড়ি

একে তো ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের ঐ উৎকট অট্টহাসি—তারপর আবার পাশের বাড়ির ছাতে দুটো আগুন-মাখা চোখ! 'জয় মা কালী' বলে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাবো ভাবছি, এমন সময়—মিয়্যাঁও—মিয়্যাঁও—ম্যাঁও—

সেই জ্বলন্ত চোখের মালিক এক লাফে ছাতের পাঁচিলে উঠে পড়ল, তারপর আর-এক লাফে আর-এক বাড়ির কার্নিশে।

পৈশাচিক অট্টহাসিটা থামিয়ে মেসোমশাই বললেন, একটা হুলো-বেড়াল দেখেই চোখ কপালে উঠল, তোমরা যাবে সেই ডাক-বাংলোয়!—ভেংচি কাটার মতো করে আবার খানিকটা খ্যাঁকখেঁকে হাসি হাসলেন ভদ্রলোক: বীর কি আর গাছে ফলে!

আমাদের ভেতর ক্যাবলাটা বোধহয় ভয়-টয় বিশেষ পায়নি—এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। তাই সঙ্গে-সঙ্গেই বললে, না—পটোলের মতো পটলডাঙায় ফলে।

টেনিদার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হাবুল হাঁস-ফাঁস করে বললে, কিংবা ঢ্যাঁড়সের মতন গাছের ওপর ফলে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল: কিংবা চালের ওপর চাল-কুমড়োর মতো ফলে।

টেনিদা দম নিচ্ছিল এতক্ষণ, এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,—থাম্ থাম্ সব—বাজে বকিস নি! সত্যি বলছি মেসোমশাই—ইয়ে—আমরা একদম ভয় পাইনি। এই প্যালাটা বেজায় ভিতু কিনা, তাই ওকে একটু ঠাট্টা করছিলাম।

বা রে, মজা মন্দ নয় তো! শেষকালে আমার ঘাড়েই চালাবার চেষ্টা! আমার ভীষণ রাগ হল। আমি ছাগলের মতো মুখ করে বললাম, না মেসোমশাই, আমি মোটে ভয় পাইনি। টেনিদার দাঁত-কপাটি লেগে যাচ্ছিল কিনা, তাই চেঁচিয়ে ওকে সাহস দিচ্ছিলাম।

—ইঃ, সাহস দিচ্ছিল! ওরে আমার পাকা পালোয়ান রে!—টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে আমের মোরব্বার মতো করে বললে, ছ্যাখ পালা, বেশি জ্যাঠামি করবি তো এক চড়ে তোর কান-ছুটোকে কানপুরে পাঠিয়ে দেব!

মেসোমশাই বললেন, আচ্ছা থাক, থাক। তোমরা যে বীর পুরুষ এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আসল কথা হোক। তোমরা কি সত্যিই ঝন্টিপাহাড়ে যেতে চাও?

ঝন্টিপাহাড়! সে আবার কোথায়? যা-ব্বাবা, সেখানে মরতে যাব কেন?—টেনিদা চটাং করে বলে ফেলল।

মেসোমশাই বললেন, কী আশ্চর্য—এক্ষুনি তো সেখানে যাওয়ার কথা হচ্ছিল।

—তাই নাকি?—টেনিদা মাথা চুলকে বললে, বুঝতে পারিনি। তবে কিনা—ঝন্টিপাহাড় নামটা, কি বলে—ইয়ে—তেমন ভালো নয়!

হাবুল বললে, হ, বড়ই বদ-খৎ!

আমি বললাম, শুনলেই মনে হয় ব্রহ্মদৈত্য আছে!

মেসোমশাই আবার খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বললেন, তার মানে, তোমরা যাবে না? ভয় ধরেছে বুঝি?

টেনিদা এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সাঁ করে একটা বুক-ডন দিয়ে বললে, ভয়? ভয় ছুনিয়ায় আছে বলে আমি জানিনে!—নিজের বুকে একটা থাবড় মেরে বললে, কেউ না যায়—হাম জায়েঙ্গা! একাই জায়েঙ্গা!

ক্যাবলা বললে, আর যখন ভূতে ধরেঙ্গা?

—তখন ভূতকে চাটনি বানিয়ে খায়েঙ্গা!—টেনিদা বীর রসে চাগিয়ে উঠল : সত্যি, কেউ না যায় আমি একাই যাব!

হঠাৎ আমার ভারি উৎসাহ হল।

—আমিও যাব!

ক্যাবলা বললে, আমিও!

হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, আমিও জামু!

মেসোমশাই বললেন, তোমরা ভয় পাবে না?

টেনিদা বুক চিতিয়ে বললে, একদম না!

আমিও ওই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা একটা ফোড়ন কেটে দিলে—তবে, রাত্তিরবেলা হুলোবেড়াল দেখলে কী হবে কিছুই বলা যায় না।

মেসোমশাই আবার ছাত-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠলেন। টেনিদা গর্জন করে বললে, ত্যাখ ক্যাবলা, বেশি বক-বক করবি তো এক ঘুসিতে তোর নাক—

আমি জুড়ে দিলাম : নাসিকে পাঠিয়ে দেব!

—যা বলেছিস! একখানা কথার মতো কথা!—এই বলে টেনিদা এমনভাবে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে যে আমি উহু-উহু শব্দে চেঁচিয়ে উঠলাম।

তার পরের খানিকটা ঘটনা সংক্ষেপে বলে যাব। কেমন করে আমরা চার মূর্তি বাড়ি থেকে পারমিশন আদায় করলাম সে-সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সে-সব এলাহি কাণ্ড এখন থাক। মোট কথা এর তিনদিন পরে, কাঁধে চারটে সুটকেস আর বগলে চারটে সতরঞ্চি-জড়ানো বিছানা নিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুলাম।

ট্রেন প্রায় ফাঁকাই ছিল। এই গরমে নেহাৎ মাথা খারাপ না

হলে আর কে রাঁচি যায়? ফাঁকা একটা ইণ্টার ক্লাস দেখে আমরা উঠে পড়লাম, তারপর চারটে বিছানা পেতে নিলাম।

ভাবলাম, বেশ আরামে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি, হঠাৎ টেনিদা ডাকল—এই প্যালা!

—আবার কী হল!

—ভারি খিদে পেয়েছে মাইরি! পেটের ভেতরে যেন একপাল ছুঁচো বক্সিং করছে!

বললাম, সেকি! এই তো বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে প্রায় তিরিশখানা লুচি আর সের-টাক মাংস সাবাড় করে এলে! গেল কোথায় সেগুলো?

হাবুল বললে, তোমার প্যাটে ভস্মকীট ঢুইক্যা বসছে!

টেনিদা বললে, যা বলেছিস! ভস্মকীটই বটে! যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ ভস্ম হয়ে যায়! বলেই দরাজভাবে হাসল: বামুনের ছেলে, বুঝলি—সাক্ষাৎ অগস্ত্য মুনির বংশধর! বাতাপি ইল্বল ফিল্বল যা ঢুকবে দেন-অ্যাণ্ড-দেয়ার হজম হয়ে যাবে! হুঁ-হুঁ!—এরই নাম ব্রহ্মতেজ!

ক্যাবলা বলে বসল: ঘোড়ার ডিমের বামুন তুমি! পৈতে আছে তোমার?

—পৈতে? টেনিদা একটা ঢোক গিলল: ইয়ে ব্যাপারটা কী জানিস? গরমের সময় পিঠ চুলকোতে গিয়ে কেমন পটাং করে ছিঁড়ে যায়। তা আদত বামুনের আর পৈতের দরকার কী, ব্রহ্মতেজ থাকলেই হল। কিন্তু সত্যি, কী করা যায় বল্ তো? পেটের ভেতর ছুঁচোগুলো যে রেগুলার হাডু-ডু খেলছে!

ক্যাবলা বললে, তা আর কী করবে। তুমি রেফারিগিরি করো।

—কী বললি ক্যাবলা?

—কী আর বলব—কিছুই বলিনি—বলেই ক্যাবলা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল।

হাবুল সেন এর মধ্যে বলে বসল, প্যাটে কিল মাইরা বইস্যা থাকো।

—কার পেটে কিল মারব? তোর?—বলে ঘুসি বাগিয়ে টেনিদা উঠে পড়ে আর কি!

হাবুল চটপট বলে বসল, আমার না—আমার না—প্যালার।

বা-রে, এ তো বেশ মজা দেখছি! মিছিমিছি আমি কেন পেটে কিল খেতে যাই? তড়াক করে একটা বাঙ্কের ওপর উঠে বসে আমি বললাম, আমি কেন কিল খাব? কী দরকার আমার?

টেনিদা বললে, খেতেই হবে তোকে! হয় আমায় যা-হোক কিছু খাওয়া, নইলে শুধু কিল কেন—রাম-কিল আছে তোর বরাতে। ঐ তো কত ফিরিওলা যাচ্ছে—ডাক্ না একটাকে। পুরি-কচৌরি, কমলালেবু, চকোলেট—ডালমুট—

—আমি তো দেখছি একটা জুতো-ব্রাশ যাচ্ছে। ওকেই ডাকব? —আমি নিরীহ গলায় জানতে চাইলাম।

—তবে রে—বলে টেনিদা প্রায় তেড়ে আসছিল আর আমি জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব কি না ভাবছিলুম, এমন সময় ঢনাঢ্ঢন করে ঘণ্টা বাজল। এঞ্জিনে ভোঁ করে আওয়াজ হল—আর গাড়ি নড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে আর-একজন ঢুকে পড়ল কামরায়, তার হাতে এক প্রকাণ্ড সন্দেহজনক চেহারার হাঁড়ি। আর তক্ষুনি পেছন থেকে কে যেন কি-একটা ছুড়ে দিলে গাড়ির ভেতরে। সেটা পড়বি তো পড়, একেবারে টেনিদার ঘাড়ের ওপর। টেনিদা হাঁই-মাই করে উঠল।

তারপরেই চোখ পাকিয়ে 'এটা কী হল মশাই'—বলতে গিয়েই স্পীকটি নট্! সঙ্গে সঙ্গে আমরাও!

গাড়িতে যিনি ঢুকেছেন—তাঁর চেহারাখানা দেখবার মতো। একটি দশাসই চেহারার সাধু। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—দাড়ি

গোঁফে মুখ একেবারে ছয়লাপ। গলায় অ্যাই মোটা-মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের তিলক আঁকা, পায়ে শুঁড়-তোলা নাগরা।

হাতের সন্দেহজনক হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে সাধুবাবা বললেন, ঘাবড়ে যেওনা বৎস—ওটা আমার বিছানা। তাড়াহুড়োতে আমার শিষ্য জানলা গলিয়ে ছুড়ে দিয়েছে। তোমার বিশেষ লাগেনি তো?

—না, তেমন আর কী লেগেছে বাবা! তবে সাতদিনে ঘাড়ের ব্যথা ছাড়লে হয়!—টেনিদা ঘাড় ডলতে লাগল। আমি কিন্তু ভারি খুশি হয়ে গেলাম সাধুবাবার ওপরে। যেমন আমার পেটে কিল মারতে এসেছিলে—বোঝো এবার!

সাধুবাবা হেসে বললেন, একটা বিছানার ঘায়েই কাবু হয়ে পড়লে বৎস, আর আমার কাঁধে একবার একটা আস্ত কাবুলিওয়ালা একমণ হিংয়ের বস্তা নিয়ে বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিল। তবু আমি অক্কা পাইনি—সাতদিন হাসপাতালে থেকেই সামলে নিয়েছিলুম। বুঝেছ বৎস—এরই নাম যোগবল!

—তবে তো আপনি মহাপুরুষ স্যর—দিন দিন, পায়ের ধুলো দিন!—বলেই টেনিদা ঝাঁ করে সাধুবাবাকে একটা প্রণাম ঠুকে বসল।

সাধু বললেন, ভারি খুশি হলুম—তোমার সুমতি হোক। তা তোমরা কারা? এমন দল বেঁধে চলেছই বা কোথায়?

—প্রভু, আমরা রামগড়ে যাচ্ছি। বেড়াতে। আমার নাম টেনি—থুড়ি, ভজহরি মুখুজ্জে। এ হচ্ছে প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে—খালি জ্বরে ভোগে আর পেটে মস্ত একটা পিলে আছে। এ হল হাবুল সেন—যদিও ঢাকাই বাঙাল, কিন্তু আমাদের পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবে অনেক টাকা চাঁদা দেয়। আর ও হল ক্যাবলা মিত্তির, ক্লাসে টকাটক ফার্স্ট হয় আর ওদের বাড়িতে আমাদের বিস্তর পোলাও মাংস খাওয়ায়।

—পোলাও মাংস! আহা—তা বেশ—দাড়ির ভেতরে সাধুবাবা যেন নোলার জল সামলালেন মনে হল : তা বেশ—তা বেশ!

—বাবা, আপনি কোন্ মহাপুরুষ?—হাবুল সেন হাতজোড় করে জানতে চাইল।

—আমার নাম? স্বামী ঘুটঘুটানন্দ।

—ঘুটঘুটানন্দ! ওরে বাবা!—ক্যাবলার স্বগতোক্তি শোনা গেল।

—এতেই ঘাবড়ালে বৎস ক্যাবল? আমার গুরুর নাম কী ছিল জান? ডমরু-ঢক্কা-পট্টনানন্দ; তাঁর গুরুর নাম ছিল উচ্চণ্ড-মার্তণ্ড-কুক্কুটডিম্বভর্জনানন্দ; তাঁর গুরুর নাম ছিল—

—আর বলবেন না প্রভু ঘুটঘুটানন্দ—এতেই দম আটকে আসছে! এরপর হার্টফেল করব!—বাঙ্কের ওপর থেকে এবার কথাটা বলতেই হল আমাকে।

শুনে ঘুটঘুটানন্দ করুণার হাসি হাসলেন : আহা—নাবালক! তা, তোমাদের আর দোষ কী—আমার গুরুদেবের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ গুরুর নাম শুনে আমারই দু-দিন ধরে সমানে হিক্কা উঠেছিল। সে যাক—তোমরা চারজন আছ দেখছি, যাবেও রামগড়ে। আমি নামব মুরিতে—সেখান থেকে রাঁচি। তা বৎসগণ, আমার যোগনিদ্রা একটু প্রবল—চট করে ভাঙতে চায় না। মুরিতে গাড়ি ভোরবেলায় পৌঁছয়—যদি উঠিয়ে দাও—বড় ভাল হয়।

—সেজন্যে ভাববেন না প্রভু, ঘাটশিলাতেই উঠিয়ে দেব আপনাকে।—ক্যাবলা আশ্বাস দিলে।

—না—না বৎস, অত তাড়াতাড়ি জাগাবার দরকার নেই। ঘাটশিলায় মাঝরাত।

—তাহলে টাটানগরে?

—সেটা শেষরাত, বৎস—অত ব্যস্ত হয়ো না। মুরিতে উঠিয়ে দিলেই চলবে।

টেনিদা বললে, আচ্ছা তাই দেব। এবার আপনি যোগনিদ্রায় শুয়ে পড়তে পারেন।

—তা পারি।—ঘুটঘুটানন্দ এবার চারিদিকে তাকালেন: কিন্তু শোবো কোথায়? চারজনে তো চারটে নিচের বেঞ্চি দখল করে বসেছ। আমি সন্ন্যাসি মানুষ—বাঙ্কে উঠলে যোগনিদ্রার ব্যাঘাত হবে।

টেনিদা বললে, আপনি উঠবেন কেন প্রভু—প্যালা বাঙ্কে শোবে। ও বাঙ্কে শুতে ভীষণ ভালোবাসে।

ছাখো তো—কী অন্যায়! বাঙ্কে ওঠা আমি একদম পছন্দ করি না, খালি মনে হয় কখন ছিটকে পড়ে যাব—আর টেনিদা কিনা আমাকেই—

আমি বললাম, কক্ষনো না—বাঙ্কে শুতে আমি মোটেই ভালোবাসি না!

টেনিদা চোখ পাকালো।

—ছাখ্‌ প্যালা—সাধু-সন্নিসি নিয়ে ফাজলামো করিসনি—নরকে যাবি! প্রভু, আপনি প্যালার বিছানা ফেলে দিয়ে ঐখানেই লম্বা হোন—প্যালা যেখানে হোক শোবে।

—আহা, বেঁচে থাকো বৎস—বলে ঘুটঘুটানন্দ আমার বিছানা ওপরে তুলে দিয়ে নিজের বিছানাটি পাতলেন। আমি জুলজুল করে চেয়ে রইলাম।

তারপর শোয়ার আগে সেই সন্দেহজনক হাঁড়িটি নিজের বেঞ্চির তলায় টেনে আনলেন। টেনিদা অনেকক্ষণ ধরে সেটা লক্ষ্য করছিল, জিজ্ঞেস করল, ও হাঁড়িতে কী আছে প্রভু?

শুনেই ঘুটঘুটানন্দ চমকে উঠলেন: হাঁড়িতে? হাঁড়িতে বড় ভয়ঙ্কর জিনিস আছে বৎস! যোগসর্প!

—যোগসর্প?—হাবুল বললে, সেইটা আবার কী প্রভু?

ঘুটঘুটানন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, সে বড় সাজ্ঘাতিক ব্যাপার! ভীষণ সমস্ত বিষধর সাপ—তপস্যাবলে আমি তাদের বন্দী করে রেখেছি। তারা দুধকলা খায় আর হরিনাম করে।

—সাপে হরিনাম করে!—আমি জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলুম না।

—তপস্যায় সব হয় বৎস! ঘুটঘুটানন্দ হাসলেন : তা বলে তোমরা ওর ধারে-কাছেও যেও না! যোগবল না থাকলে বোঁ করে ছোবল মেরে দেবে! সাবধান!

—আজ্ঞে আমরা খুব সাবধানে থাকব—টেনিদা গোবেচারির মতো বললে।

ঘুটঘুটানন্দ আর-একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, হ্যাঁ, খুব সাবধান! ঐ হাঁড়ির দিকে ভুলেও তাকিও না।—তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি?

—পড়ুন।

তারপর পাঁচ মিনিট কাটল না। ঘর্-ঘর্ ঘরাৎ করে ঘুটঘুটানন্দের নাক ডাকতে লাগল।

···বাঙ্কের ওপরে ঢুলুনি খেতে খেতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎ কার যেন খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, টেনিদা আমার পাঁজরায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

—নেমে আয় না গাধাটা! সাধুবাবা জেগে উঠলে তখন লবডঙ্কা পাবি!

চেয়ে দেখি, টেনিদার বিছানার ওপর যোগসর্পের হাঁড়ি। আর তার ঢাকনা খুলে ক্যাবলা আর হাবুল সেন পটাপট রসগোল্লা আর লেডিকেনি সাবড়ে দিচ্ছে।

টেনিদা আবার ফিসফিসিয়ে বললে, হাঁ করে দেখছিস কী? নেমে আয় শিগগির! যোগসর্পের হাঁড়ি শেষ করে আবার তো মুখ বেঁধে রাখতে হবে!

আর বলবার দরকার ছিল না। একলাফে নেমে পড়লুম এবং এক থাবায় দুটি লেডিকেনি তুলে ফেললুম।

টেনিদা এগিয়ে এসে বললে, দাঁড়া দাঁড়া—সবগুলো মেরে দিস নি! দুটো-একটা আমার জন্যেও রাখিস!

ট্রেন টাটানগর ছেড়ে আবার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বামী ঘুটঘুটানন্দের নাক সমানে ডেকে চলল : ঘরাৎ—ফোঁ—ফর্‌র্‌—ফোঁ—ফুরৎ—ফুর্‌র্‌—

চারজন মিলে যেভাবে আমরা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের হাঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, তাতে সেটা চিচিং ফাঁক হতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল না। অর্ধেকের ওপর টেনিদাই সাবড়ে দিলে—বাকিটা আমি আর হাবুল সেন ম্যানেজ করে নিলুম। বয়েসে ছোট ক্যাবলাই বিশেষ জুত করতে পারল না। গোটা-দুই লেডিকেনি খেয়ে শেষে হাত চাটতে লাগল।

টেনিদা তবু হাঁড়িটাকে ছাড়ে না। শেষকালে মুখের ওপর তুলে চোঁ করে রসটা পর্যন্ত নিকেশ করে দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে বললে, দুত্তোর, গোটাকয়েক ডেঁয়ো পিঁপড়েও খেয়ে ফেললুম রে! জ্যান্তও ছিল দু-তিনটে! পেটের ভেতরে গিয়ে কামড়াবে না তো?

হাবুল বললে, কামড়াইতেও পারে।

—কামড়াক গে, বয়ে গেল! একবার ভীমরুল-শুদ্ধ একটা জামরুল খেয়ে ফেলেছিলুম, তা সে-ই যখন কিছু করতে পারলে না—তখন কটা পিঁপড়েতে আর কী করবে!

—ইচ্ছে করলে গোটাকয়েক বাঘ-শুদ্ধ সুন্দরবন পর্যন্ত তুমি খেয়ে ফেলতে পার—তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে!—হাত চাটা শেষ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ক্যাবলা।

এর মধ্যে স্বামী ঘুটঘুটানন্দের নাক সমানেই ডেকে চলছিল। যোগসিদ্ধ নাক কিনা—সে নাকের ডাকবার কায়দাই আলাদা! ঘর্‌-র্‌-ঘোঁ-ঘুরুং!

টেনিদা বললে, যতই ঘুরুৎ-ঘুরুৎ করো না কেন—তোমার হাঁড়ি ফুড়ুৎ! চালাকি পেয়েছ! কাঁধের ওপর দেড়মণী বিছানা ফেলে

দেওয়া! ঘাড়টা টনটন করছে এখনো! প্রতিশোধ ভালোই নেওয়া হয়েছে—কী বলিস প্যালা?

আমি বললুম, প্রতিশোধ বলে প্রতিশোধ! একেবারে নির্মম প্রতিশোধ!

যোগসর্পের শূন্য হাঁড়িটার মুখ টেনিদা বেশ করে বাঁধল। তারপর বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে বললে, এবার একটু ঘুমোনো যাক। পেটের জ্বলুনিটা এতক্ষণে একটু কমেছে।

আমার আর হাবুলেরও তাতে সন্দেহ ছিল না। কেবল ক্যাবলাই গজ-গজ করতে লাগল: তোমরাই সব খেয়ে নিলে, আমি কিছু পেলুম না!

টেনিদা বললে, যা যা, মেলা বকিসনি! ছেলেমানুষ, বেশি খেয়ে শেষে কি অসুখে পড়বি? নে, চুপচাপ ঘুমো—

ক্যাবলা ঘুমোলো কি না কে জানে, কিন্তু টেনিদার ঘুমোতে দু-মিনিটও লাগল না। স্বামীজীর নাক বললে, ঘুরুৎ—টেনিদার নাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, ফুড়ুৎ! এই উত্তর-প্রত্যুত্তর কতক্ষণ চলল জানি না—মুখের ওপর থেকে দেওয়ালি পোকা তাড়াতে তাড়াতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

তিন

কলার খোসা

মুরি। মুরি জংসন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতেই দেখি, বাইরে আবছা সকাল। ক্যাবলা কখন উঠে বসে এক ভাঁড় চায়ে মন দিয়েছে। হাবুল সেন দুটো হাই তুলে শোয়া অবস্থাতেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দিকে জুলজুল করে তাকালে। কিন্তু স্বামীজীর নাক তখন বাজছে—গোঁ-গাঁ—আর

টেনিদার নাক জবাব দিচ্ছে—ভোঁ-ভাঁ—অর্থাৎ হাঁড়িতে আর কিছুই নেই।

হঠাৎ ক্যাবলা টেনিদার পাঁজরায় একটা খোঁচা দিলে।

—অ্যাই—অ্যাই! কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে র‍্যা?—বলে টেনিদা উঠে বসল।

ক্যাবলা বললে, গাড়ি যে মুরিতে প্রায় দশ মিনিট থেমে আছে! স্বামীজীকে জাগাবে না?

টেনিদা একবার হাঁড়ি, আর একবার স্বামীজীর দিকে তাকালো। তারপর বললে, গাড়িটা ছাড়তে আর কত দেরি রে?

—এখুনি ছাড়বে মনে হচ্ছে।

—তা ছাড়ুক। গাড়ি নড়লে তারপর স্বামীজীকে নড়ানো। বুঝছিস না, এখন ওঠালে হাঁড়ির অবস্থা দেখে কি আর রক্ষে রাখবে! যা ষণ্ডামার্কা চেহারা—রসগোল্লার বদলে আমাদেরই জলযোগ করে ফেলবে! তার চেয়ে—

টেনিদা আরো কি বলতে যাচ্ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে বাজখাঁই গলায় বিটকেল হাঁক শোনা গেল: প্রভুজী,—কোন্ গাড়িতে আপনি যোগনিদ্রা দিচ্ছেন দেবতা?

সে তো হাঁক নয়—যেন মেঘনাদ! সারা ইস্টিশন কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দ তড়াক করে উঠে বসলেন।

—প্রভুজী, জাগুন! গাড়ি যে ছাড়ল—

—অ্যাঁ! এ যে আমার শিষ্য গজেশ্বর!—জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বামীজী ডাকলেন: গজ—বৎস গজেশ্বর! এই যে আমি এখানে!

গাড়ির দরজা ঘটাৎ করে খুলে গেল। আর ভেতরে যে ঢুকল, তার চেহারা দেখেই আমি এক লাফে বাঙ্কে চেপে বসলুম। হাবুল আর টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ল—আর ক্যাবলা কিছু করতে পারল না—তার হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা টপাৎ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

—উহু হু গেছি—পা পুড়ে গেল রে—স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠলেন। উঃ—ছোঁড়াগুলো কী ত্যাঁদোড়! বলেছিলুম মুরিতে তুলে দিতে—তা হ্যাখো কাণ্ড! একটু হলেই তো ক্যারেড-ওভার হয়ে যেতুম!

গজেশ্বর একবার আমাদের দিকে তাকালো—সে চাউনিতেই রক্ত জল হয়ে গেল আমাদের। গজেশ্বরের বিরাট চেহারার কাছে অমন দশাসই স্বামীজীও যেন মূর্তিমান প্যাঁকাটি। গায়ের রঙ যেন হাঁড়ির তলার মতো কালো—হাতির মতোই প্রকাণ্ড শরীর—মাথাটা ন্যাড়া, তার ওপর হাত-খানেক একটা টিকি। গজেশ্বর কুতকুতে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, আজকাল ছোঁড়াগুলো এমনি হয়েছে প্রভু—যেন কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আমদানি হয়েছে সব! প্রভু যদি অনুমতি করেন, তাহলে এদের কানগুলো একবার পেঁচিয়ে দিই!

গজেশ্বর কান প্যাঁচাতে এলে আর দেখতে হবে না—কান উপড়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা চারজন ভয়ে তখন পান্তুয়া হয়ে আছি! কিন্তু বরাত ভালো—সঙ্গে সঙ্গে টিন-টিন করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

গজেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বললে, নামুন—নামুন প্রভু! গাড়ি যে ছাড়ল! এদের কানের ব্যবস্থা এখন তুলতুবি রইল—সময় পেলে পরে দেখা যাবে এখন! নামুন—আর সময় নেই—

বাক্স-বিছানা, মায় স্বামীজিকে প্রায় ঘাড়ে তুলে গজেশ্বর নেমে গেল গাড়ি থেকে। সেইসঙ্গেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করে দিল।

আমরা তখনো ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি—গজেশ্বরের হাতির শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড হাতটা তখনো আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। মস্ত ফাঁড়া কাটল একটা!

কিন্তু ট্রেন হাতকয়েক এগোতেই স্বামীজী হঠাৎ হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন: হাঁড়ি—আমার রসগোল্লার হাঁড়ি—

সঙ্গে সঙ্গেই টেনিদা হাঁড়িটা তুলে ধরল, বললে, ভুল বলছেন প্রভু, রসগোল্লা নয়, যোগসর্প! এই নিন—

বলেই হাঁড়িটা ছুড়ে দিলে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

—আহা-আহা—করে দু-পা ছুটে এসেই স্বামীজী থমকে দাঁড়ালেন। হাঁড়ি ভেঙে চুরমার। কিন্তু আধখানা রসগোল্লাও তাতে নেই—সিকিখানা লেড়িকেনি পর্যন্ত না।

—প্রভু, আপনার যোগসর্প সব পালিয়েছে—আমি চিৎকার করে বললুম। এখন আর ভয় কিসের!

কিন্তু একি—একি! হাতির মতো পা ফেলে ফেলে গজেশ্বর যে দৌড়ে আসছে! তার কুতকুতে চোখ দিয়ে যেন আগুন-বৃষ্টি হচ্ছে! এ যে ট্রেনের চাইতেও জোরে ছুটছে—কামরাটা প্রায় ধরে ফেললে!

আমি আবার বাঙ্কে উঠতে যাচ্ছি—টেনিদা ছুটেছে বাথরুমের দিকে—সেই মুহূর্তে—ভগবানের দান! একটা কলার খোসা!

হড়াৎ করে পা পিছলে সোজা প্ল্যাটফর্মে চিত হল গজেশ্বর। সে তো পড়া নয়—মহা পতন! মণখানেক খোয়া বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে পড়ল আশে-পাশে।

—গেল—গেল—চিৎকার উঠল চারপাশে। কিন্তু গজেশ্বর কোথাও গেল না—প্ল্যাটফর্মের ওপর সেকেণ্ড-পাঁচেক পড়ে থেকেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়ালো।

—খুব বেঁচে গেলি!—দূর থেকে গজেশ্বরের হতাশ হুঙ্কার শোনা গেল।

গাড়ি তখন পুরো দমে ছুটতে শুরু করেছে। টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হরি হে, তুমিই সত্য!

চার

ঝণ্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরাম

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। গজেশ্বরের সেই আছাড় খাওয়া নিয়ে খুব হাসাহাসি করলুম আমরা। অত বড় হাতির মতো লোকটা পড়ে গেল একেবারে ঘটোৎকচের মতো! তবে আমাদের চেপে পড়লে কী যে হত, সেইটেই ভাববার কথা।

হাবুল বললে, আর একটু হইলেই প্রায় উইঠ্যা পড়ছিল গাড়িতে! মাইর‍্যা আমাগো ছাতু কইর‍্যা দিত!

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে হাবলাকে ভেংচে বললে, হঃ—হঃ— ছাতু কইর‍্যা দিত! বললেই হল আর-কি! আমিও পটলডাঙার টেনি মুখুজ্জে—অ্যায়সা একখানা জুজুৎসু হাঁকড়ে দিতুম যে মুরি তো মুরি—বাছাধন একেবারে মুড়ি হয়ে যেত! চ্যাপ্টাও হতে পারত চিঁড়ের মতো!

শুনে ক্যাবলা খিক্-খিক্ করে হাসল।

—অ্যাই ক্যাবলা, হাসছিস যে? টেনিদার সিংহনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা কী ঘুঘু! সঙ্গে সঙ্গেই বললে, আমি হাসিনি তো— প্যালা হাসছে!

—প্যালা— !

বা—আমি হাসতে যাব কেন? যোগসর্পের হাঁড়ির লেডিকেনি খেয়ে সেই তখন থেকে আমার পেট কামড়াচ্ছে। আমার পেটেও গোটাকয়েক ডেঁয়ো পিঁপড়ে ঢুকেছে কি না কে জানে! মুখ ব্যাজার করে বললাম, আমি হাসব কেন—কী দায় পড়েছে আমার হাসতে!

টেনিদা বললে, খবর্দার—মনে থাকে যেন! খামোকা যদি হাসবি তাহলে তোর ওই মুলোর মতো দাঁতগুলো পটাপট উপড়ে দেব!— ইস্-স্, ব্যাটা গজেশ্বর বড্ড বেঁচে গেল! একবার ট্রেনে উঠে এলেই

বুঝতে পারত পটলডাঙায় প্যাঁচ কাকে বলে! আবার যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়—

কিন্তু সত্যিই যে দেখা হবে সে কথা কে জানত! আর আমি, পটলডাঙার প্যালারাম, অন্তত সে দেখা না হলেই খুশি হতুম।

ট্রেন একটু পরেই রামগড়ে পৌঁছল।

ক্যাবলার মেসোমশাই বলে দিয়েছিলেন গোরুর গাড়ি চাপতে। কিন্তু কলকাতার ছেলে হয়ে আমরা গোরুর গাড়িতে চাপব! ছোঃ—ছোঃ!

টেনিদা বললে, ছ-মাইল তো রাস্তা! চল্—হেঁটেই মেরে দিই—

আমি বললুম, সে তো বটেই—সে তো বটেই! দিব্যি পাখির গান আর বনের ছায়া—

ক্যাবলা বললে, ফুলের গন্ধ আর দক্ষিণের বাতাস—

টেনিদা বললে, আর পথের ধারে পাকা পাকা আম আর কাঁটাল ঝুলছে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের মালিক ঠ্যাঙা নিয়া তাইড়া আসছে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ইস্, দিলে সব মাটি করে! হচ্ছিল আম-কাঁটালের কথা, মেজাজটা বেশ জমে এসেছিল—কোত্থেকে আবার ঠ্যাঙা-ফ্যাঙা এনে হাজির করলে! এইজন্যেই তোদের মতো বেরসিকের সঙ্গে আসতে ইচ্ছে করে না! নে, চল্ এখন, পা চালা—

সুটকেস কাঁধে, বিছানা ঘাড়ে আমরা শুরু করলুম।

কিন্তু বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়ানো আর সুটকেস বিছানা নিয়ে ছ-মাইল রাস্তা পাড়ি দেওয়া যে এক কথা নয় সেটা বুঝতে বেশি দেরি হল না। আধ মাইল হাঁটতে-না-হাঁটতেই আমার পালা-জ্বরের পিলে টন-টন করে উঠল।

—টেনিদা, একটু জিরিয়ে নিলে হয় না ?

টেনিদা তৎক্ষণাৎ রাজি।

—তা মন্দ বলিসনি। ক্ষিদেটাও বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে। একটু জল-টল খেয়ে নিলে হয়—কী বলিস ক্যাবলা ?—বলে টেনিদা ক্যাবলার সুটকেসের দিকে তাকাল। এর আগেই দেখে নিয়েছে, ক্যাবলার সুটকেসে নতুন বিস্কুটের টিন রয়েছে একটা।

ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গেই সুটকেসটাকে বগলে চেপে ধরল।

—জল-টল খাবে মানে ? এক্ষুনি তো রামগড় স্টেশনে গোটা-আষ্টেক সিঙাড়া খেয়ে এলে !

—তা খেয়েছি তো কী হয়েছে!—একটানে ক্যাবলার বগল থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিলে টেনিদা : ঐ খেয়েই ছ-মাইল রাস্তা চলবে নাকি ! আমার বাবা ক্ষিদেটা একটু বেশি—সে তোমরা যাই বলো !

বলেই ধপ্ করে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই খুলে ফেলল সুটকেস। চাবি ছিল না—পত্রপাঠ বেরিয়ে এল টিনটা।

একরাশ খাস্তা ক্রীম-ক্র্যাকার বিস্কুট। কী করি, আমরাও বসে পড়লুম। টেনিদা একাই প্রায় সব-কটা সাবাড় করলে—আমরা ছিটে-ফোঁটার বেশি পেলুম না। শুধু ক্যাবলাই কিছু খেল না, হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রইল।

ছ-মাইল রাস্তা—হাঁটা মন্দ হল না। হাবুল সেন ডু-খানা পাঁউরুটি রেখেছিল, এর পরে সেগুলোও গেল। কিন্তু টেনিদার ক্ষিদে আর মেটে না! রাস্তায় চিড়ে-মুড়ির দোকান দেখলেই বসে পড়ে আর হাঁক ছাড়ে : ডু-আনা পয়সা বের কর, প্যালা—ক্ষিদেয় পেটটা ঝিম-ঝিম করছে !

মাইল-চারেক পেরুতেই পাহাড়ি পথ আরম্ভ হল। ডু-ধারে শালের জঙ্গল, আর তার ভেতর দিয়ে রাঙা মাটির পথ ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। খানিকটা হাঁটতেই গা ছম-ছম করতে লাগল।

ক্যাবলা বলে বসল ঃ টেনিদা—এ-সব জঙ্গলে বাঘ থাকে।

টেনিদার মুখ শুকিয়ে গেল, বললে, যাঃ—যাঃ—

হাবুল বললে, শুনছি ভাল্লুকও থাকে।

টেনিদা বললে, হুম্!

বাঘ ভালুকের পরে আর কী আছে আমার মনে পড়ল না। আমি বললাম, বোধহয় হিপোপোটেমাসও থাকে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল ঃ থাম থাম প্যালা, বেশি পাকামো করিস নি! আমাকে ছাগল পেয়েছিস, না? হিপোপোটেমাস তো জলহস্তী। জঙ্গলে থাকে কী করে?

আমি বললুম, আচ্ছা যদি ভূত থাকে?

টেনিদা রেগে বললে, তুই একটা গো-ভূত! ভূত এখানে কেন থাকবে শুনি? মানুষই নেই, চাপবে কার ঘাড়ে?

ক্যাবলা ফস্ করে বলে বসল : যদি আমাদের ঘাড়েই চাপতে আসে? আর তুমি তো আমাদের লীডার—যদি তোমার ঘাড়টাই ভূতের বেশ পছন্দ হয়ে যায়?

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁ করে একটা দু-হাত লম্বা হাত বাড়িয়ে দিলে ক্যাবলার কান পাকড়ে ধরার জন্যে। তৎক্ষণাৎ পট্ করে সরে গেল ক্যাবলা, আর টেনিদা খানিকটা গোবরে পা দিয়ে একেবারে গজেশ্বরের মতো—

ধপাস—ধাঁই!

আনন্দে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ঠিক তৎক্ষণাৎ—জঙ্গলের মধ্য থেকে হঠাৎ প্রায় ছ-হাত লম্বা একটা মূর্তি বেরিয়ে এল। প্যাঁকাটির মতো রোগা—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—কটকটে কালো গায়ের রঙ। বিকট মুখে তার উৎকট হাসি। ভূতের নাম করতে করতেই জঙ্গল থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে।

—বাবা গো—বলে আমিই প্রথম উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগলুম।

ক্যাবলা এক লাফে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল, টেনিদা উঠতে গিয়ে আবার গোবরের মধ্যে আছাড় খেল, আর হাবুল সেন দু-হাতে চোখ চেপে ধরে চ্যাঁচাতে লাগল : ভূত—ভূত—রাম-রাম—

সেই মূর্তিটা বাজখাঁই গলায় হা-হা করে হেসে উঠল।

—খোঁকাবাবু আপনারা মিছাই ভয় পাচ্ছেন! হামি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরাম—বাবুর চিঠি পেয়ে আপনাদের আগ বাড়িয়ে নিতে এলম। ভয় পাবেন না—ভয় পাবেন না—

আমি তখন আধ মাইল রাস্তা পার হয়ে গেছি—ক্যাবলা গাছের মগডালে। হাবুল সমানে বলে চলেছে : ভূত আমার পুত, শাকচুন্নি আমার ঝি! টেনিদা তখনো গোবরের মধ্যেই ঠায় বসে আছে। ভিরমিই গেছে কি না কে জানে!

মূর্তিটা আবার বললে, কুছ্ ডর নেই খোকাবাবু, কুছ্ ডর নেই! আমি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরাম—আপনাদের নোকর—

পাঁচ

চলমান জুতো

কী যে বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা! ভূত নয়—তবু কেমন ভূতের ভয় ধরিয়ে দিলে হতচ্ছাড়া ঝণ্টুরাম! আধ ঘণ্টা ধরে বুকের কাঁপুনি আর থামতেই চায় না!

গোবর-টোবর মেখে টেনিদা উঠে দাঁড়াল। গোটাকয়েক অ্যায়সা অ্যায়সা কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে প্রাণপণে পা চুলকোতে চুলকোতে নামল ক্যাবলা। হাবুলের হাঁটুদুটো থেকে-থেকে ধাক্কা খেতে লাগল। আর মাইলখানেক বাঁই-বাঁই করে দৌড়োনোর ফলে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল।

টেনিদাই সামলে নিলে সক্কলের আগে।

—ঝণ্টুরাম ?—দাঁত খিচিয়ে টেনিদা বললে, তা অমন ভূতের মতো চেহারা কেন ?

—কী করব খোঁকাবাবু, ভগবান বানিয়েছেন !

—ভগবান বানিয়েছেন—ছোঃ !—টেনিদা ভেংচি কাটল : ভগবানের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ ছিল না ! ভগবানের হাতের কাজ এত বাজে নয়—তোকে ভূতে বানিয়েছে, বুঝলি ?

—হাঁঃ !—ঝণ্টুরাম আপত্তি করলে না।

এবার ক্যাবলা এগিয়ে এল : তা, এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসে-ছিলি কেন ?

ঝণ্টুরাম কতকগুলো এলোমেলো দাঁত বের করে বললে, কী করব দাদাবাবু—ইস্টিশনে তো যাচ্ছিলম। তা, পথের মধ্যে ভারি নিদ এসে গেল, ভাবলম একটু ঘুমিয়ে নিই। তা ঘুমাচ্ছি তো ঘুমাচ্ছি, শেষে নাকের ভেতর দু-তিনটে মচ্ছর (মশা) ঘুসে গেল। উঠে দেখি, আপনারা আসছেন। আমি আপনাদের কাছে এলম তো আপনারা ডর খেয়ে অ্যায়সা কারবার করলেন—

বলেই, খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ খিঁক্-খিঁক্ করে লোকটা ভুতুড়ে হাসি হাসতে আরম্ভ করে দিলে।

ক্যাবলা বললে, খুব হয়েছে, আর হাসতে হবে না! দাঁত তো নয়—যেন মুলোর দোকান খুলে বসেছে মুখের ভেতর! চল্—চল্ এখন, শিগগির পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ ঝন্টিপাহাড়িতে—

সত্যি, চমৎকার জায়গা এই ঝন্টিপাহাড়ি !

নামটা যতই বিচ্ছিরি হোক—এখানে পা দিলেই গা যেন জুড়িয়ে যায়। তিন দিকে পাহাড়ের গায়ে শাল-পলাশের বন—পলাশ ফুল ফুটে তাতে যেন লাল আগুন জ্বলছে। নানারকমের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে—কত যে রঙের বাহার তাদের গায়ে ! সামনে একটা ঝিল

—তার নীল জল টলমল করছে, দুটো-চারটে কলমি-লতা কাঁপছে, তার ওপর আবার থেকে-থেকে কেউটে সাপের ফণার মতো গলা-তোলা পানকৌড়ি টপাটপ করে ডুব দিচ্ছে তার ভেতর।

ঝিলের কাছেই একটা টিলার ওপর তিন দিকে বনের মাঝখানে মেসোমশায়ের বাংলো। লাল ইটের গাঁথুনি—সবুজ দরজা জানলা—লাল টালির চাল। হঠাৎ মনে হয় এখানেও যেন একরাশ পলাশ ফুল জড়ো হয়ে রয়েছে আর দুটো-চারটে সবুজ পাতা উঁকি দিচ্ছে তাদের ভেতরে।

এমন সুন্দর জায়গা—এমন মিষ্টি হাওয়া—এমন ছবির মতো বাড়ি—এখানে ভূতের ভয়! রাম রাম! হতেই পারে না!

বাংলোর ঘরগুলোও চমৎকার সাজানো। টেবিল, চেয়ার, ডেক-চেয়ার, আয়না, আলনা—কত কী। খাটে মোটা জাজিম। আমরা পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝন্টুরাম দু-খানা ঘরের চারখানা খাটে চমৎকার করে বিছানা পেতে দিলে। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে আমরা আরাম করে বসলুম। ঝন্টুরাম ডিমের ওমলেট আর চা এনে দিলে। তারপর জানতে চাইল: খোকাবাবুরা কী খাবেন দুপুরে? মাছ, না মুরগি?

—মুরগি—মুরগি!—আমরা কোরাসে চিৎকার করে উঠলুম।

টেনিদা একবার উস্ করে জিভের জল টানল: আর হ্যাঁ—চটপট পাকিয়ে ফেলো—বুঝলে? এখন বেলা বারোটা বাজে—পেটে ব্রহ্মা খাই-খাই করছেন। আর বেশি দেরি হলে চেয়ার-টেবিলই খেতে আরম্ভ করব বলে দিচ্ছি!

—হঃ, তুমি তা পারবা। হাবুল সেন টুকে দিলে।

—কী—কী বললি হাবুল?

—না না—আমি কিছু কই নাই।—হাবুল সামলে নিলে, কইতেছিলাম, ঝন্টু খুব তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারব।

ঝণ্টুরাম চলে গেল। টেনিদা বললে, চেহারাটা যাচ্ছেতাই হলে কী হয়—ঝণ্টুরাম লোকটা খুব ভালো—না রে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, যত্ন-আত্তি আছে। রোজ যদি মুরগি-টুরগি খাওয়ায়—সাতদিনে আমরা লাল হয়ে উঠব।

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, আর লাল হয়ে কাজ নেই তোর! পালা-জ্বরে ভুগিস, বাকস পাতার রস দিয়ে কবরেজি বড়ি খাস, তোর এসব বেশি সইবে না। কাল থেকে তোর জন্যে কাঁচকলা আর গাঁদালের ঝোল বরাদ্দ করে দেব। বিদেশে-বিভুঁয়ে এসে যদি পটাৎ করে পটল তুলিস, তাহলে সে ম্যাও সামলাবে কে—শুনি?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না! গাঁদালের ঝোল খেতে বয়ে গেছে আমার! মরি তো মুরগি খেয়েই মরব!

—আর পরজন্মে মুরগি হয়ে জন্মাবি। ডাকবি, কঁর্—কঁর্—কোঁকোর—কোঁ—ইস্টুপিড ক্যাবলাটা বদ-রসিকতা করলে। আমি বেদম চটে বসে বসে নাক চুলকোতে লাগলুম।

খেতে খেতে দুটো বাজল। আহা, ঝণ্টুর রান্না তো নয়—যেন অমৃত! পেটে পড়তে পড়তেই যেন ঘুম জড়িয়ে এল চোখে। রাত্রে ট্রেনের ধকলও লেগেছিল কম নয়—নরম বিছানায় এসে গা ঢালতেই আমাদের মাঝ-রাত্তির।

বিকেলের চা নিয়ে এসে ঝণ্টুরাম যখন আমাদের ডেকে তুলল, পাহাড়ের ওপারে তখন সূর্য ডুবে গেছে। শাল-পলাশের বন কালো হয়ে এসেছে, শিসের মতো রঙ ধরেছে ঝিলের জল। দুপুরবেলা চারিদিকের যে মন-মাতানো রূপ চোখ ভুলিয়েছিল, এখন তা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠেছে ঝোপ-ঝাড় আর বাংলোর পেছনের বন থেকে।

প্ল্যান ছিল ঝিলের ধারে বিকেলে মন খুলে বেড়ানো যাবে, কিন্তু

এখন যেন কেমন ছম-ছম করে উঠল শরীর। মনে পড়ে গেল, কলকাতার পথে পথে—বাড়িতে বাড়িতে এখন ঝলমলে আলো জ্বলে উঠেছে, ভিড় জমেছে সিনেমার সামনে। আর এখানে জমেছে কালো রাত—ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ঝিঁঝির চিৎকার, একটা চাপা আতঙ্কের মতো কী যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে আশেপাশে।

বারান্দায় বসে আমরা গল্প করার চেষ্টা করতে লাগলুম—কিন্তু গল্প ঠিক জমতে চাইল না। ঝণ্টুরাম একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল সামনে, তাইতে চারিদিকের অন্ধকারটা কালো মনে হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত টেনিদা বললে,—আয়, আমরা গান গাই।

ক্যাবলা বললে, সেটা মন্দ নয়। এস—কোরাস ধরি।—বলেই চিৎকার করে আরম্ভ করলে,

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ—

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিনজনে জুড়ে দিলুম। সে কী গান! আমাদের চারজনের গলাই সমান চাঁচাছোলা—টেনিদার তো কথাই নেই। একবার টেনিদা নাকি অ্যায়সা কীর্তন ধরেছিল যে তার প্রথম কলি শুনেই চাটুজ্জেদের পোষা কোকিলটা হার্টফেল করে। আমরা এমনই গান আরম্ভ করে দিলুম যে ঝণ্টুরাম পর্যন্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে ছুটে এল।

আমরা সবাই বোধহয় একটা কথাই ভাবছিলুম। ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোতে যদি ভূত থাকেও, তবু এ-গান তাকে বেশিক্ষণ সইতে হবে না—আপনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে এখান থেকে।

কিন্তু সেই রাত্রে—

আমি আর ক্যাবলা এক ঘরে শুয়েছি—পাশের ঘরে হাবুল সেন আর টেনিদা। একটা লণ্ঠন আমাদের ঘরে মিটমিট করছে, ঘরের

চেয়ার টেবিল আয়নাগুলো কেমন অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। ভয়টা আমার বুকের ভেতর চেপে বসল। অনেকক্ষণ বিছানায় আমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলুম—কান পেতে শুনলুম, টেনিদার নাকে সা রে গা মা-র সাতটা সুর বাজছে। কাচের জানলা দিয়ে দেখলুম বাইরে কালো পাহাড়ের মাথায় একরাশ জ্বলজ্বলে তারা। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি।

হঠাৎ খুট্—খুট্—খটাৎ—খটাৎ—

চমকে জেগে উঠলাম। কে যেন হাঁটছে।

কোথায় ?

এই ঘরের মধ্যেই। যেন পায়ে বুট পরে কে চলে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর।

হাত বাড়িয়ে লণ্ঠন বাড়িয়ে দিলুম। না—ঘরে তো নেই! তবু সেই জুতোর আওয়াজ। কেউ হাঁটছে—নির্ঘাৎ হাঁটছে! ঘুট-ঘুট—খটাৎ-খটাৎ—

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : ক্যাবলা!

ক্যাবলা লাফিয়ে উঠল : কী—কী হয়েছে ?

—কে যেন হাঁটছে ঘরের ভেতর!

কী গোঁয়ার-গোবিন্দ এই পুঁচকে ক্যাবলা! তক্ষুনি তড়াক করে নেমে পড়ল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ইঁদুর তুড়তুড় করে দরজার চৌকাটের গর্ত দিয়ে বাইরে দৌড়ে পালাল।

ক্যাবলা হেসে উঠল।

—তুই কী ভীতু রে প্যালা! একটা পুরোনো ছেঁড়া জুতোর মধ্যে ঢুকে ইঁদুরটা নড়ছিল—তাই এই আওয়াজ। এতেই এত ভয় পেলি!

শুনেই আমি বীরদর্পে বললুম—

—যাঃ—যাঃ—আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি নাকি!—বেশ ডাঁটের মাথায় বললুম, ইঁদুর তো ছার—সাক্ষাৎ ব্রহ্মদত্যি যদি আসে—

কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল আমার। সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে জেগে উঠল এক প্রচণ্ড অমানুষিক আর্তনাদ। সে গলা মানুষের নয়। তার পরেই আর-একটা বিকট অট্টহাসি। সে হাসির কোন তুলনা হয় না। মনে হল পাতালের অন্ধকার থেকে তা উঠে আসছে, আর তার শব্দে ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোটা থর-থর করে কেঁপে উঠছে!

ছয়

রোমাঞ্চকর রাত

সে ভয়ঙ্কর হাসির শব্দটা যখন থামল, তখনো মনে হতে লাগল, ঝন্টিপাহাড়ির ডাকবাংলোটা ভয়ে একটানা কেঁপে চলেছে। আমি বিদ্যুৎবেগে আবার চাদরের তলায় ঢুকে পড়েছি, সাহসী ক্যাবলাও এক লাফে উঠে গেছে তার বিছানায়। আমার হাত পা হিম হয়ে এসেছে—দাঁতে-দাঁতে ঠকঠকানি শুরু হয়েছে। যতদূর বুঝতে পারছি, ক্যাবলার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

প্রায় দশ মিনিট।

তারপর ক্যাবলাই সাহস ফিরে পেল। শুকনো গলায় বললে, ব্যাপার কী রে প্যালা?

চাদরের তলা থেকেই আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত!

ক্যাবলা উঠে বসেছে। আমি চাদরের তলা থেকে মিট-মিট করে ওকে দেখতে লাগলাম।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু কথা হল, ভূত এখানে খামোকা হাসতে যাবে কেন?

—ভুতুড়ে বাড়িতে ভূত হাসবে না তো হাসবে কোথায়? তারও তো হাসবার একটা জায়গা চাই।—আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, তাই বলে মাঝরাতে অমন করে

হাসতে যাবে কেন ? লোকের ঘুম নষ্ট করে অমন বিটকেল আওয়াজ ঝাড়বার মানে কী ?

আমি বললুম, ভূত তো মাঝরাতেই হাসে। নইলে কি দুপুরবেলা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বসে হাসবে নাকি ?

ক্যাবলা বললে, তাই তো উচিত! তাহলে অন্তত ভূতের সঙ্গে একটা মোকাবেলা হয়ে যায়। তা নয়, সময় নেই অসময় নেই, যেন 'হাহা' শব্দরূপ আউড়ে গেল—হাহা-হাহৌ-হাহাঃ! আচ্ছা প্যালা, ভূতদের যখন-তখন এ-রকম যাচ্ছেতাই হাসি পায় কেন বল দিকি ?

আমি চটে গিয়ে বললুম, তার আমি কী জানি! তোর ইচ্ছে হয় ভূতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না।

ক্যাবলা আবার চুপ করে নেমে পড়ল খাট থেকে। বললে, তাই চল্ না প্যালা,—ভূতের চেহারাটা একবার দেখেই আসিগে! সেইসঙ্গে এ-কথাও বলে আসি যে আপাতত এ বাড়িতে চারটি ভদ্রলোকের ছেলে এসে আস্তানা নিয়েছে। এখন রাত দুপুরে ও-রকম বিটকেল হাসি হেসে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত করা নিতান্ত অন্যায়।

বলে কী ক্যাবলা! আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

—ক্ষেপেছিস নাকি তুই ?

—ক্ষেপব কেন ?—বুকের পাটা আছে বটে ক্যাবলার! একটুখানি হেসে বললে, আমার কী মনে হয়, জানিস ? ভূতও মানুষকে ভয় পায়।

—কী বকছিস যা-তা ?

—ভয় পায় না তো কী! নইলে কলকাতায় ভূত আসে না কেন ? দিনের বেলায় তাদের ভুতুড়ে টিকির একটা চুলও দেখা যায় না কেন ? বাইরে বসে বসে হাসে কেন ? ঘরে ঢুকতে ভূতের সাহস নেই কেন ?

আমি আঁতকে উঠে বললুম, রাম—রাম! ও-সব কথা মুখেও

আনিস নি ক্যাবলা! হাসির নমুনাটা একবার শুনলি তো? এখুনি হয়ত ত্বটো কাটা মুণ্ডু ঘরে ঢুকে নাচতে শুরু করে দেবে!

ক্যাবলাটা কী ডেঞ্জারাস ছেলে! পটাং করে বলে ফেলল—তা নাচুক না। কাটা মুণ্ডুর নাচ আমি কখনো দেখিনি, বেশ মজা লাগবে! আচ্ছা—আমি ওয়ান-টু-থ্রি বলছি। ভূতের যদি সাহস থাকে, তাহলে থ্রি বলবার মধ্যেই এই ঘরে ঢুকে নাচতে আরম্ভ করবে। আই চ্যালেঞ্জ ভূত! ওয়ান—টু—

কী সর্বনাশ! করছে কী ক্যাবলা! ভূতের সঙ্গে চালাকি! ওরা যে পেটের কথা শুনতে পায়! ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে আমি চাদরের তলায় মুখ লুকোলুম। এইবার এল—নির্ঘাৎ এল—

ক্যাবলা বললে—থ্রি!

চাদরের তলায় আমি পাথর হয়ে পড়ে আছি। একেবারে নট-নড়ন-চড়ন ঠকাস মার্বেল। এক্ষুনি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে! এল—এল—ঐ এসে পড়ল—

কিন্তু কিছুই হল না। ভূতেরা ক্যাবলার মতো নাবালককে গ্রাহ্যই করল না বোধহয়।

ক্যাবলা বললে, দেখলি তো! চ্যালেঞ্জ করলুম—তবু আসতে সাহস পেল না। চল—এক কাজ করি। টেনিদা আর হাবুল সেনও নিশ্চয়ই জেগেছে এতক্ষণে। আমরা চারজনে মিলে ভূতদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ভয়ে আমার দম আটকে গেল।

—ক্যাবলা, তুই নির্ঘাৎ মারা যাবি!

ক্যাবলা কর্ণপাত করল না। সোজা এসে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলে।

—ওঠ—

আমি প্রাণপণে চাদর টেনে বিছানা আঁকড়ে রইলুম।

—কী পাগলামি হচ্ছে ক্যাবলা! যা, শুয়ে পড়্—

ক্যাবলা নাছোড়বান্দা। ওর ঘাড়ে ভূতই চেপে বসেছে না কি কে জানে! আমাকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে বললে, ওঠ্ বলছি! ভূতে মাঝরাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে আর আমরা চুপটি করে সয়ে যাব! সে হতেই পারে না! ওঠ—ওঠ—শিগগির—

এমন করে টানতে লাগল যে চাদর-বিছানা শুদ্ধু আমাকে ধপাৎ করে মেঝেতে ফেলে দিলে।

—এই ক্যাবলা, কী হচ্ছে?

ক্যাবলা কোন কথা শোনবার পাত্রই নয়। টেনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। বললে, চল্ দেখি, পাশের ঘরে টেনিদা আর হাবুল কী করছে!

বলে লণ্ঠনটা তুলে নিলে।

অগত্যা রাম-রাম দুর্গা-দুর্গা বলে আমি ক্যাবলার সঙ্গেই চললুম। ও যদি লণ্ঠন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—তাহলে এক সেকেণ্ডও আর আমি ঘরে থাকতে পারব না! দাঁতে দাঁতে লেগে যাবে, অজ্ঞান হয়ে যাব—হয়ত মরেও যেতে পারি। এমনিতেই তো আমার পালাজ্বরের পিলেটা থেকে-থেকে কেমন গুরগুরিয়ে উঠছে।

পাশের দরজাটা খোলাই ছিল। ওদের ঘরে ঢুকেই ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল : একি, ওরা গেল কোথায়?

তাই তো—কেউ নেই! দুটো বিছানাই খালি! না টেনিদা—না হাবুল। অথচ দুটো ঘরের মাঝের দরজা ছাড়া আর সমস্ত জানলা-দরজাই বন্ধ। আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া ওদের তো আর বেরুবার পথ নেই!

ক্যাবলা বললে, গেল কোথায় বল্ দিকি!

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, নির্ঘাৎ ভূতে ভ্যানিশ করে দিয়েছে! এতক্ষণে ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে ফেলেছে ওদের!

এতক্ষণে বোধহয় ক্যাবলার খটকা লেগে গিয়েছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, তাই তো রে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব! দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!

আর ঠিক তক্ষুনি—

ক্যাঁক-ক্যাঁক করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। যেন ঘরের মধ্যে সাপে ব্যাঙ ধরেছে কোথাও। ক্যাবলা চমকে একটা লাফ মারল, একটুর জন্যে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল হাতের লণ্ঠনটা। আর আমিও তিড়িং করে একেবারে টেনিদার বিছানায় চড়ে বসলুম।

আবার সেই ক্যাঁক-ক্যাঁক-কোঁক!

নির্ঘাৎ ভূতের আওয়াজ! আমার পালাজ্বরের পিলেতে প্রায় ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবছি এবার একটা যাচ্ছেতাই ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে যাবে, ঠিক এই সময় হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে ক্যাবলা হা-হা করে হেসে উঠল।

চমকে তাকিয়ে দেখি, লণ্ঠনটা নিয়ে হাবুলের খাটের তলায় ঝুঁকে রয়েছে ক্যাবলা। তেমনি বেয়াড়াভাবে হাসতে হাসতে বললে, ছ্যাখ প্যালা আমাদের লীডার টেনিদা আর হাবুলের কাণ্ড! ভূতের ভয়ে এ-ওকে জাপটে ধরে খাটের তলায় বসে আছে!

বলেই ক্যাবলা দস্তুরমত অট্টহাসি করতে শুরু করলে।

খাটের তলা থেকে টেনিদা আর হাবুল গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল। দুজনেরই নাকে-মুখে ধুলো আর মাকড়সার ঝুল। টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর হাবুল সেনের চোখদুটো ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে প্রায় আকাশে চড়ে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, এই বীরত্ব তোমার! তুমি আমাদের দলপতি—আমাদের পটলডাঙার হীরো—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ান—

টেনিদা তখন সামলে নিয়েছে। নাক থেকে ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, থাম্ থাম্, মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি! আমরা খাটের তলায় ঢুকেছিলুম একটা মতলব নিয়ে।

হাবুলের কাঁধের ওপর একটা আরশোলা হাঁটছিল। হাবুল টোকা মেরে সেটাকে দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে বলল. হ—হ, আমাগো একটা মতলব আছিল!

ক্যাবলা বললে, শুনি না—কেয়া মতলব সেটা! বাৎলাও।—ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, কথায় কথায় ওর রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে পড়ে দু-একটা।

টেনিদা তখন সাহস পেয়ে জুত করে বিছানার ওপর উঠে বসেছে। বেশ ডাঁটের মাথায় বললে, বুঝলি না? আমরা খাটের তলায় বসে ওয়াচ করছিলুম। যদি একটা ভূত-টুত ঘরের মধ্যে ঢোকে—

হাবুল টেনিদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, তখন দুইজনে মিল্যা ভূতের পা ধইর্যা একটা হ্যাঁচকা টান মারুম—আর ভূতে—

টেনিদা বললে, একদম ফ্ল্যাট!

ক্যাবলা খিক্-খিক্ করে হাসতে লাগল।

টেনিদা চটে গিয়ে বললে, অমন করে হাসছিস যে ক্যাবলা? জানিস ওতে আমার ইনসাল্ট হচ্ছে? টেক কেয়ার! গুরুজনকে যদি অমন করে তুরুশ্চু করবি, তাহলে চটে গিয়ে এমন একখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব—

টেনিদা বোধহয় ক্যাবলার নাকে একটা মুগ্ধবোধ বসাবার কথাই ভাবছিল, সেই সময় আবার একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটল।

পাশের জানলাটার কাঁচে ঝন্-ঝন্ করে শব্দ হল একটা। কতকগুলো ভাঙা কাঁচ ছটকে পড়ল চারদিকে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে শাদা বলের মতো কী একটা ঠিকরে পড়ল এসে—একেবারে ক্যাবলার পায়ের কাছে গড়িয়ে এল।

আর লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখলুম—ওটা আর কিছু নয়, স্রেফ মড়ার মাথার খুলি।

—ওরে দাদা!

আমি মেঝেতে ফ্ল্যাট হলুম সঙ্গে সঙ্গেই। হাবুল আর টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আবার খাটের তলায় অদৃশ্য হল। শুধু লণ্ঠন হাতে করে ক্যাবলা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—শুয়ে পড়ল না, বসেও পড়ল না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পৈশাচিক অট্টহাসি উঠল। সেই হাসির সঙ্গে থর-থর করে কাঁপতে লাগল ঝন্টিপাহাড়ির ডাক-বাংলো।

সাত

কে তুমি হাস্যময়?

বাকি রাতটা যে আমাদের কী ভাবে কাটল, সে আর খুলে না বললেও চলে।

টেনিদা আর হাবুল সেনের কী হল জানি না—আমি তো ঠায় অজ্ঞান! তার মধ্যেই মনে হচ্ছিল, দুটো তাল গাছের মতো পেল্লায় ভূত আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। একজন যেন বলছে: এটাকে কালিয়া রান্না করে খাব, আর-একজন বলছে: দূর—দূর! এটা একেবারে শুঁটকো চামচিকের মতো—গায়ে একরত্তি মাংস নেই! বরং এটাকে তেজপাতার মতো ডালে সম্বরা দেওয়া যেতে পারে।

আমি বোধহয় ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিলুম, হঠাৎ তিড়িক করে লাফিয়ে উঠতে হল। মুখের ওপর কে যেন আঁজলা-আঁজলা করে জল দিচ্ছে। আর, কী ঠাণ্ডা সে জল! বাঘের নাকে সে জল ছিটিয়ে দিলে বাঘ-শুদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়বে!

বাঘ অজ্ঞান হোক—কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে এল, মানে, আসতেই হল তাকে।

আর কে? ক্যাবলা। করেছে কী—বাগানে জল দেবার একটা

ঝাঁঝরি নিয়ে এসেছে, তার তাই দিয়ে আমাকে স্রেফ চান করিয়ে দিচ্ছে।

—ওরে থাম থাম—

ক্যাবলা কি থামে! আমার মুখের ওপর আবার একরাশ জল ছিটিয়ে দিয়ে বললে, কিরে, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

—ঠাণ্ডা মানে? সারা গা ঠাণ্ডা হবার জো হল—আমি তড়াক করে ঝাঁঝরির আক্রমণ থেকে পাশ কাটালুম।

কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। ঝন্টি-পাহাড়ি ডাক-বাংলোয় একটা দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়ে গেছে। সামনে লেকের নীল জলটার ওপর ভোরের ললেচে রং। পাখির মিষ্টি ডাক শুরু হয়েছে চারদিকে—শিশিরে ভেজা শাল-পলাশের বন যেন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছতে মুছতে আমার মনে হল, এমন সুন্দর জায়গায় এমন বিচ্ছিরি ভূতের ব্যাপার না থাকলে দুনিয়ায় কার কী ক্ষতি হত!

আমি তো এ-সব ভাবছি, ওদিকে ক্যাবলার ঝাঁঝরি সমানে কাজ করে চলেছে। খানিক পরে হাঁই-মাই কাঁই-কাঁই আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, ঝাঁঝরির আক্রমণে জর্জরিত হয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে টেনিদা আর হাবুল।

ক্যাবলা হেসে বললে, তোমাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে কেমন দাওয়াইটি বের করেছি! দেখলে তো!

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, থাম, বকিসনি! আমরা অজ্ঞান হয়েছিলুম কে বললে তোকে? দুজন চুপি-চুপি প্ল্যান আঁটছিলুম, আর তুই রাস্কেল ঠাণ্ডা জল দিয়ে—

বলেই টেনিদা ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে। বললে, ইঃ গেছি—গেছি! এই শীতের সকালে যেভাবে নাইয়ে দিয়েছিস, তাতে এখন ডবল-নিউমোনিয়া না হলে বাঁচি!

ঝণ্টুরামকে জিজ্ঞেস করে কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

সে ডাক-বাংলোয় থাকে না। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে তার বাড়ি। আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সকালবেলায় এসেছে!

টেনিদা বললে, ওটা কোনো কম্মের নয়—একেবারে গাড়োল!

হাবুল সেন মাথা চুলকে বললে, ও নিজেই ভূত কি না সেই কথাটাই বা কেডা কইব? চেহারাখানা দেখতে আছ না? য্যান তালগাছের থন নাইম্যা আসছে।

আমি আঁৎকে উঠলাম: সত্যিই কি ভূত নাকি?

টেনিদা বললে, তোরা ছুটোই হচ্ছিস গোভূত! জানিস নে, ভূত আগুন দেখলেই পালায়? ও ব্যাটা নিজে উনুন ধরিয়ে চা করে দিলে, রাত্তিরে ওর রান্না মুরগির ঝোল আর ভাত ছু-হাতে সাঁটলি, সে কথা মনে নেই বুঝি?

আমরা আর সাঁটতে পেরেছি কই—মুরগির ছু-এক টুকরো হাড় কেবল চুষতে পেরেছি, বাকি সবটাই টেনিদার পেটে গেছে। কিন্তু এখন আর সে কথা বলে কী হবে!

আমি বললুম, ঝণ্টুরাম ভূত হোক আর না-ই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। সোজা কথা হচ্ছে, পটোল যদি তুলতেই হয়, তাহলে পটলডাঙাতে গিয়েই তুলব। এখানে ভূতের হাতে মরতে আমি রাজি নই। আমি আজকেই কলকাতায় ফিরে যাব।

হাবুল উৎসাহিত হয়ে বললে, হ—হ, আমিও সেই কথাই কইতে আছিলাম।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটা চুলকোতে লাগল।

আমি বললুম, তোমাদের ইচ্ছে হয় থাক। ভূতেরা ধরে ধরে তোমাদের হাঁড়ি-কাবাব করে খাক—কাটলেট বানাক, রোস্ট করে ফেলুক—আমার কিছুই আপত্তি নেই। আজই আমি পালাব।

টেনিদা বললে, তাই তো! কিন্তু জায়গাটা খাসা—বেশ প্রেমসে খাওয়া-দাওয়াও করা যাচ্ছিল, কিন্তু ভূতগুলোই সব মাটি করে দিলে!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, সইত্য কথা। এইখানে জঙ্গলের মধ্যে থাইক্যা ভূতগুলানের কী যে সুখ হয়—তাও তো বুঝি না। আমাগো কইলকাতায় গিয়া বাসা করত, থাকতও ভালো, আমরাও ছুটি পাইতাম। আর যদি বাইছ্যা বাইছ্যা হেড পণ্ডিতের ঘাড়ে উইঠ্যা বসত, তাইলে আমাগো আর শব্দরূপ মুখস্থ করতে হইত না!

—সে তো বেশ ভালো কথা, কিন্তু ভূতগুলোকে সে-কথা বোঝায় কে!

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: যেতে চাস তো চল্। কিন্তু সত্যি, ভারি মায়া লাগছে রে! এমন আরাম, এমন খাওয়া-দাওয়া, ঝণ্টেটা আবার রুটির সঙ্গে কতটা করে মাখন দিয়েছিল—দেখেছিস তো? এখানে দিনকয়েক থাকলে আমরা লাল হয়ে যেতুম।

আমি বললাম, তার আগে ভূতেরাই লাল হয়ে যাবে।

টেনিদা সামনে থেকে একটা প্লেট তুলে নিয়ে তার তলায় লেগে-থাকা একটুখানি মাখন চট করে চেটে নিলে। তারপরে আর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

—তাহলে আজই?

আমি আর হাবুল সমস্বরে বললাম, হ্যাঁ—হ্যাঁ, আজই।

ক্যাবলার কথা এতক্ষণ আমাদের মনেই ছিল না। সেই যে ভোরবেলা ঝাঁঝরি-দাওয়াই দিয়ে আমাদের জ্ঞান ফিরিয়েছে, তার পর আর তার পাত্তা নেই। কোথায় গেল ক্যাবলা?

আমি বললাম, ক্যাবলা গেল কোথায়?

টেনিদা চমকে বললে, তাই তো! সকাল থেকে তো ক্যাবলাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

হাবুল সেন জানতে চাইল : ভূতের সঙ্গে মস্করা করতে আছিল, ভূতে তারে লইয়া যায় নাই তো ?

টেনিদা মুখ-টুক কুঁচকে বললে, বয়ে গেছে ভূতের ! ওটা যা অখাদ্যি—ওকে ভূতেও হজম করতে পারবে না। কিন্তু গেল কোথায় ? আমাদের ফেলেই চম্পট দিলে না তো ?

ঠিক এই সময় হঠাৎ বাজখাঁই গলায় গান উঠল ঃ

ছপ্পর পর কৌয়া নাচে নাচে বগুলা—

আরে রামা হো—হো রামা—

গানটা এমন বেখাপ্পা যে আমি চেয়ারশুদ্ধ উলটে পড়তে পড়তে সামলে গেলুম। এ আবার কী রে বাবা ! দিন-দুপুরে এসে হানা দিলে নাকি ! কিন্তু ভূতে রাত নাম করতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

ভূত নয়—ক্যাবলা। কোত্থেকে একগাল হাসি নিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল।

—গিয়েছিলি কোথায় ? অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিসই বা কেন ?—টেনিদা জানতে চাইলে।

—বলছি—ক্যাবলা করুণ চোখে সামনের পেয়ালা-পিরিচগুলোর দিকে তাকালো : এর মধ্যেই ব্রেকফাস্ট শেষ ? আমার জন্যেই কিছু নেই বুঝি ?

—সে আমরা জানিনে, ঝণ্টুরাম বলতে পারে।—টেনিদা বললে, ব্রেকফাস্ট পরে করবি, কোথায় গিয়েছিলি তাই বল্।

ক্যাবলা মিটমিট করে হেসে বললে, ভূতের খোঁজে গিয়েছিলুম। ভূত পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল একঠোঙা চিনেবাদাম।

—চিনেবাদাম !

ক্যাবলা বললে, তাতে অর্ধেক খোসা, অর্ধেক বাদাম। মানে অর্ধেকটা খাওয়ার পরে আর সময় পায়নি।

—কে সময় পায়নি ?—আমি বেকুবের মতো জিজ্ঞেস করলুম।

—জানলার ওধারে ঝোপের ভেতরে বসে যারা মড়ার মাথা ছুড়েছিল, তারাই। যদি ভূতও হয়—তাহলে কিন্তু বেশ মডার্ন ভূত, টেনিদা! মানে—বাদাম খায়, মুড়ি খায়, তেলেভাজাও খায়। তেলে-ভাজার শালপাতা আর মুড়িও পাওয়া গেল কিনা!

টেনিদা বললে, তার মানে—

ক্যাবলা বললে, তার মানে হল, এসব কোনো বদমাস আদমি কা কারসাজি! তারাই রাত্তিরে অমনি করে যাচ্ছেতাই-রকম হেসেছে, ঘরের ভেতরে মড়ার মাথা ফেলেছে—অর্থাৎ আমাদের তাড়ানোর মতলব। তুমি পটলডাঙার টেনিদা—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ান—তুমি এ-সব বদমায়েসদের ভয়ে পালাবে এখান থেকে!

—ঠিক জানিস? ভূত নয়?

—ঠিক জানি।—ক্যাবলা বললে, ভূতে তেলেভাজা আর চিনে-বাদাম খায়, একথা কে কবে শুনেছে? তার ওপর তারা বিড়িও খেয়েছে। দু-চারটে পোড়া বিড়ির টুকরোও ছিল।

—তাহলে বদমাস লোক!—পটলডাঙার টেনিদা হঠাৎ বুক ঠুকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল : মানুষ যদি হয়, তবে বাবাজিদের এবার ঘুঘু আর ফাঁদ দুই-ই দেখিয়ে ছাড়ব! চলে আয় সব—কুইক মার্চ—

বলে এমনিভাবে আমাকে একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে আমি ছিটকে সামনের মেঝেয় গিয়ে পড়লুম।

হাবুল সেন প্যাঁচার মতো ব্যাজার মুখে বললে, কোথায় যেতে হবে?

—লোকগুলোর সঙ্গে এইবার মোলাকাত করতে। আমরা কলকাতার ছেলে—আমাদের বক দেখিয়ে কেটে পড়বে—ইয়ার্কি নাকি! চল—চল, ভালো করে একবার চারদিকটা ঘুরে দেখি!

ক্যাবলা বললে, কিন্তু আমার ব্রেকফাস্ট—

—সেটা একেবারে লাঞ্চের সময়েই হবে। নে—চল—

হাবুল আর ক্যাবলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। স্পষ্ট দিনের আলোয়—সেই বেলা আটটার সময় —ঠিক আমাদের মাথার ওপর কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল: বাঃ—বেশ, বেশ!

তারপরেই হা-হা করে ঠাট্টার অট্টহাসি!

কে বললে? কে হাসল? কেউ না। মাথার ওপরে টালির চাল আর লাল ইটের ফাঁকা দেওয়াল—জন-মানুষের চিহ্নও নেই কোথাও। যেন হাওয়ার মধ্যে থেকে ভেসে এসেছে আশ্চর্য শব্দগুলো।

আট

"ছপ্পর পর কৌয়া নাচে"

রাত নয়—অন্ধকার নয়—একেবারে ফুটফুটে দিনের আলোয়। দেওয়ালের ওপরে টালির চাল—একটা চড়ুই পাখি পর্যন্ত বসে নেই সেখানে। অথচ ঠিক মনে হল ঐ টালির চাল ফুঁড়েই হাসির আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

কী করে হয়? কী করে এমন সম্ভব?

আমরা কি পাগল হয়ে গেছি? না কি ঝণ্টুরাম চায়ের সঙ্গে সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়ে দিলে? তাই বা হবে কেমন করে? ক্যাবলা তো চা খায়নি আমাদের সঙ্গে! তবু সেও ওই অশরীরী হাসির আওয়াজটা ঠিক শুনতে পেয়েছে।

প্রায় চার মিনিট ধরে আমরা চার মূর্তি চারটে লাট্টুর মতো বসে রইলুম। আমরা অবশ্য লাট্টুর মতো ঘুরছিলুম না—কিন্তু মগজের সব ঘিলুগুলো ঝনর-ঝনর করে পাক খাচ্ছিল। খাসা ছিলুম পটলডাঙায়, পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খেয়ে দিব্যি দিন কাটছিল। কিন্তু টেনিদার প্যাঁচে পড়ে এই ঝন্টিপাহাড়ে এসে দেখছি ভূতের কিল খেয়েই প্রাণটা যাবে!

আরো তিন মিনিট পরে যখন আমার পিলের কাঁপুনি খানিক বন্ধ হল, আমি ক্যাবলাকে বললুম, এবার ?

হাবুল সেন গোঁড়া লেবুর মতো চোখদুটোকে একবার চালের দিকে ঘুলিয়ে এনে বললে, হ, অখন কও !

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মতো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল। জিভ দিয়ে একবার মুখ-টুখ চেটে টেনিদা বললে, মানে—ইয়ে হল, মানুষ-টানুষ সামনে পেলে চাঁটির চোটে তার নাক-টাক উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু ইয়ে—মানে, ভূতের সঙ্গে তো ঠিক পারা যাবে না—

আমি বললুম, তা ছাড়া ভূতেরা ঠিক বক্সিংয়ের নিয়ম-টিয়মও মানে না—

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, তুই থাম না পুঁটিমাছ !

পুঁটিমাছ বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। যদি ভূতের ভয় আমাকে বেজায় কাবু করে না ফেলত আর পালা-জ্বরের পিলেটা টনটনিয়ে না উঠত, আমি ঠিক টেনিদাকে পোনামাছ নাম দিয়ে দিতুম।

ক্যাবলা কিন্তু ভাঙে তবু মচকায় না।

চট করে সে একেবারে সামনের লনে গিয়ে নামল। তারপর মাথা উঁচু করে সে দেখতে লাগল। তারও পরে সে বেজায় খুশি হয়ে বললে, ঠিক ধরেছি। ঐ যে বলছিলুম না ?

'ছপ্পর পর কৌয়া নাচে
নাচে বগুলা—'

টেনিদা বললে, মানে ?

ক্যাবলা বললে, মানে ? মানে হল, চালের ওপর কাক নাচে—আর নাচে বক।

—রাখ তোর বক নিয়ে বকবকানি ! কী হয়েছে বল দিকি !

—হবে আর কী। একেবারে ওয়াটারের মতো—মানে পানিকা

মাফিক সোজা ব্যাপার। ঐ চালের ওপরে লোক বসেছিল কেউ। সে-ই ওরকম বিটকেল হাসি হেসে আমাদের ভয় দেখিয়েছে।

—সে লোক গেল কোথায় ?

—আঃ, নেমে এস না—দেখাচ্ছি সব। আরে ভয় কী—নাহয় রাম-রাম জপ করতে করতেই চলে এস এখানে।

—ভয়! ভয় আবার কে পেয়েছে?—টেনিদা শুকনো মুখে বললে, পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছে কিনা—

ক্যাবলা খিক্-খিক্ করে হাসতে লাগল।

—ভূতের ভয়ে বহুত আদমির অমন করে ঝিঁঝি ধরে। ও আমি অনেক দেখছি।

এর পরে বসে থাকলে আর দলপতির মান থাকে না। টেনিদা ডিম-ভাজার মতো মুখ করে আস্তে-আস্তে লনে নেমে গেল। অগত্যা আমি আর হাবুলও গুটি-গুটি গেলাম টেনিদার পেছনে পেছনে।

ক্যাবলা বললে, পেছনে ঐ ঝাঁকড়া পিপুল গাছটা দেখছ? আর দেখছ—ওর একটা মোটা ডাল কেমনভাবে বাংলোর চালের ওপর নেমে এসেছে? ঐ ডাল ধরে একটা লোক চালের ওপর নেমে এসেছিল। টালিতে কান পেতে আমাদের কথাগুলো শুনেছে, আর হা-হা করে হেসে ভয় দেখিয়ে ঐ ডাল বেয়ে সটকে পড়েছে।

হাবুল আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল: হ, এইটা নেহাত মন্দ কথা কয় নাই। ছাখতে আছ না, চালের উপর কতকগুলো কাঁচা পাতা পইড়্যা রইছে? কেউ ঐ ডাল বাইয়া আসছিল ঠিকোই।

—আসছিল তো ঠিকোই—হাবুলের গলা নকল করে টেনিদা বললে, কিন্তু এর মধ্যেই সে গেল কোথায়!

ক্যাবলা বললে, কোথাও কাছাকাছি ওদের একটা আড্ডা আছে নিশ্চয়। মুড়ি আর চিনেবাদাম দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। সেই আড্ডাটাই খুঁজে বের করতে হবে। রাজি আছ?

টেনিদা নাক চুলকে বললে, মানে কথা হল—

ক্যাবলা আবার খিক্‌-খিক্‌ করে হেসে উঠল : মানে কথা হল, তোমার সাহস নেই—এই তো ? বেশ, তোমরা না যাও আমি একাই যাচ্ছি।

দলপতির মান রাখতে প্রায় প্রাণ নিয়ে টান পড়বার জো! টেনিদা শুকনো হাসি হেসে বললে, যাঃ—যাঃ—বাজে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি! মানে, সঙ্গে দু-একটা বন্দুক-পিস্তল যদি থাকত—

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, বন্দুক-পিস্তল থাকলেই বা কী হত! কখনো ছুড়েছি নাকি ওসব! আর টেনিদার হাতে বন্দুক থাকা মানেই আমরা স্রেফ খরচের খাতায়। ভূত-টুত মারবার আগে টেনিদা আমাদেরই শিকার করে বসত।

ক্যাবলা বলল, বন্দুক দিয়ে কী হবে ? তুমি তো এক-এক চড়ে গড়ের মাঠের এক একটা গোরাকে শুইয়ে দিয়েছ শুনতে পাই। বন্দুকে তোমার মতো বীর পুরুষের কী দরকার ?

অন্য সময় হলে টেনিদা খুশি হত, কিন্তু এখন ওর ডিম-ভাজার মতো মুখটা প্রায় আলু-কাবলির মতো হয়ে গেল। টেনিদা হতাশ হয়ে বললে, আচ্ছা—চল দেখি একবার।

ক্যাবলা ভরসা দিয়ে বললে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না টেনিদা! এসব নিশ্চয় দুষ্টু লোকের কারসাজি। আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে এতে ভেবড়ে যাব ? ওদের জারিজুরি ভেঙে দিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব এই বলে দিলাম।

হাবুল ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : হ! কার জারিজুরি যে কেডা ভাঙব, সেইটাই ভালো বোঝা যাইতে আছে না!

কিন্তু ক্যাবলা এর মধ্যেই বীরদর্পে পা বাড়িয়েছে। টেনিদা মানের দায়ে চলেছে পেছনে পেছনে। হাবুলও শেষ পর্যন্ত এগোল সুড়সুড় করে। আমি পালাজ্বরের রুগী প্যালারাম, আমার ওসব

ধাষ্টামোর মধ্যে এগোনোর মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তবু একা-একা এই বাংলোয় বসে থাকব—ওরেঃ বাবা! আবার যদি সেই ঘর-ফাটানো হাসি শুনতে পাই—তাহলে আমাকে আর দেখতে হবে না! বাংলোতে হতভাগা ঝণ্টুরামটা থাকলেও কথা ছিল, কিন্তু আমাদের খাওয়ার বহর দেখে চা খাইয়ে সামনের গাঁয়ে মুরগি কিনতে ছুটেছে। একা-একা এখানে ভূতের খপ্পরে বসে থাকব, এমন বান্দাই আমি নই।

কোথায় আর খুঁজব—কীই বা পাওয়া যাবে!

তবু চারজনে চলেছি। বাংলোর পেছনেই একটা জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। জঙ্গলটা যে খুব উঁচু তা নয়—কোথাও মাথা-সমান, কোথাও আর একটু বেশি। বেঁটে বেঁটে শাল পলাশের গাছ—কখনো কখনো ঘেঁটু আর আকন্দের ঝোপ। মাঝখান দিয়ে বেশ একটা পায়ে-চলা পথ এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। এ-পথ দিয়ে কারা যে হাঁটে—তা কে জানে! তাদের পায়ের পাতা সামনে না পেছন দিকে, তাই বা কে বলবে!

প্রথম-প্রথম বুক দুর্-দুর্ করছিল। খালি মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি ঝোপের ভেতর থেকে হয় একটা কন্ধকাটা, নইলে শাঁকচুন্নি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই হল না। দুটো-চারটে বুনো ফল—পাখির ডাক আর সূর্যের মিষ্টি নরম আলোয় খানিক পরেই ভয়-ডর মন থেকে কোথায় মুছে গেল।

গোড়ার দিকে বেশ হুঁশিয়ার হয়েই হাঁটছিলুম—যাচ্ছিলুম ক্যাবলার পাশাপাশি। তারপর দেখি একটা বৈঁচি গাছ—ইয়া-ইয়া বৈঁচি পেকে কালো হয়ে রয়েছে। একটা ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখি—অমৃত! তারপরে আরো একটা—তারপরে আরো একটা—

গোটা-পঞ্চাশেক খেয়ে খেয়াল হল, ওরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গ ধরতে যাব—হঠাৎ দেখি আমার পাশেই ঝোপের মধ্যে—

লম্বা শাদা মতো কী ওটা? নির্ঘাত ল্যাজ! কাঠবেড়ালির ল্যাজ!

কাঠবেড়ালি বড় ভালো জিনিস। ভণ্টার মামা কোত্থেকে একবার একটা এনেছিল, সেটা তার কাঁধের ওপর চড়ে বেড়াত, জামার পকেটে শুয়ে থাকত। ভারি পোষ মানে। সেই থেকে আমারও কাঠবেড়ালি ধরবার বড় শখ। ধরি না খপ করে ওর ল্যাজটা চেপে!

যেন ওদিকে তাকাচ্ছিই না—এমনিভাবে গুটি-গুটি এগিয়ে টক্ করে কাঠবেড়ালির ল্যাজটা আমি ধরে ফেললুম। তারপরেই হেঁইয়ো টান!

কিন্তু কোথায় কাঠবেড়ালি! যেই টান দিয়েছি, অমনি হাঁই-মাই করে একটা বিকট দানবীয় চিৎকার। সে চিৎকারে আমার কানে তালা লেগে গেল। তারপরেই কোথা থেকে আমার গালে এক বিরাশি সিক্কার চড়। ভৌতিক চড়।

সেই চড় খেয়ে আমি শুধু শর্ষের ফুলই দেখলুম না। শর্ষে, কলাই, মটর, মুগ, পাট, আম, কাঁঠাল—সব-কিছুর ফুলই একসঙ্গে দেখতে পেলুম। তারপরেই—

সেই ঝোপের ভেতরে সোজা চিত। একেবারে পতন ও মূর্ছা। মরেই গেলুম কি না কে জানে!

নয়

—'কাঠবেড়ালির ল্যাজ নয় রে
ওটা কাহার দাড়ি!

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি, আমি ডাক-বাংলোর খাটে লম্বা হয়ে আছি। ঝণ্টু মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় হাওয়া করছে, ক্যাবলা পায়ের কাছে বসে মিটমিটে চোখে তাকিয়ে আছে আর পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে টেনিদা ঘুঘুর মতো বসে রয়েছে।

ঝাঁটুর হাতের পাখাটা খটাস করে আমার নাকে এসে লাগতেই আমি বললুম, উফ্ !

চেয়ার ছেড়ে টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : যাক, তাহলে এখনো তুই মারা যাসনি !

ক্যাবলা বললে, মারা যাবে কেন ? থোড়াসে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলেইছিলুম টেনিদা, ওর নাকে একটুখানি লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া দাও—এক্ষুনি চাঙা হয়ে উঠবে।

টেনিদা বললে, আর লঙ্কা-পোড়া ! যেমনভাবে দাঁত ছরকুটে পড়ে ছিল, দেখে তো মনে হচ্ছিল, পটলডাঙা থেকে এখানে এসেই বুঝি শেষ পর্যন্ত পটোল তুলল।

মাঝখান থেকে ঝাঁটু বিচ্ছিরি রকমের আওয়াজ করে হেসে বললে, দাদাবাবু ডর খিয়েছিলেন !

ক্যাবলা বললে, যা-যাঃ, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না ! এখন শিগগির এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে আয় দেখি !

ঝাঁটু পাখা রেখে বেরিয়ে গেল।

আমি তখনো চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছি। ডান চোয়ালে অসম্ভব ব্যথা। এমন চড় হাঁকড়েছে যে, গোটাদুয়েক দাঁত বোধহয় নড়িয়েই দিয়েছে একেবারে। চড়ের মতো চড় একখানা ! অঙ্কের মাস্টারের বিরাশি সিক্কার চাঁটি পর্যন্ত এর কাছে একেবারে সুগন্ধি তিন নং পরিমল নস্যি। আমি পটলডাঙার রোগা ডিগডিগে প্যালারাম, পালা জ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খাই, এমন একখানা ভৌতিক চপেটাঘাতের পরেও আমার আত্মারাম কেন যে খাঁচাছাড়া হয় নি, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিলুম না।

টেনিদা বললে, আচ্ছা পুঁটিমাছ, তুই হঠাৎ ডাক ছেড়ে অমন করে অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন ?

এ অবস্থাতেও পুঁটিমাছ শুনে আমার ভয়ানক রাগ হল,

চোয়ালের ব্যথা-ট্যথা সব ভুলে গেলুম। ব্যাজার হয়ে বললুম, আমি পুঁটিমাছ আছি বেশ আছি, কিন্তু ওরকম একখানা বোম্বাই চড় খেলে তুমি ভেটকিমাছ হয়ে যেতে! কিংবা ট্যাপামাছ!

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, চাঁটি আবার তোকে কে মারলে?

—ভূত!

টেনিদা বললে, ভূত! ভূতের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই খামোকা তোকে চাঁটি মারতে গেল? তাও সকালবেলায়? পাগল না পেট-খারাপ?

ক্যাবলা বললে, পেট-খারাপ। এদিকে ঐ তো রোগা ডিগডিগে চেহারা, ওদিকে পৌঁছে অবধি সমানে মুরগি আর আণ্ডা চালাচ্ছে। অত সইবে কেন? পেট-গরম হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ভূত-টুত সব বোগাস।

টেনিদা সঙ্গে-সঙ্গে সায় দিলে, ঠিক। আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম।

ডান চোয়ালটা চেপে ধরে আমি এবার বিছানার ওপরে উঠে বসলুম।

—তোমরা বিশ্বাস করছ না?

টেনিদা বললে, একদম না। ভূতে আর চাঁটি মারবার লোক পেলে না!

ক্যাবলা মাথা নাড়ল : বটেই তো! আমাদের লীডার টেনিদার অ্যায়সা একখানা জুৎসই গাল থাকতে তোর গালেই কিনা চাঁটি হাঁকড়াবে? ওতে লীডারের অপমান হয়—তা জানিস?

শুনে টেনিদা কটমট করে ক্যাবলার দিকে তাকালো।

—ঠাট্টা করছিস?

ক্যাবলা তিড়িং করে হাত-পাঁচেক দূরে সরে গেল। জিভ কেটে বললে, কী সর্বনাশ! তোমাকে ঠাট্টা! শেষে যে গাঁট্টা খেয়ে আমার

গালপাট্টা উড়ে যাবে! আমি বলছিলুম কি, ভূত এসে হ্যাণ্ডশেকই করুক আর বক্সিংই জুড়ে দিক, লেকিন ওটা দলপতির সঙ্গে হওয়াটাই দস্তুর।

টেনিদার কথাটা ভালো লাগল না। মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা যাঃ, বেশি কঁ্যাচোর-ম্যাচোর করিস নি। কিন্তু তোকেও বলে দিচ্ছি প্যালা, এবেলা থেকে তোর ডিম-টিম খাওয়া একেবারে বন্ধ। স্রেফ কাঁচকলা দিয়ে গাঁদালের ঝোল, আর রাত্তিরে সাবু-বার্লি। আজকে মুচ্ছো গিয়েছিলি, দু-চারদিন পরে একেবারেই যে মারা যাবি!

আমি রেগে বললুম, ধ্যাত্তোর তোমার সাবু-বার্লির নিকুচি করেছে! বলছি সত্যিই ভূতে চাঁটি মেরেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না!

ক্যাবলা বললে, বটে?

টেনিদা বললে, থাম্, আর চালিয়তি করতে হবে না!

আমি আরো রেগে বললুম, চালিয়াতি করছি নাকি? তাহলে এখনো আমার ডান গালটা টনটন করছে কেন?

টেনিদা বললে, অমন করে। খামোকাই তো লোকের দাঁত কন্‌কন্ করে, মাথা বন্‌বন্ করে, কান ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে—তাই বলে তাদের সকলকে ধরেই কি ভূতে ঠ্যাঙায় নাকি?

আমি এবারে মনে ভীষণ ব্যথা পেলুম। এত কষ্টে-সৃষ্টে যদিই বা গালে একটা ভুতুড়ে চড় খেয়েছি, কিন্তু এই হতভাগারা কিছুতেই তা বিশ্বাস করছে না। ওরা নিজেরা খেতে পায়নি কিনা, তাই বোধহয় ওদের মনে হিংসে হয়েছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, কেন বিশ্বাস করছ না বলো তো? তোমরা তো গুটি-গুটি সামনে এগিয়ে গেলে। এর মধ্যে গোটাকয়েক বৈঁচি-টৈঁচি খেয়ে আমি দেখলুম, ঝোপের মধ্যে একটা কাঠবেড়ালির ল্যাজ নড়ছে। যেই সেটাকে খপ করে চেপে ধরেছি, অমনি—:

—অমনি কাঠবেড়ালে তোকে চড় মেরেছে?—বলেই টেনিদা হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। আবার ক্যাবলার নাক মুখ দিয়ে শেয়ালের ঝগড়ার মতো খিক-খিক করে কেমন একটা আওয়াজ বেরোতে শুরু করল।

এই দারুণ অপমানে আমার পেটের মধ্যে পালা-জ্বরের পিলেটা নাচতে লাগল। আর সেইসঙ্গেই হঠাৎ নিজের ডান হাতের দিকে আমার চোখ পড়ল। আমার মুঠোর মধ্যে—

একরাশ শাদা শাদা রোঁয়া। সেই ল্যাজটারই খানিক ছিঁড়ে এসেছে নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললাম, এই ছাখো, এখনো কী রয়েছে আমার হাতে!

ক্যাবলা এক লাফে এগিয়ে এল সামনে। টেনিদা থাবা দিয়ে রোঁয়াগুলো তুলে নিলে আমার হাত থেকে।

তারপর টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: এ যে—এ যে—

ক্যাবলা আরো জোরে চেঁচিয়ে বললে, দাড়ি!

টেনিদা বললে পাকা দাড়ি।

ক্যাবলা বললে, তাতে আবার পাটকিলে রঙ! তামাক-খাওয়া দাড়ি!

টেনিদা বললে, ভূতের দাড়ি!

ক্যাবলা বললে, তামাকখেকো ভূতের দাড়ি!

ভূতের দাড়ি! শুনে আর-একবার আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জো হল। কী সর্বনাশ—করেছি কী! শেষে কি কাঠবেড়ালির ল্যাজ টানতে গিয়ে ভূতের দাড়ি ছিঁড়ে এনেছি? তাই অমন একখানা মোক্ষম চড় বসিয়েছে আমার গালে! কিন্তু একখানা চড়ের ওপর দিয়েই কি আমি পার পাব? হয়ত কত যত্নের দাড়ি, কত রাত-বিরেতে শ্যাওড়া গাছে বসে ওই দাড়ি চুমরে চুমরে ভূতটা

খাম্বাজ রাগিণী গাইত! অবশ্য খাম্বাজ রাগিণী কাকে বলে আমার জানা নেই, তবে নাম শুনলেই মনে হয়, ও-সব রাগ-রাগিণী ভূতের গলাতেই খোলতাই হয় ভালো।—আমি সেই সাধের দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছি, এখন মাঝরাতে এসে আমার মাথার চুলগুলো উপড়ে নিয়ে না যায়! ক্যাবলা আর টেনিদা দাড়ি নিয়ে গবেষণা করুক—আমি হাত-পা ছেড়ে আবার বিছানার ওপর ধপাৎ করে শুয়ে পড়লুম।

ক্যাবলা দাড়িগুলো বেশ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে বললে, কিন্তু টেনিদা—ভূতে কি তামাক খায়?

—কেন, খেতে দোষ কী?

—মানে ইয়ে কথা হল—ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, লেকিন বাত এহি হ্যায়, ভূতে তো শুনেছি আগুন-টাগুন ছুঁতে পারে না—তাহলে তামাক খায় কী করে? তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে—এমনি পাকা, এমনি পাটকিলে-রঙ-মাখানো দাড়ি যেন আমার চেনা, যেন এ দাড়িটা কোথায় আমি দেখেছি—

ক্যাবলা আরো কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দু-পাটি জুতো হাতে করে ঘরের মধ্যে ঝাঁটু এসে ঢুকল। টেনিদার মুখের সামনে জুতো-জোড়া তুলে ধরে বললে, এই দেখুন দাদাবাবু—

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে, ব্যাটা কোথাকার গাড়োল রে! বলা হল প্যালার খাওয়ার জন্যে দুধ আনতে, তুই আমার মুখের কাছে জুতোজোড়া এনে হাজির করলি? আমি কি ও দুটো চিবোব নাকি বসে বসে?

ঝাঁটু বললে, রাম-রাম! জুতো তো কুত্তা চিবোবে, আপনি কেন? আমি বলছিলম, হাবুলবাবু কুথা গেল! জুতোটা বাহিরে পড়ে ছিল, হাবুলবাবুকে তো কোথাও দেখলম না। ফির জুতোর মধ্যে একটা চিঠি দেখলম, তাই নিয়ে এলম।

জুতোর মধ্যে চিঠি ? আরে, তাই তো বটে। আমি জ্ঞান হওয়ার পরে তো সত্যিই এ ঘরে হাবুল সেনকে দেখতে পাইনি!

ক্যাবলা বললে, তাই তো! জুতোর ভেতরে চিঠির মতো একটা কী রয়েছে যে! ব্যাপার কী, টেনিদা ? হাবুলটাই বা গেল কোথায় ?

টেনিদা ভাঁজ-করা কাগজটা টেনে বের করে বললে, দাঁড়া না কাঁচকলা, আগে দেখি চিঠিটা!

কিন্তু চিঠির ওপর চোখ বুলোতেই—সেতুটো তড়াক করে

একেবারে টেনিদার কপালে চড়ে গেল। বার-তিনেক খাবি খেয়ে টেনিদা বললে, ক্যাবলা রে, আমাদের বারোটা বেজে গেল!

—বারোটা বেজে গেল! মানে?

—মানে—হাবুল 'গন?'

—কোথায় 'গন?'—আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলাম: চিঠিতে কী আছে টেনিদা? কী লেখা ওতে?

ভাঙা গলায় টেনিদা বললে, তবে শোন্, পড়ি।

চিঠিতে লেলা ছিল:

'হাবুল সেনকে আমরা ভ্যানিশ করিলাম। যদি পত্রপাঠ চাঁটি-বাঁটি তুলিয়া আজই কলিকাতায় রওনা হও, তবে যাওয়ার আগে অক্ষত শরীরে হাবুলকে ফেরত পাইবে। নতুবা পরে তোমাদের চার মূর্তিকেই আমরা ভ্যানিশ করিব—এবং চিরতরেই তাহা করিব। আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিলাম, পরে দোষ দিতে পারিবে না।

ইতি—ঘচাং ফুঃ। দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু।'

দশ

'দস্যু কচাং কুঃ'

টেনিদা ধপাৎ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল। ওর নাকের সামনে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাহাড়ি মৌমাছি উড়ছিল, অত বড় নাকটা দেখে বোধহয় ভেবেছিল, ওখানে একটা জুৎসই চাক বাঁধা যায়। হঠাৎ টেনিদার নাক থেকে ঘড়াৎ-ঘড় করে এমনি একটা আওয়াজ বেরুলো—যে সেটা ঘাবড়ে গিয়ে হাত-তিনেক দূরে ঠিকরে পড়ল।

লীডারের অবস্থা তখন সঙিন। করুণ গলায় বললে, ওরে বাবা—গেলুম! শেষকালে কিনা চীনে দস্যুর পাল্লায়! এর চেয়ে যে ভূতও অনেক ভালো ছিল!

আমার হাত-পাগুলো তখন আমার পিলের ভেতরে ঢোকবার

চেষ্টা করছে। বললুম, তার নাম আবার ঘচাং ফুঃ! অর্থাৎ ঘচাং করে গলা কেটে দেয়···তারপর ফুঃ করে উড়িয়ে দেয়!

ঝাঁটু মিটমিট করে তাকাচ্ছিল। আমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে, বেপার কী বটেক দাদাবাবু?

ক্যাবলা বললে, বেপার? বেপার সাঙ্ঘাতিক। হ্যাঁ রে ঝাঁটু, এখানে ডাকাত-ফাকাত আছে নাকি?

—ডাকাত?—ঝাঁটু বললে, ডাকাত ফির ইখানে কেনে মরতে আসবেক? ই তল্লাটে উসব নাই।

—নাঃ, নেই!—মুখখানাকে কচু-ঘণ্টর মতো করে টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল: তবে ঘচাং ফুঃ কোত্থেকে এল? তাও আবার যে-সে নয়—একেবারে দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু!

ক্যাবলাটা কী পাখোয়াজ ছেলে! কিছুতেই ঘাবড়ায় না। বললে, আরে দুত্তোর—রেখে দাও ওসব! দেখলে তো, তাহলে কিছু নয়, সব ধাপ্পা! ঘচাং ফুঃর তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এই হাজারিবাগের পাহাড়ি বাংলোয় এসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবে! আসলে ব্যাপার কী জানো? স্রেফ বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস।

—বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস!—টেনিদা চোয়াল চুলকোতে চুলকোতে বললে: মানে?

—মানে? মানে আবার কী? ঐ এন্তার সব গোয়েন্দা গল্প—যে-সব গল্পে পুকুরে সাবমেরিন ভাসায়, আর যাতে করে বাঙালী গোয়েন্দা দুনিয়ার সব অসাধ্য সাধন করে—সেই সমস্ত বই পড়ে এদের মাথায় এগুলো ঢুকেছে। আমার বড়মামা লালবাজারে চাকরি করে, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—এই গোয়েন্দারা কোথায় থাকে। বড়মামা রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললে, কি একটা কল্কেতে থাকে।

—চুলোয় যাক গোয়েন্দা! টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তার সঙ্গে ঘচাং ফুঃর সম্পর্ক কী?

—আছে—আছে !—ক্যাবলা সবজান্তার মতো বললে, যারা এই চিঠি লিখেছে, তারা গোয়েন্দা-গল্প পড়ে। পড়ে-পড়ে আমাদের ওপরে একখানা চালিয়াতি খেলেছে।

—কিন্তু এ-রকম চালিয়াতি করার মানে কী ? আমাদের এখান থেকে তাড়াতেই বা চায় কেন ? আর হাবুল সেনকেই বা কোথায় নিয়ে গেল ?

ক্যাবলা বললে, সেইটেই তো রহস্য ! সেটা ভেদ করতে হবে। কতগুলো পাজি লোক নিশ্চয়ই আছে—আর কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু এই চিঠিটা দিয়ে এরা একটা মস্ত উপকার করেছে টেনিদা !

—উপকার ?—টেনিদা বললে, কিসের উপকার ?

—একটা জিনিস তো পরিষ্কার বোঝা গেল, জিন-টিন এখানে কিচ্ছু নেই—ওসব একদম ভোঁ-কাট্টা ! কতগুলো ছ্যাঁচড়া লোক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে—এ বাড়িটায় তাদের দরকার। আমরা এসে পড়ায় তাদের অসুবিধে হয়েছে—তাই আমাদের তাড়াতে চায়। —ক্যাবলা বুক টান করে বললে, কিন্তু আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে একদল ছিঁচকে লোকের ভয়ে পালাবো টেনিদা ? ওদের টাকের ওপর টেক্কা মেরে জানিয়ে দিয়ে যাব, ওরা যদি ঘচাং ফুঃ হয়—তাহলে আমরা হচ্ছি কচাং কুঃ !

—কচাং কুঃ !—আমি বললুম, সে আবার কী ?

ক্যাবলা বললে, বাঘা চৈনিক দস্যু ! দুর্ধর্ষের ওপর আর-এক কাঠি !

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আমরা আবার চীনে হলুম কবে ? দস্যুই বা হতে যাব কোন্ দুঃখে ?

ক্যাবলা বললে, ওরা যদি চৈনিক হয়—আমাদেরই বা হতে দোষ কী ? আমরাও ঘোরতর চৈনিক ! ওরা যদি দস্যু হয়—আমরা নস্যু !

—নস্যু ?—টেনিদার নাক-বরাবর আবার সেই মৌমাছিটা ফিরে আসছিল, সেটাকে তাড়াতে তাড়াতে টেনিদা বললে, নস্যু কাকে বলে ?

—মানে, দস্যুদের যারা নস্যির মতো নাক দিয়ে টেনে ফেলে তারাই হল নস্যু।

টেনিদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ছাখ ক্যাবলা, সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি নয় ! যদি সত্যিই ওরা ডাকাত টাকাত হয়—

—ডাকাত হলে অনেক আগেই ওদের মুরোদ বোঝা যেত। বসে-বসে ঝোপের মধ্যে চিনেবাদাম খেত না, কিংবা কাগজে জড়িয়ে মড়ার মাথা ছুড়ত না। ওরাও এক নম্বর কাওয়ার্ড !

—তাহলে হাবুল সেনকে নিয়ে গেল কী করে ?

—নিশ্চয়ই কোনো কায়দা করেছে। কিন্তু সে কায়দাটা সমঝে ফেলতে বহুৎ সময় লাগবে না। টেনিদা—

—কী ?

—আর দেরি নয়। রেডি ?

টেনিদা বললে, কিসের রেডি ?

—ঘচাং ফুঃ-দের কচাং কুঃ করতে হবে ! আজই, এক্ষুনি !

টেনিদা তখনো সাহস পাচ্ছিল না। কুঁকড়ে গিয়ে বললে, সে কী করে হবে ?

—হয়ে যাবে একরকম। এই বাংলোর কাছাকাছিই ওদের কোন গোপন আস্তানা আছে। হানা দিতে হবে সেখানে গিয়ে।

—ওরা যদি পিস্তল-টিস্তল ছোড়ে ?

—আমরা ইট ছুড়ব !—ক্যাবলা ভেংচি কেটে বললে, রেখে দাও পিস্তল ! গোয়েন্দা-গল্পে ওসব কথায় কথায় বেরিয়ে আসে, আসলে পিস্তল অত শস্তা নয়। হ্যাঁ—গোটাকয়েক লাঠি দরকার। এই ঝাঁটু—লাঠি আছে রে ?

ঝাঁটু চুপচাপ সব শুনছিল। কী বুঝছিল কে জানে, মাথা নেড়ে বললে, তুটো আছে। একটো বল্লমও আছে।

—তবে নিয়ে আয় চটপট।

—লাঠি-বল্লমে কী হবেক দাদাবাবু?—ঝাঁটুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—শেয়াল মারা হবেক।

—শেয়াল মারা? কেনে? মাংস খাবেন?

—অত খবরে তোর দরকার কী?—ক্যাবলা রেগে বললে, যা বলছি তোকে তাই কর। শিগগির নিয়ে আয় ওগুলো। চটপট।

ঝাঁটু লাঠি বল্লম আনতে গেল। টেনিদা শুকনো গলায় বললে, কিন্তু ক্যাবলা, এ বোধহয় ভালো হচ্ছে না। যদি সত্যিই বিপদ-আপদ হয়—

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, অঃ—তুম্‌হারা ডর লাগ গিয়া? বেশ, তুমি তাহলে বাংলোয় বসে থাকো। আমি তো যাবোই—এমনকি পালা-জ্বরে-ভোগা এই প্যালাটাও আমার সঙ্গে যাবে। দেখবে, তোমায় চাইতে ওরও বেশি সাহস আছে।

শুনে আমার বুক ফুলে উঠল বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পালা-জ্বরের পিলেটাও নড়-নড় করে উঠল—আমাকেও যেতে হবে! বেশ, তাই যাব! একবার ছাড়া তো তুবার মরব না!

আর আমি মারা গেলে—হ্যাঁ, মা কাঁদবে, পিসিমা কাঁদবে, বোধহয় সেকেণ্ডারি বোর্ডও কাঁদবে—কারণ, বছর-বছর স্কুল-ফাইন্যালের ফি দেবে কে?—আর বৈঠকখানা বাজারে দৈনিক আধপো পটোল আর চারটে সিঙ্গি মাছ কম বিক্রি হবে—এক ছটাক বাসকপাতা বেঁচে যাবে রোজ। তা যাক। এমন বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্যে সংসারের একটু-আধটু ক্ষতি নয় হলই বা!

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—তবে যাই! কিন্তু প্যালার সেই দাড়িটা—

বললুম, তামাকখেকো দাড়ি।

ক্যাবলা বললে, ঠিক। মনেই ছিল না। ওই দাড়ি থেকেই আরো প্রমাণ হয়—ওরা চৈনিক নয়। কলকাতায় তো এত চীনা মানুষ আছে—কারু দাড়ি দেখছো কখনো ?

তাই তো! দাড়িওলা চীনা মানুষ! না, আমরা কেউ তা দেখিনি। কখনো না।

এর মধ্যে ঝাঁটু লাঠি আর বল্লম এনে ফেলেছে। বল্লমটা ঝাঁটুই নিলে, একটা লাঠি নিলে ক্যাবলা—আর-একটা টেনিদা। আমি আর কী নিই ? হাতের কাছে একটা চ্যালাকাঠ পড়ে ছিল, সেইটেই কুড়িয়ে নিলুম। যদি মরতেই হয়, তবু তো এক ঘা বসাতে পারব !

অতঃপর ঘচাং ফুঃ দস্যুর দলকে একহাত নেবার জন্যে দস্যু কচাং কুঃর দল আবার রওনা হল বীরদর্পে। আবার সেই বুনো রাস্তা। আমরা ঝোপ-ঝাপ ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে দেখছিলুম, কোথাও সেই তামাকখেকো লুকিয়ে আছে কি না।

কিন্তু আবার আমি বিপদে পড়ে গেলুম। এবার বৈঁচি নয়—কামরাঙা।

বাংলোর ঠিক পেছন দিয়ে আমরা চলেছি। আমি যথানিয়মে পেছিয়ে পড়েছি—আর ঠিক আমারই চোখে পড়েছে কামরাঙার গাছটা। আঃ, ফলে-ফলে একেবারে আলো হয়ে রয়েছে !

নোলায় প্রায় সেরটাক জল এসে গেল। জ্বরে ভুগে-ভুগে টক খাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে। ঘচাং ফুঃ-টুঃ সব ভুলে গিয়ে গুটি-গুটি গেলুম কামরাঙা গাছের দিকে। কলকাতায় এসব কিছুই খেতে পাই না—চোখের সামনে অমন খোলতাই কামরাঙার বাহার দেখলে কার আর মাথা ঠিক থাকে !

যেই গাছতলায় পা দিয়েছি—

সঙ্গে-সঙ্গেই—ইঃ! একতাল গোবরে পা পড়ল—আর তক্ষুনি

এক আছাড়। কিন্তু একি! আছাড় খেয়ে আমি তো মাটিতে পড়লুম না! আমি যে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে পাতালে চলেছি! কিন্তু পাতালেও নয়। আমি একেবারে সোজা কার মস্ত একটা ঘাড়ের ওপরে অবতীর্ণ হলুম। 'আঁই দাদা রে—' বলে সে আমাকে নিয়ে একেবারে পপাত।

আমি আর-একবার অজ্ঞান।

এগারো

গজেশ্বরের পাল্লায়

অজ্ঞান হয়ে থাকাটা মন্দ নয়—যতক্ষণ কাঠপিঁপড়েতে না কামড়ায়। আর যদি একসঙ্গে একঝাঁক পিঁপড়ে কামড়াতে শুরু করে—তখন? অজ্ঞান তো দূরের কথা, মরা মানুষ পর্যন্ত তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে!

আমিও লাফ মেরে উঠে বসলুম।

কেমন আবছা-আবছা অন্ধকার—গোড়াতে কিছু ভালো বোঝা গেল না। চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকছিল। খামোকা বাঁ-কানের ওপর কটাং করে আর-একটা কাঠপিঁপড়ের কামড়।

—বাপরে—বলে আমি কান থেকে পিঁপড়েটা টেনে নামালুম।

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ কটকটে ব্যাঙের মতো আওয়াজ করে কে যেন হেসে উঠল। তারপর, ঘোড়ার নাকের ভেতর থেকে যেমন শব্দ হয় তেমনি করে কে যেন বললে, কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে বাপরে-বাপরে বলছ, এর পরে যখন ভীমরুলে কামড়াবে, তখন যে মেসোমশাই-মেসোমশাই বলে ডাক ছাড়তে হবে!

তাকিয়ে দেখি—

ঠিক হাতদুয়েক দূরে একটা মুশ্‌কো জোয়ান ভাম-বেড়ালের মতো থাবা পেতে বসে আছে। কথাটা বলে সে আবার কটকটে ব্যাঙের মতো শব্দ করে হাসল।

আমার তখন সব কি-রকম গোলমাল ঠেকছিল। বললুম, আমি কোথায় ?

—আমি কোথায়!—লোকটা একরাশ বিচ্ছিরি বড়-বড় দাঁত বের করে আমায় ভেংচে দিলে। তারপর ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, আহা-হা, ন্যাকা আর-কি! যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না! হঠাৎ ওপর থেকে তুড়ুম করে পাকা তালের মতো আমার পিঠের ওপর এসে নামলে, আর এখন সোনামুখ করে বলছ—আমি কোথায়! ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি ?

আমার সব মনে পড়ে গেল। সেই পাকা কামরাঙা—গুটি-গুটি পায়ে সেদিকে এগোনো, গোবরে পা পিছলে পড়া—তারপরে—

আমি হাঁউ-মাউ করে বললুম, তবে কি আমি দস্যু ঘচাং ফুঃর আড্ডায় এসে পড়েছি ?

—ঘচাং ফুঃ ? সে আবার কী ?—বলেই লোকটা সামলে নিল : হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক বটে। বাবাজি অমনি একটা কী লিখেছিল বটে চিঠিতে।

—বাবাজি ? কে বাবাজি ?

—একটু পরেই টের পাবে!—লোকটা দাঁত খিচিয়ে বললে, চালাকি পেয়েছ ? এত করে চলে যেতে বললুম—ভূতের ভয় দেখানো হল—সারা রাত মশার কামড় খেয়ে ঝোপের মধ্যে বসে-বসে মড়ার মাথা-ফাতা ছুড়লুম—অট্টহাসি হেসে-হেসে গলা ব্যথা হয়ে গেল—তবু তোমাদের গেরাহ্যি হয় না! দাঁড়াও এবার! একটাকে ভোগা দিয়ে এনেছি—তুমিও এসে ফাঁদে পড়েছ; এবার তোমায় শিক-কাবাব বানিয়ে খাব!

—অ্যাঁ—শিক-কাবাব!

—ইচ্ছে হলে আলু-কাবলিও বানাতে পারি। কিংবা ফাউল-কাটলেট। চপও করা যায় বোধহয়। কিন্তু—লোকটা চিন্তিতভাবে

একবার মাথা চুলকালো, কিন্তু তোমাদের কি খাওয়া যাবে? এ পর্যন্ত অনেক ছোকরা আমি দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মতো অখাদ্য জীব কখনো দেখিনি!

শুনে আমার কেমন ভরসা হল। মরতেই তো বসেছি—তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

বললুম, সে-কথা ভালো! আমাদের খেয়ো না—অন্তত আমাকে তো নয়ই! খেলেও হজম করতে পারবে না। কলেরা হতে পারে, গায়ে চুলকুনি হতে পারে, ডিপথিরিয়া হতে পারে—এমনকি সর্দি-গর্মি হওয়াও আশ্চর্য নয়!

লোকটা বললে, থামো ছোকরা—বেশি বকবক কোরো না! আপাতত তোমায় নিয়ে যাব ঠাণ্ডী গারদে—তোমার দোস্ত হাবুল সেনের কাছে। সেইখানেই থাকো এখন। ইতিমধ্যে বাবাজি ফিরে আসুন, তোমার বাকি দুটো দোস্তকেও পাকড়াও করি—তারপর ঠিক করা যাবে তোমাদের দিয়ে মোগলাই পরোটা বানানো হবে—না ডিমের হালুয়া।

আমি বললুম, দোহাই বাবা, আমাকে খেয়ো না! খেয়ে কিচ্ছু সুখ পাবে না—তা বলে দিচ্ছি। আমি পালা-জ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে সিঙি মাছের ঝোল খাই—কিচ্ছু রস-কস নেই। আমাদের অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবু বলেন, আমি যমের অরুচি। আমাকে খেয়ে বেঘোরে মারা যাবে বাবা ঘচাং ফুঃ—

লোকটা রেগে বললে, আরে রেখে দাও তোমার ঘচাং ফুঃ! ঘচাং ফুঃর নিকুচি করেছে! কেন বাপু, রাঁচির গাড়িতে বসে গুরুদেবের রসগোল্লা আর মিহিদানা খাওয়ার সময় মনে ছিল না? তাঁর যোগসর্পের হাঁড়ি সাবাড় করার সময় বুঝি এ কথা খেয়াল ছিল না যে আমাদেরও দিন আসতে পারে? নেহাৎ মুরি স্টেশনে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম—নইলে—

আমি ততক্ষণে হাঁ হয়ে গেছি। আমার চোখদুটো ছানাবড়া নয়—একেবারে ছানার ডালনা!

—অ্যাঁ, তাহলে তুমি—

—চিনেছ এতক্ষণে? আমি গুরুদেবের অধম শিষ্য গজেশ্বর গাড়ুই।

—অ্যাঁ!

গজেশ্বর মিটমিট করে হেসে বললে, ভেবেছিলে মুরি স্টেশন পার হয়ে গাড়ি চলে গেল, আর তোমরাও পার পেলে! আমরা যে তার পরের গাড়িতেই চলে এসেছি, সেটা তো আর টের পাওনি! এবারে বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়!

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, পটলডাঙার প্যালারামের এবার বারোটা বেজে গেছে—ওই গজেশ্বর ব্যাটা এবার আমায় নির্ঘাৎ 'সামী কাবাব' বানিয়ে খাবে! নেহাৎ যখন মরবই, তখন ভয় করে কী হবে? বরং গজেশ্বরের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করি।

—কিন্তু তোমরা এখানে কেন? ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের বাংলোতে তোমাদের কী দরকার? এমন করে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছই বা কী জন্যে? আর যদি বসেই থাকো—গর্তের মধ্যে একতাল অত্যন্ত বাজে গোবর রেখে দিয়েছ কেন?

গজেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললে, গোবর কি আমরা রেখেছি নাকি? রেখেছে গোরুতে। তোমার মতো গোবর-গণেশ তাতে পা দিয়ে সুড়ুৎ করে পিছলে পড়বে—সেইজন্যেই বোধহয়।

—সে তো হল—কিন্তু আমাদের তাড়াতে চাও কেন? এ বাড়িতে তোমাদের কী দরকার?

—অত কথা দিয়ে তোমার কাজ কী হে চিংড়িমাছ? এখনো নাক টিপলে দুধ বেরোয়—ওসব খবরে তোমার কী হবে?—ব্যাজার মুখে গজেশ্বর একটা হাই তুলল।

আমাকে চিংড়িমাছ বলায় আমার ভীষণ রাগ হল। ডান কানের ওপর আর-একটা কাঠপিঁপড়ে পুটুস করে ইনজেকশন দিচ্ছিল, 'উঃ' করে সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললুম, আমাকে চপ-কাটলেট করে খেতে চাও খাও, কিন্তু খবরদার বলছি, চিংড়িমাছ বোলো না!

—কেন বলব না? চিংড়ির কাটলেট বলব!—গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল।

—না, কক্ষনো বলবে না!—আমি আরও রেগে গিয়ে বললুম, তা ছাড়া এখন আমার নাক টিপলে আর দুধ বেরোয় না—আমি দু-দুবার স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছি।

—ইঃ—স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছে!—গজেশ্বর ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল: আচ্ছা বল তো—'ক্যাটাক্লিজম' মানে কী?

—ক্যাটাক্লিজম? ক্যাটাক্লিজম? আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, বেড়ালের বাচ্চা হবে বোধহয়?

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে গজেশ্বর বললে, তোমার মুণ্ডু! আচ্ছা বল তো—'সেনিগেম্বিয়া'র রাজধানী কী?

বললুম, নিশ্চয় হনোলুলু? নাকি, ম্যাডাগাস্কার?

—ভূগোলকে একেবারে গোলগপ্পার মতো খেয়ে নিয়েছ দেখছি!—গজেশ্বর নাক বেঁকিয়ে বললে, আচ্ছা বলো দেখি, 'জাড্যাপহ' মানে কী? অনিকেত কাকে বলে?

—কী বললে—অনিমেষ? অনিমেষ আমার মামাতো ভাই।

—হয়েছে, আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই!—গজেশ্বর আবার ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেচিয়ে বললে, স্কুল-ফাইন্যাল কেন—তুমি ছাত্রবৃত্তিও ফেল করবে! নাঃ—সত্যিই দেখছি তুমি একদম অখাদ্য! বোধহয় শুক্তো করে এক-আধটু খাওয়া যেতে পারে। এখন উঠে পড়।

—কোথায় যেতে হবে?

—বললুম তো, ঠাণ্ডী গারদে। সেখানে তোমার ফ্রেণ্ড হাবুল সেন রয়েছে—তার সঙ্গেও মোলাকাত হবে। ওদিকে আবার গুরুদেব গেছেন দলবল নিয়ে একটুখানি বিষয়-কর্মে, তিনিও ফিরে আসুন—তারপর দেখা যাক—

ইতিমধ্যে আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলুম। বিপদে পড়ে পটলডাঙার প্যালারামের মগজও এক-আধটু সাফ হয়ে এসেছে। কোথায় এসে পড়েছি সেটাও একটু ভালো করে জানা দরকার।

যতটা বোঝা গেল, হাত সাত-আষ্টেক নিচে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে পড়েছি। যদি গজেশ্বরের পিঠের ওপর সোজা ধপাং করে না পড়তুম, তাহলে হাত-পা নির্ঘাৎ ভেঙে থেঁতলে যেত। যেখানে বসে আছি, সেটা একটা সুড়ঙ্গের মতো সামনের দিকে চলে গেছে। কোথায় গেছে—কতটা গেছে বোঝা গেল না। তবে ওরই কোথাও ঠাণ্ডী গারদ আছে—সেইখানেই আপাতত বন্দী রয়েছে হাবুল সেন।

হাবুলের ব্যবস্থা পরে হবে—কিন্তু আমি কি এখান থেকে পালাতে পারি না? কোনমতেই না?

মাথার ওপরে গোল কুয়োর মতো গর্তটা দেখা যাচ্ছে—যেখান দিয়ে আমি ভেতরে পড়েছি। লক্ষ্য করে আরো দেখলুম, গর্তের পাশ দিয়ে পাথরে পাথরে বেশ খাঁজকাটা মতো আছে। একটু চেষ্টা করলেই ঠকাৎ করে ওপরে—

এসব ভাবতে বোধহয় মিনিট-দুই সময় লেগেছিল। এর মধ্যে বিড়িটা শেষ করেছে গজেশ্বর—মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

—বলি, মতলবটা কী হে? পালাবে? সে গুড়ে বালি চাঁদ—স্রেফ বালি! বাঘের হাত থেকে ছাড়ান পেতে পার কিন্তু এই গজেশ্বর গাড়ুইয়ের হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই! তার ওপর তুমি আবার আমার গুরুদেবের দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছ— তোমার কপালে কী যে আছে—একটা যাচ্ছেতাই মুখ করে গজেশ্বর উঠে দাঁড়াল।

অ্যাঁ! তাহলে সেই তামাকখেকো ভুতুড়ে দাড়িটা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের! স্বামিজীই তবে ঝোপের মধ্যে বসে আড়ি পাত-ছিলেন, আর আমি কাঠবেড়ালির ল্যাজ মনে করে সেই স্বর্গীয় দাড়ি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমি কিন্তু ইচ্ছে করে দাড়ি ছিঁড়িনি! আমি ভেবেছিলুম—

—থাক—থাক! তুমি কী ভেবেছ তা আমার জেনে আর দরকার নেই। গালের ব্যথায় গুরুদেব দু-ঘণ্টা ছটফট করেছেন। তিনি ফিরে এলে—যাক সে কথা, ওঠ এখন—

গজেশ্বর হাতির শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে আমায়

পাকড়াও করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : বাপরে গেলুম—আরে বাপরে গেছি—

ততক্ষণে আমিও দেখেছি। কালো কটকটে একটা কাঁকড়া-বিছে। গজেশ্বরের পায়ের কাছে তখনো দাড়া উঁচু করে যমদূতের মতো খাড়া হয়ে আছে।

—গেলুম—গেলুম—ওরে বাবা—জ্বলে গেলুম—

বলতে-বলতে সেই ষাঁড়ের মতো জোয়ানটা মেঝের ওপর কুমড়োর মতো গড়াতে লাগল : গেছি—গেছি—একদম মেরে ফেলেছে—

আর আমি? এমন সুযোগ আর কি পাব? তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের খাঁজে পা লাগালুম—এইবার এসপার কি ওসপার!

বারো

শেঠ ঢুণ্ডুরাম

ওঠ জোয়ান—হেঁইয়ো!

পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে যখন গর্তের মুখে উঠে পড়লুম, তখন আমার পালা-জ্বরের পিলেটা পেটের মধ্যে কচ্ছপের মতো লাফাচ্ছে। অবশ্য কচ্ছপকে আমি কখনো লাফাতে দেখিনি—সুড়সুড় করে শুঁড় বের করতে দেখেছি কেবল। কিন্তু কচ্ছপ যদি কখনো লাফায়—আনন্দে হাত পা তুলে নাচতে থাকে—তাহলে যেমন হয়, আমার পিলেটা তেমনি করেই নাচতে লাগল। একেবারে পুরো পাঁচ মিনিট।

পিলের নাচ-টাচ থামলে কামরাঙা গাছটার ডাল ধরে আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কোথাও কেউ নেই—ক্যাবলা আর টেনিদা কোথায় গেছে কে জানে! ওধারে একটা আমড়া গাছে বসে একটা বানর আমাকে ভেংচি কাটছিল—আমিও দাঁত-টাত বের করে সেটাকে খুব খারাপ করে ভেংচে দিলুম। বানরটা রেগে গিয়ে বললে,

কিঁচ্—কিঁচ্—কিচ্চু—বোধহয় বললে, তুমি একটা বিচ্ছু!—তারপর টুক্ করে পাতার আড়ালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পায়ের তলায় গর্তটার ভেতর থেকে গজেশ্বর গাড়ুইয়ের গ্যাঙানি শোনা যাচ্ছে। আমার বেশ লাগছিল। আমাকে বলে কিনা কাটলেট করে খাবে! যাচ্ছেতাই সব ইংরিজি শব্দের মানে করতে বলে আর জানতে চায় হনোলুলুর রাজধানীর নাম কী! বেশ হয়েছে! পাহাড়ি কাঁকড়া-বিছের কামড়—পুরো তিনটি দিন সমানে গান গাইতে হবে গজেশ্বরকে!

এইবার আমার চোখ পড়ল সেই কালান্তক গোবরটার দিকে। এখনো তার ভেতর দিয়ে পেছলানোর দাগ—ঐ পাষণ্ড গোবরটাই তো আমায় পাতালে নিয়ে গিয়েছিল! ভারি রাগ হল, গোবরকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে ওটাতে আমি সজোরে পদাঘাত করলুম।

এহে-হে—এ কী হল! ভারি ছ্যাঁচড়া গোবর তো! একেবারে নাকে মুখে ছিটকে এল যে! দুত্তোর!

কিন্তু এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গজেশ্বরকে বিশ্বাস নেই—হঠাৎ যদি উঠে পড়ে গর্তের ভেতর থেকে! সরে পড়া যাক এখান থেকে! পত্রপাঠ!

যাই কোন্ দিকে! ঝন্টিপাহাড়ি বাংলোর ঠিক পেছন দিকে এসে পড়েছি সেটা বুঝতে পারছি—কিন্তু যাই কোন্ ধার দিয়ে! কী ভাবে যে এসেছিলুম, ঐ মোক্ষম আছাড়টা খাওয়ার পর মাথার ভেতর সে-সমস্ত হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে। ডাইনে যাব, না বাঁয়ে? আমার আবার একটা বদ দোষ আছে। পটলডাঙার বাইরে এলেই আমি পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই আর চিনতে পারিনে। একবার দেওঘরে গিয়ে আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদাকে বলেছিলুম: দেখছ ফুচুদা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! উত্তর দিক থেকে কী চমৎকার সূর্য উঠছে!—শুনে ফুচুদা কটাং করে আমার লম্বা কানে

একটা মোচড় দিয়ে বলেছিল, স্ট্রেট এখান থেকে রাঁচি চলে যা প্যালা —মানে, রাঁচির পাগলা গারদে!

কোন্ দিকে যাব ভাবতে ভাবতেই—আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া! কিংবা একেবারে চমচম! ওদিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুটি-গুটি মেরে ও কারা আসছে? কাঠবেড়ালির ল্যাজের মতো ও কার দাড়ি উড়ছে হাওয়াতে?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—নির্ঘাৎ! তাঁর পেছনে পেছনে আরো দুটো ষণ্ডা জোয়ান—তাদের হাতে দুটো মুখ-বাঁধা সন্দেহজনক হাঁড়ি। নির্ঘাৎ যোগসর্পের হাঁড়ি—মানে, দই রসগোল্লা-ফোল্লা থাকা সম্ভব! একা একা নিশ্চয় খাবে না, খুব সম্ভব হাবুল সেনও ভাগ পাবে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রসগোল্লার ব্যাপারে একটুখানি দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু সেই লোভে আবার আমি গজেশ্বর গাড়ুইয়ের পাল্লায় পড়তে চাই না—উঁহু—কিছুতেই না! বেঁচে কেটে পড়ি এখান থেকে!

সুট্ করে আমি বাঁ পাশের ঝোপে ঢুকে গেলুম। দৌড়োনো যাবে না—পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা। ঝোপের মধ্যে দিয়ে আমি সুড়সুড়িয়ে চললুম।

চলেছি তো চলেইছি। কোন্ দিকে চলেছি জানি না। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, নালা-ফালা টপকে, একটা শেয়ালের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে, চলেছি আর চলেইছি। আবার যদি দস্যু ঘচাং ফুঃর পাল্লায় পড়ি—তাহলেই গেছি! গজেশ্বর যে-রকম চটে রয়েছে—আমাকে আবার পেলে আর দেখতে হবে না! সোজা শুক্তোই বানিয়ে ফেলবে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক এলোপাথাড়ি হাঁটবার পর দেখি, সামনে একটা ছোট্ট নদী। ঝুরঝুরে মিহি বালির ভেতর দিয়ে তির-তির করে তার নীলচে জল বয়ে চলেছে। চারদিকে ছোট-বড় পাথর। আমার পা

প্রায় ভেঙে আসবার জো—তেষ্টায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

পাথরের ওপর বসে একটুখানি জিরিয়ে নিলুম। আকাশটা মেঘলা—বেশ ছায়া-ছায়া জায়গাটা। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল! চারদিকে পলাশের বন—নদীর ওপারে আবার দুটো নীলকণ্ঠ পাখি।

একটুখানি জলও খেলুম নদী থেকে। যেমন ঠাণ্ডা—তেমনি মিষ্টি জল। খেয়ে একেবারে মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। দস্যু ঘচাং ফুঃ, গজেশ্বর, টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল সেন—সব ভুলে গেলুম। মনে এত ফুর্তি হল যে আমার চ্যা-রা-রা-রা-রা—রামা হো—রামা হো—বলে গান গাইতে ইচ্ছে করল।

কেবল চ্য-রা-রা-রা—বলে তান ধরেছি—হঠাৎ পেছনে ভোঁপ-ভোঁপ-ভোঁপ!

দুত্তোর—একেবারে রসভঙ্গ! তার চাইতেও বড় কথা: এখানে মোটর এল কোত্থেকে? এই ঝন্টিপাহাড়ির জঙ্গলে?

তাকিয়ে দেখলুম, নদীর ধার দিয়ে একটা রাস্তা আছে বটে। আর-একটু দূরেই সেই রাস্তার ওপর পলাশ-বনের ছায়ায় একখানা নীল রঙের মোটর দাঁড়িয়ে।

কী সর্বনাশ—এরাও ঘচাং ফুঃর দল নয় তো? ডিটেকটিভ গল্পে এইরকমই তো পড়া যায়! নিবিড় জঙ্গল—একখানা রহস্যজনক মোটর—তিনটে কালো-মুখোস-পরা লোক, তাদের হাতে পিস্তল—আর ডিটেকটিভ হিমাদ্রি রায়ের চোখ একেবারে মনুমেণ্টের চুড়োয়। ভাবতেই আমার পালা-জ্বরের পিলেটা ধপাস করে লাফিয়ে উঠল। ফিরে কচ্ছপ-নৃত্য শুরু করে আর-কি!

উঠে একটা রাম-দৌড় লাগাব ভাবছি—এমন সময় আবার ভোঁপ, ভোঁপ! মোটরটার হর্ন বাজল। তারপরেই গাড়ি থেকে যে নেমে এল, তাকে দেখে আমি থমকে গেলুম। না—কোনো দস্যুর দলে

এমন লোক থাকতেই পারে না! কোনো গোয়েন্দা-কাহিনীতে তা লেখেনি।

প্রকাণ্ড থলথলে ভুঁড়ি—দেখলে মনে হয়, ক্রেনে করে তুলতে গেলে ক্রেন ছিঁড়ে পড়বে। গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা তৈরি করতে বোধহয় একথান কাপড় খরচ হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা বেলুনের মতো মুখ—নাক-টাকগুলো প্রায় ভেতরে ঢুকে বসে আছে। মাথায় একটা বিরাট হলদে পাগড়ি। গলা-টলার বালাই নেই···পেটের ভেতর থেকে মাথাটা প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মনে হয়। ঠিক থুতনির তলাতেই একছড়া সোনার হার চিকচিক করছে। দুহাতের দশ আঙুলে দশটা আংটি।

একখানা মোক্ষম শেঠজী।

নাঃ—এ কখনো দস্যু ঘচাং ফুঃর লোক নয়। বরং ঘচাং ফুঃদের নজর সচরাচর যাদের ওপর পড়ে—এ সেই দলের। কিন্তু এরকম একটি নিটোল শেঠজী খামোকা এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছে কেন?

শেঠজী ডাকলেন: খোঁকা—এ খোঁকা—

আমাকেই ডাকছেন মনে হল। কারণ, আমি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনো খোঁকাকে আমি দেখতে পেলুম না। সাত-পাঁচ ভেবে আমি গুটি-গুটি এগোলুম তাঁর দিকে।

—নমস্তে শেঠজী।

—নমস্তে খোঁকা।—শেঠজী হাসলেন বলে মনে হল। বেলুনের ভেতর থেকে গোটাকতক দাঁত আর দুটো মিটমিটে চোখের ঝলক দেখতে পেলুম এবার। শেঠজী বললেন, তুমি কার লেড়কা আছেন? এখানে কী করতেছেন?

একবার ভাবলুম, সত্যি কথাটাই বলি। তারপরেই মনে হল, কার পেটে যে কী মতলব আছে কিছুই বলা যায় না। এই ঝন্টি-পাহাড়ি জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়। শেঠজীর অত বড় ভুঁড়ির

আড়ালেও রহস্যের কোন খাসমহল লুকিয়ে আছে কি না কে বলবে!

তাই বোঁ করে বলে দিলুম, আমি হাজারিবাগের ইস্কুলে পড়তেছেন। এখানে পিকনিক করতে এসেছেন।

—হাঁ! পিকনিক করতে এসেছেন?—শেঠজীর চোখদুটো বেলুনের ভেতর থেকে আবার মিটমিট করে উঠল: এতো দূরে? তা, দলের আউর সব লেড়কা কোথা আছেন?

—আছেন ওদিকে কোথাও।—আঙুল দিয়ে আন্দাজি যে-কোনো একটা দিক দেখিয়ে দিলুম। তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করলুম: আপনি কে আছেন, এই জঙ্গলে আপনিই বা কী করতে এসেছেন?

—হামি? শেঠজী বললেন, হামি শেঠ ঢুণ্ডুরাম আছি। কলকাতায় হামার মোকাম আছেন—রাঁচিমে ভি আছেন। এখানে হামি এসেছেন জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে।

—ও—জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে? আমার হঠাৎ কেমন রসিকতা করতে ইচ্ছে হল: কিন্তু এ জঙ্গলে বেশি ঘোরাফেরা করবেন না শেঠজী—এখানে আবার ভালুকের উৎপাত আছে!

—অ্যাঁ—ভালুক! শেঠ ঢুণ্ডুরামের বিরাট ভুঁড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল: ভালুক মানুষকে কামড়াচ্ছেন?

—খুব কামড়াচ্ছেন! পেলেই কামড়াচ্ছেন!

—অ্যাঁঃ!

আমি শেঠজীকে ভরসা দিয়ে বললুম: ভুঁড়ি দেখলে আরো জোর কামড়াচ্ছেন! মানে ভালুকেরা ভুঁড়ি কামড়াতে ভালোবাসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—অ্যাঁ! রাম—রাম!

শেঠজী হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। অত বড় শরীর নিয়ে কেউ যে অমন জোরে লাফাতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

তারপর মণ-চারেক ওজনের সিল্কের সেই প্রকাণ্ড বস্তাটা এক দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠল। উঠেই চেঁচিয়ে উঠল : এ ছগনলাল—আরে মোটরিয়া তো হাঁকাও! জলদি!

ভোঁপ—ভোঁপ! চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ঢুণ্ডুরামের নীল মোটর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আর পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি পরমানন্দে হাসতে লাগলুম। বেড়ে রসিকতা হয়েছে একটা!

কিন্তু বেশিক্ষণ আমার মুখে হাসি রইল না। হঠাৎ ঠিক আমার পেছনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে—

—হাল্লুম!

ভালুক নয়—ভালুকের বড়দা! অর্থাৎ বাঘ! রসিকতার ফল এমন যে হাতে-হাতে ফলে আগে কে জানত!

—বাপরে, গেছি!—বলে আমিও এক পেল্লায় লাফ! শেঠজীর চাইতেও জোরে!

আর লাফ দিয়ে ঝপাং করে একেবারে নদীর কনকনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে। পেছন থেকে সঙ্গে-সঙ্গে আবার জোর আওয়াজ : হাল্লুম!

তেরো

বাঘা কাণ্ড

বাপ্‌স্—কী ঠাণ্ডা জল! হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি লেগে গেল! আর স্রোতও তেমনি! পড়েছি হাঁটু জলে—কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ হাত দূরে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু জলসই না হলে যে বাঘসই—মানে, বাঘের জলযোগ হতে হবে এক্ষুনি! আঁকু-পাঁকু করে নদী পার হতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম—খানিকটা ঠাণ্ডা

জল ঢুকল নাক-মুখের মধ্যে। আর তক্ষুনি মনে হল, বাঘটা বুঝি এক্ষুনি পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে!

আর সেই মুহূর্তেই—

পেছন থেকে বাঘের গর্জন নয়—অট্টহাসি শোনা গেল।

বাঘ হাসছে! বাঘ কি কখনো হাসতে পারে? চিড়িয়াখানায় আমি অনেক বাঘ দেখেছি। তারা হাম-হাম করে খায়, হুম-হুম করে ডাকে—নয় তো, ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। আমি অনেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি বাঘের কখনো নাক ডাকে কি না। আর যদি ডাকেই, সেটা কেমন শোনায়। একদিন বাঘের হাঁচি শোনবার জন্যে একডিবে নস্যি বাঘের নাকে ছুড়ে দেব ভেবেছিলুম—কিন্তু আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা ডিবেটা কেড়ে নিয়ে আমার চাঁদির ওপর কটাং করে একটা গাঁট্টা মারল। কিন্তু বাঘের হাসি যে কোনদিন শুনতে পাওয়া যাবে—সেকথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখব ভাবছি, সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা নুড়িতে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লুম। আবার সেই অট্টহাসি—আর কে যেন বললে—উঠে আয় প্যালা, খুব হয়েছে! এর পরে নির্ঘাৎ ডবল-নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবি!

এ তো বাঘের গলা নয়!

আর কে? নির্ঘাত ক্যাবলা! পাশে টেনিদাও দাঁড়িয়ে। দু-জনে মিলে দন্তবিকাশ করে পরমানন্দে হাসছে—যেন পাশাপাশি একজোড়া শাঁকালুর দোকান খুলে বসেছে।

টেনিদা তার লম্বা নাকটাকে কুঁচকে বললে, পেছন থেকে একটা বাঘের ডাক ডাকলুম আর তাতেই অমন লাফিয়ে জলে পড়ে গেলি! ছোঃ-ছোঃ—তুই একটা কাপুরুষ!

অ! দুজনে মিলে বাঘের আওয়াজ করে আমার সঙ্গে বিটকেল

রসিকতা হচ্ছিল! কী ছোটলোক দেখছ! মিছিমিছি ভিজিয়ে আমায় ভূত করে দিলে—কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে সারা গায়ে!

রেগে আগুন হয়ে আমি নদী থেকে উঠে এলুম। বললুম, খামোকা এরকম ইয়ার্কির মানে কী?

ক্যাবলা বললে, তোরই বা এসব ইয়ার্কির মানে কী? দিব্যি আমাদের পেছনে শামুকের মতো গুঁড়ি মেরে আসছিলি—তারপরেই একেবারে নো-পাত্তা! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলি! ওদিকে আমরা সারাদিন খুঁজে-খুঁজে হয়রান! শেষে দেখি—এখানে বসে মনের আনন্দে পাগলের মতো হাসা হচ্ছে। তাই তোর খরচায় আমরাও একটু হেসে নিলুম।

আমি বললুম, ইচ্ছে করে আমি হাওয়ায় মিলিয়েছিলুম নাকি? আমি তো পড়ে গিয়েছিলুম দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে!

—দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে! সে আবার কী?—ওরা দুজনেই হাঁ করে চেয়ে রইল।

—কিংবা ঘুটঘুটানন্দের গর্তেও বলতে পার।

—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ! ক্যাবলা বারতিনেক খাবি খেল। টেনিদা তেমনি হাঁ করেই রইল—ঠিক একটা দাঁড়কাকের মতো।

—সেইসঙ্গে আছে গজেশ্বর গাড়ুই। সেই হাতির মতো লোকটা।

—অ্যাঁ!

—আর আছে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরগাড়ি।

—অ্যাঁ!

ওরা একদম বোকা হয়ে গেছে দেখে আমার ভারি মজা লাগছিল। ভাবলুম চ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা করে গানটা আবার আরম্ভ করে দিই—কিন্তু পেটের মধ্যে থেকে গুরগুরিয়ে ঠাণ্ডা উঠছে—এখন গাইতে গেলে গলা দিয়ে কেবল গিটকিরি বেরুবে। বললুম, বাংলোয় আগে ফিরে চল—তারপরে সব বলছি।

সব শুনে ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না। স্বামী ঘুটঘুটানন্দই হচ্ছে ঘচাং ফুঃ! সঙ্গে সেই গজেশ্বর গাড়ুই! তারা আবার পাহাড়ের গর্তের মধ্যে থাকে! যা-যাঃ! বাজে গল্প করবার আর জায়গা পাসনি!

টেনিদা বললে, নিশ্চয় জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে প্যালার পালা-জ্বর এসেছিল। আর জ্বরের ঘোরে ওই সমস্ত উষ্টুম-ধুষ্টুম খেয়াল দেখেছিল।

আমি বললুম, বেশ, খেয়ালই সই! কাঁকড়াবিছের কামড়ের জেরটা মিটে যাক না আগে, তারপরে আসবে ঐ গজেশ্বর গাড়ুই। তুমি আমাদের লীডার—তোমাকে ধরে ফাউল কাটলেট বানাবে!

ক্যাবলা বললে, ফাউল মানে হল মুরগি। টেনিদা মুরগি নয়—কারণ টেনিদার পাখা নেই; তবে পাঁটা বলা যায় কি না জানিনে। মুশকিল হল, পাঁটার আবার চারটে পা। আচ্ছা টেনিদা, তোমার হাতদুটোকে কি পা বলা যেতে পারে?

টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে গেল। চাঁটিটা ক্যাবলার মাথায় লাগল না—লাগল চেয়ারের পিঠে। 'বাপরে গেছি'—বলে টেনিদা নাচতে লাগল খানিকক্ষণ।

নাচ-টাচ থামলে বললে, তোদের মতো গোটাকয়েক গাড়োলকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে! ওদিকে হতচ্ছাড়া হাবলাটা যে কোথায় বসে আছে তার পাত্তা নেই। আমি একা কতদূর আর সামলাব!

—আহা-হা—কত সামলাচ্ছ!—ক্যাবলা বললে, তুম কেইসা লীডার—উ মালুম হো গিয়া! তোমাকে যে কে সামলায় তার ঠিক নেই!

টেনিদা আবার চাঁটি তুলছিল—চেয়ার থেকে চট করে সটকে গেল ক্যাবলা।

আমি রেগে বললুম, তোমরা এই কর বসে-বসে! ওদিকে গজেশ্বর ততক্ষণে হাবলাকে চপ করে ফেলুক!

ক্যাবলা বললে, মাটন চপ। হাবলাটা এক-নম্বরের ভেড়া! কিন্তু আপাতত ওঠা যাক টেনিদা। প্যালা সত্যি বলছে কি না একবার যাচাই করে দেখা যাক। চল প্যালা--কোথায় তোর ঘুটঘুটানন্দের গর্ত একবার দেখি। ওঠ টেনিদা—কুইক!

টেনিদা নাক চুলকে বললে, দাঁড়া, একেবার ভেবে দেখি।

ক্যাবলা বললে, ভাববার আর কী আছে? রেডি—কুইক মার্চ। ওয়ান—টু - থ্রি—

টেনিদা কুইনিন-চিবোনোর মতো মুখ করে বললে, মানে, আমি ভাবছিলুম--ঠিক এভাবে পাহাড়ের গুহায় ঢোকাটা কি ঠিক হবে? আমাদের তো দু-এক গাছা লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই—ওদের সঙ্গে হয়ত পিস্তল-বন্দুক আছে। তাছাড়া ওদের দলে হয়ত অনেকগুলো গুণ্ডা—আমরা মোটে তিনজন—ঝাঁটুটাও বাজার করতে গেছে—

ক্যাবলা বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—কী আর হবে টেনিদা? বড়জোর মেরে ফেলবে--এই তো? কিন্তু কাপুষের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরে যাওয়া অনেক ভালো! নিজেদের বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কতগুলো গুণ্ডার ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব টেনিদা? পটলডাঙার ছেলে হয়ে?

বললে বিশ্বাস করবে না—ক্যাবলার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও যেন কেমন তেজ এসে গেল! ঠিক কথা—করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা! পালা-জ্বরে ভুগে-ভুগে এমনভাবে নেংটি ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। ছ্যা-ছ্যা! আরে—একবার বই তো দুবার মরব না!

তাকিয়ে দেখি, আমাদের সর্দার টেনিদাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ভীতু মানুষটা নয়—গড়ের মাঠের গোরা পিটিয়ে যে চ্যাম্পিয়ান

—এ সেই লোক! বাঘের মতো গলায় বললে, ঠিক বলেছিস ক্যাবলা—তুই আজকে আমার আক্কেল-দাঁত গজিয়ে দিয়েছিস! একটা নয়—একজোড়া! হয় হাবুল সেনকে উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরে যাব—নইলে এ পোড়া প্রাণ রাখব না!

—হ্যাঁ, একেই বলে লীডার! এই তো চাই!

তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম তিনজন। ওদের দুটো লাঠি তো ছিলই। আমার সেই ভাঙা ডালটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল, অগত্যা একটা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে চললুম।

এবার আর জায়গাটা চিনতে ভুল হল না। এই তো সেই কামরাঙা গাছ। এই তো সেই পাষণ্ড গোবরটা, যেটা আমাকে পিছলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু গর্তটা? গর্তটা গেল কোথায়?

গর্তের কোন চিহ্নই নেই। খালি একরাশ ঝোপঝাড়।

ক্যাবলা বললে, কই রে—তোর সে গহ্বর গেল কোথায়?

—তাই তো!—

টেনিদা বললে, আমি তখুনি বলেছিলুম—প্যালা, জ্বরের ঘোরে তুই খেয়াল দেখেছিস! স্বামী ঘুটঘুটানন্দ হল কিনা দস্যু ঘচাং ফুঃ! পাগল না প্যাঁজফুলুরি!

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। সত্যিই কি জ্বরের ঘোরে আমি খেয়াল দেখেছি! তাহলে এখনো গায়ে টনটনে ব্যথা কেন? ঐ তো গোবরে আমার পা পেছলানোর দাগ। তাহলে?

ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি? পাখি ওড়ে,—রসগোল্লা উড়ে যায়, চপ কাটলেট হাওয়া হয়—মানে পেটের মধ্যে; কিন্তু অতবড় গর্তটা যে কখনো উড়ে যেতে পারে—সে তো কখনো শুনিনি!

টেনিদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, তোর গর্ত আমাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে— বুঝলি? তাই বলেই বীরদর্পে ঝোপের ওপরে এক পদাঘাত।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপটায় যেন ভূমিকম্প জাগল ! তার চাইতেও বেশি ভূমিকম্প জাগল টেনিদার গায়ে।—আরে আরে বলে চেঁচিয়ে উঠেই ঝোপঝাড়-শুদ্ধু টেনিদা মাটির তলায় অদৃশ্য হল। একেবারে সীতার পাতাল প্রবেশের মতো। তলা থেকে শব্দ উঠল—খচ্ খচ্, ধপাস !

ওগুলো তবে ঝোপ নয় ? গাছের ডাল কেটে গর্তের মুখটা ঢেকে রেখেছিল ?

আমি আর ক্যাবলা কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কী বলব —কী যে করব—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

সেই মুহূর্তেই গর্তের ভেতর থেকে টেনিদার চিৎকার শোনা গেল, ক্যাবলা—প্যালা—

আমরা চেঁচিয়ে জবাব দিলুম, খবর কী টেনিদা ?

—একটু লেগেছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তোরা শিগগির গর্তের খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে ভেতরে নেমে আয়! ভীষণ ব্যাপার এখানে—লোমহর্ষণ কাণ্ড !

শুনে আমাদের লোম খাড়া হয়ে গেল। আমার মনে পড়ল,—করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা ! আমি তৎক্ষণাৎ গর্তের মুখে পা দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম—ক্যাবলাও আমার পেছনে পেছনে।

চোদ্দ

হাবুল সেনের মৃতদেহ

আমি আর ক্যাবলা টপাটপ নিচে নেমে পড়লুম। নেমেই দেখি, কোথাও কিছু নেই। টেনিদা নয়—গজেশ্বর নয়—স্বামী ঘুটঘুটানন্দের ছেঁড়া দাড়ির টুকরোটুকুও নয়।

ব্যাপার কী ! ঘচাং ফুঃর দল টেনিদাকেও ভ্যানিশ করে দিয়েছে নাকি ?

ক্যাবলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, টেনিদা তো এখানেই এক্ষুনি পড়ল রে। গেল কোথায় ?

আমি এতক্ষণে কিন্তু আবছা আবছা আলোয় সাবধানে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কাঁকড়াবিছেটাকে খুঁজছিলুম। সেটা আশেপাশে কোথাও ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি না কে জানে! তার মোক্ষম ছোবল খেয়ে ওই গুণ্ডা গজেশ্বর কোনমতে সামলেছে—কিন্তু আমাকে কামড়ালে আর দেখতে হচ্ছে না—পটলডাঙার পালাজ্বর-মার্কা প্যালারামের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি !

ক্যাবলা আমার মাথায় একটা থাবড়া মেরে বললে, এই, টেনিদা গেল কোথায় ?

—আমি কেমন করে জানব !

কাবলা নাক চুলকে বললে, বড়ী তাজ্জব কি বাত ! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি ?

কিন্তু পটলডাঙার টেনিদা—আমাদের জাঁদরেল লীডার--এত সহজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পাত্র ? তৎক্ষণাৎ কোত্থেকে আবার টেনিদার অশরীরী চিৎকার : ক্যাবলা—প্যালা—চলে আয় শিগগির ! ভীষণ ব্যাপার !

যাব কোথায় ? কোনখান থেকে ডাকছে ? এ যে সত্যিই ভুতুড়ে ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি ! আমায় মাথার চুলগুলো সঙ্গে-সঙ্গে কড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে বলল, টেনিদা, তুমি কোথায় ? তোমার টিকির ডগাও যে দেখা যাচ্ছে না !

আবার কোথা থেকে টেনিদার অশরীরী স্বর : আমি একতলায়।

—একতলায় মানে ?

টেনিদা এবার দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কানা নাকি ? সামনের দেওয়ালে গর্ত দেখতে পাচ্ছিস নে ?

আরে—তাইতো! এদিকের পাথরের দেওয়ালে একটা গর্তই তো বটে! কাছে এগিয়ে দেখি, তার সঙ্গে একটা মই লাগানো ভেতর থেকে। যাকে বলে, রহস্যের খাসমহল!

টেনিদা বললে, বেয়ে নেমে আয়। এখানে ভয়াবহ কাণ্ড—লোমহর্ষণ ব্যাপার!

—অ্যাঁ!

ক্যাবলাই আগে মই বেয়ে নেমে গেল—পেছনে আমি। সত্যিই তো—একতলাই বটে। যেখানে নামলুম, সেটা একটা লম্বা হলঘরের মতো—কোত্থেকে আলো আসছে জানি না—কিন্তু বেশ পরিষ্কার। তার একদিকে একটা ইটের উনুন—গোটা-দুত্তিন ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি—এক কোণায় একটা ছাইগাদা আর তার মাঝখানে—

টেনিদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। ওধারে হাবুল সেন পড়ে আছে—একেবারে ফ্ল্যাট।

টেনিদা হাবুলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই গ্যাখ!

ক্যাবলা বললে, হাবুল!

আমি বললাম, অমন করে আছে কেন?

টেনিদার গলা কাঁপতে লাগল: নিশ্চয় ওকে খুন করে রেখে গেছে!

আমার যে কী হল জানি না। খালি মনে হতে লাগল, ভয়ে একটা কচ্ছপ হয়ে যাচ্ছি! আমার হাত-পা একটু-একটু করে পেটের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমার পিঠের ওপর যেন শক্ত খোলা তৈরি হচ্ছে একটা। আর একটু পরে গুড়গুড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে নামব।

আমি কোনমতে বলতে পারলাম: ওটা হাবুল সেনের মৃতদেহ!

কথা নেই—বার্তা নেই—টেনিদা হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললে:

—ওরে হাবলা রে! এ কী হল রে! তুই হঠাৎ খামোকা এমন করে বেঘোরে মারা গেলি কেন রে! ওরে কলকাতায় গিয়ে তোর দিদিমাকে আমি কী বলে বোঝাব রে! ওরে—কে আর আমাদের এমন করে আলুকাবলি আর ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াবে রে!

ক্যাবলা বললে, আরে জী, রোও মৎ। আগে ছাখো—জিন্দা আছে কি মুর্দা হয়ে গেছে।

আমারও খুব কান্না পাচ্ছিল। হাবুল প্রায়ই ওর দিদিমার ভাঁড়ার লুঠ করে আমের আচার আর কুলচুর এনে আমায় খাওয়াতো। সেই আমের আচারের কৃতজ্ঞতায় আমার বুকের ভেতরটা হায়-হায় করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাক-টাক মুছে ফেললুম। আমার আবার কী যে বিচ্ছিরি স্বভাব—কান্না পেলেই কেমন যেন সর্দি-টর্দি হয়ে যায়।

বারতিনেক নাক টেনে আমি বললুম, আলবত মরে গেছে! নইলে অমন করে পড়ে থাকবে কেন?

ক্যাবলাটার সাহস আছে—সে গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়ে হাবুলের মৃতদেহের পেটে একটা খোঁচা মারল। আর, কী আশ্চর্য ব্যাপার—অমনি মৃতদেহ উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

—বাপরে—ভূত হয়েছে! বলেই আমি একটা লাফ মারলুম। আর লাফিয়ে উঠতেই টেনিদার খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটার একটা ধাক্কা লাগল আমার মাথায়। কী শক্ত নাক—মনে হল যেন চাঁদিটা স্রেফ ফুটো হয়ে গেছে!—নাক গেল—নাক গেল—বলে টেনিদা একটা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, আর ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়লুম আমি।

আর তক্ষুনি দিব্বি ভালো মানুষের মতো গলায় হাবুল বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা খাইয়া খাসা ঘুমাইতে আছিলাম, দিলি ঘুমটার দফা সাইর‍্যা!

তখন আমার খটকা লাগল। ভূতেরা তো চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা

বলে—এ তো বেশ ঝরঝরে বাংলা বলে যাচ্ছে! আর, পরিষ্কার ঢাকাই বাংলা!

টেনিদা খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে উঠল।

—আহা-হা—কী আমার রাজশয্যে পেয়েছেন রে—যে নবাবি চালে ঘুমোচ্ছেন! ইদিকে তখন থেকে আমরা খুঁজে মরছি—হতচ্ছাড়ার আক্কেলটা ছ্যাখো একবার!

হাবুল আয়েস করে একটা হাই তুলে বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা সাঁইট্যা বর জব্বর ঘুমখানা আসছিল! তা, গজাদা কই? স্বামীজী কই গেলেন?

টেনিদা বললে, ইস, বেজায় যে খাতির দেখছি! স্বামিজী—গজাদা!

হাবুল বললে, খাতির হইব না ক্যান? কাইল বিকালে আসছি—সেই থিক্যা সমানে খাইত্যাছি। কী আদর যত্ন করছে—মনে হইল য্যান ঠিক মামাবাড়ি আসছি! তা, তারা গেল কই?

ক্যাবলা বললে, তারা গেল কই—সে আমরা কী করে জানব? তা, তুই কী করে ওদের পাল্লায় পড়লি? এখানে এলিই বা কী করে?

—ক্যান আস্থুম না? একটা লোক আইস্যা আমারে কইল, খোকা—এইখানে পাহাড়ের তলায় গুপ্তধন আছে। নিবা তো আইস। বড়লোক হওনের অ্যামন সুযোগটা ছাড়ুম ক্যান? এইখানে চইল্যা আসছি। স্বামীজী—গজাদা—আমারে যে যত্ন করছে—কী কমু!

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, হ, কী আর কবা! এখানে বসে উনি রাজভোগ খাচ্ছেন, আর আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি!

ক্যাবলা বললে, এসব কথা এখন থাক। এই গর্তের মধ্যে ওরা কজন থাকত রে?

—জনচারেক হইব।

—কী করত?

—কেমনে জানুম ? একটা কলের মতো আছিল—সেইটা দিয়া খুটুর-খুটুর কইরা কী য্যান ছাপাইতো। সেই কলডাও তো দ্যাখতে আছি না। চইল্যা গেল নাকি ? আহা হা, বড় ভালো খাইতে আছিলাম রে !—হাবুলের বুক ভেঙে দীর্ঘনিশ্বাস বেরুল একটা।

—থাক তোর খাওয়া !—টেনিদা বললে, চল্ এবার বেরুনো যাক এখান থেকে। আমরা সময়-মতো এসে পড়েছিলুম—নইলে খাইয়ে খাইয়েই তোকে মেরে ফেলত !

আমি বললুম, উঁহু, মোটা করে শেষে কাটলেট ভেজে খেত।

ক্যাবলা বললে, বাজে কথা বন্ধ কর। হ্যাঁ রে হাবুল—ওরা কী ছাপত রে ?

—ক্যামন কইরা কই ? ছবির মতো কিসব ছাপাইত।

—ছবি মতো কিসব ! ক্যাবলা নাক চুলকোতে লাগল : পাহাড়ের গর্তের মধ্যে চুপি চুপি ! বাংলোতে লোক এলেই তাড়াতে চাইত ! জঙ্গলের মধ্যে একটা নীল মোটর ! শেঠ ঢুণ্ডুরাম !

টেনিদা বললে, চুলোয় যাক শেঠ ঢুণ্ডুরাম ! হাবুলকে পাওয়া গেছে—আপদ মিটে গেছে। ও টা নয় হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা সাবড়েছে —কিন্তু আমাদের পেটে যে ছুঁচের দল সংকীর্তন গাইছে রে ! চল বেরোই এখান থেকে—

আমি বললুম আবার ওই মই বেয়ে ?

হাবুল বললে, মই ক্যান ? এইখান দিয়াই তো যাওনের রাস্তা আছে।

—কোন্‌দিকে রাস্তা ?

—ঐ তো সামনেই।

হাবুলই দেখিয়ে দিলে। হলঘরের মতো সুড়ঙ্গটা পেরুতেই দেখি, বাঃ ! একেবারে যে সামনেই পাহাড়ের একটা খোলা মুখ ! আর কাছেই সেই নদীটা—সেই শালবন !

ক্যাবলা বললে, কী আশ্চর্য, তুই তো ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতিস হাবলা !

হাবুল বললে, পালাইতে যামু ক্যান ? অমন আরামের খাওন-দাওন ! ভাবছিলাম—দুই-চাইরটা দিন থাইক্যা স্বাস্থ্যটারে এইটু ভালো কইর‍্যা লই।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, ভালো কইরা ! হতচ্ছাড়া—পেটুকদাস ! তোকে যদি গজেশ্বর কাটলেট বানিয়ে খেত, তাহলেই উচিত শিক্ষা হত তোর !

কিন্তু বলতে বলতেই—

হঠাৎ মোটরের গর্জন।

মোটর ! মোটর আবার কোত্থেকে ? আবার কি শেঠ ঢুণ্ডুরাম ?

হ্যাঁ—ঢুণ্ডুরামই বটে। সেই নীল মোটরটা। কিন্তু এদিকে আসছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ—তারপর পাতার আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। যেন আমাদের ভয়েই উর্ধ্বশ্বাসে পালালো ওটা।

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই মোটরে কার যেন একমুঠো দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। তামাক-খাওয়া লালচে পাকা দাড়ি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি ?

পনেরো

'চিড়িয়া ভাগল বা'

দূরে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরটাকে চলে যেতে দেখেই ক্যাবলা বললে, চুক-চুক-চ্চু !

টেনিদা জিজ্ঞেস করলে, কী হল রে ক্যাবলা ?

—কী আর হবে ? চিড়িয়া ভাগল বা।

—চিড়িয়া ভাগল বা মানে ?

আমি বললুম, বোধহয় চিঁড়ে-টিড়ের ভাগ হবে। চিঁড়ে কোথায় পেলি রে ক্যাবলা ? দে না চাট্টি খাই ! বড্ড খিদে পেয়েছে।

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, বহুৎ হুয়া, আর ওস্তাদি করতে হবে না ! চিঁড়ে নয় রে বেকুব—চিঁড়ে নয়—-চিড়িয়া ভাগল বা মানে হল, পাখি পালিয়েছে।

আমি বললুম, পাখি ? নাঃ—পালায় নি তো ! ওই তো দুটো কাক ওই গাছের ডালে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, দুত্তোর ! এই প্যালাটার মগজে খালি বাকস পাতার রস আর সিঙি মাছ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই ! শেঠ ঢুণ্ডুরামের মোটরে করে সব পালাল—দেখছিস না ? স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি দেখতে পাসনি ?

—পালিয়েছে তো হয়েছে কী ?—টেনিদা বলল, আপদ গেছে !

হাবুল তখনো দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। একহাঁড়ি রসগোল্লার নেশা ওর কাটেনি। হঠাৎ আলোর-খোঁচা-খাওয়া প্যাঁচার মতো চোখ মেলে বললে, আহা-হা, গজাদা চইল্যা গেল ? বড় ভালো লোক আছিল গজাদা !

ক্যাবলা বললে, তুই থাম হাবুল, বেশি বকিসনি ! গজাদা ভালো লোক ! ভালো লোকই তো বটে ! তাই তো বাংলো থেকে আমাদের তাড়াতে চায়—তাই পাহাড়ের গর্তের মধ্যে বসে কুট্টুর-কাট্টুর করে কী সব ছাপে ! আর শেঠ ঢুণ্ডুরাম কী মনে করে একটা নীল মোটর নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়ায় ?—ক্যাবলা পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল, হুঁ-হুঁ-হুঁ ! আমি বুঝতে পেরেছি !

টেনিদা বললে, খুব যে ডাঁটের মাথায় হুঁ-হুঁ করছিস ! কী বুঝেছিস বল্ তো ?

ক্যাবলা সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকাল। তারপর গলাটা ভীষণ গম্ভীর করে বললে, আমাদের দলে কাপুরুষ কে কে ?

এমন করে বললে, যে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা একেবারে গুর-গুর করে উঠল। একবার অঙ্কের পরীক্ষার দিনে পেট-ব্যথা হয়েছে বলে মটকা মেরে পড়েছিলুম। মেজদা তখন ডাক্তারি পড়ে —আমার পেট-ব্যথা শুনে সে একটা আট হাত লম্বা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইঞ্জেকশন দিতে এসেছিল, আর তক্ষুনি পেটের ব্যথা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পায়নি। ক্যাবলার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল সেও যেন এইরকম একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমায় তাড়া করছে।

আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলুম—একমাত্র আমিই কাপুরুষ, কিন্তু সামলে গেলুম।

টেনিদা বললে, কাপুরুষ আবার কে ? আমরা সবাই বীরপুরুষ !

—তাহলে চল—যাওয়া যাক।

—কোথায় ?

—ঐ নীল মোটরটাকে পাকড়াও করতে হবে।

বলে কী, পাগল না পাঁপড়-ভাজা ! মাথা-খারাপ না পেট-খারাপ ! মোটরটা কি ঘুটঘুটানন্দের লম্বা দাড়ি যে হাত বাড়িয়ে পাকড়াও করলেই হল !

হাবুল সেন বললে, পাকড়াও করবা কেমন কইর‍্যা ? উইড়্যা যাবা নাকি ?

ক্যাবলা বললে, চল—বড়-রাস্তায় যাই। ওখান দিয়ে অনেক লরি যাওয়া-আসা করে, তাদের কিছু পয়সা দিলেই আমাদের তুলে নেবে।

—আর ততক্ষণ নীল মোটরটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাকবে ?

—নীল মোটর আর যাবে কোথায়—বড়-জোর রামগড়। আমরা রামগড়ে গেলেই ওদের ধরতে পারব।

—যদি না পাই ? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—আবার ফিরে আসব।

—কিন্তু মিথ্যে এ-সব দৌড়ঝাঁপের মানে কী ?—টেনিদা বললে, খামোকা ওদের পিছু-পিছু ধাওয়া করেই বা লাভ কী হবে ? পালিয়েছে, আপদ গেছে ! এবার বাংলোয় ফিরে প্রেমসে মুরগির ঠ্যাং চর্বণ করা যাবে। ওসব বিচ্ছিরি হাসি-টাসিও আর শুনতে হবে না রাত্তিরে !

ক্যাবলা বুক থাবড়ে বললে, কভি নেহি ! আমাদের বোকা বানিয়ে ওরা চলে যাবে—সারা পটলডাঙার যে বদনাম হবে তাতে ! তারপর আর পটলডাঙায় থাকা যাবে না—সোজা গিয়ে আলু-পোস্তায় আস্তানা নিতে হবে ! ওসব চলবে না, দোস্ত। তোমরা সঙ্গে যেতে না চাও, না গেলে। কিন্তু আমি যাবই।

টেনিদা বললে, একা ?

—একা।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—আমরাও তাহলে বেরিয়ে পড়ি !

আমি শেষবারের মতো চাঁদির ওপরটা চুলকে নিলুম।

—কিন্তু ওদের সঙ্গে যে গজেশ্বর আছে ! কাঁকড়াবিছের কামড়ে সেবার একটু জব্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার যদি হাতের মুঠোয় পায় তাহলে সক্কলকে কাটলেট বানিয়ে খাবে। পেঁয়াজ-চচ্চড়িও করতে পারে। কিংবা পোস্তর বড়া।

—কিংবা পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল !—ক্যাবলা তিনটে দাঁত বের করে দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই রকম ভেংচে দিলে : তাহলে তুই একাই থাক এখানে—আমরা চললুম।

পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোলকে অপমান করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। পটোল নিয়ে ইয়ার্কি নয়, হুঁ-হুঁ ! আমাদের পাড়া হচ্ছে কলকাতার সেরা পাড়া—তার নাম পটলডাঙা। মানুষ মরে গেলে তাকে পটোল তোলা বলে। আমার এক মাসতুতো ভাই আছে—তার নাম পটল : সে একসঙ্গে দেড়শো আলুর চপ আর দুশো বেগুনি

খেতে পারে। ছোড়দির একটা পাঁটা ছিল—সেটার নাম পটল—সে মেজদার একটা সখের শাদা নাগরাকে সাত মিনিট তেরো সেকেণ্ডের মধ্যে খেয়ে ফেলেছিল—ঘড়ি ধরে মিলিয়ে দেখেছিলুম আমি। আর, শিঙি মাছের কথা কে না জানে! আর কোন্ মাছের শিং আছে? মতান্তরে ওকে সিংহ মাছও বলা যায়—মাছেদের রাজ্যে ও হল সিংহ। আর তোরা কী খাস বল্! আলু, আর পোনা মাছ। আলু শুনলেই মনে পড়ে আলু প্রত্যয়। সেইসঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের বিচ্ছিরি গাঁট্টা। আর পোনা! ছোঃ! লোকে কথায় বলে—ছানাপোনা—পুঁচকে এত্তোটুকু! কোথায় সিংহ, আর কোথায় পোনা! কোনো তুলনা হয়! রামচন্দ্র!

আমি যখন এইসব তত্ত্বকথা ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় আমার কান কটকট করছে, তখন হঠাৎ দেখি ওরা দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফেলেই।

অগত্যা পটোল আর শিঙি মাছের ভাবনা থামিয়ে আমাকে ওদেরই পিছু-পিছু ছুটতে হল।

বড় রাস্তাটা আমাদের বাংলো থেকে মাইল-দেড়েক দূরে। যেতে-যেতে কাঁচা রাস্তায় আমরা মোটরের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছিলুম। এক জায়গায় দেখলুম একটা শালপাতার ঠোঙা পড়ে রয়েছে। নতুন—টাটকা শালপাতার ঠোঙা। কেমন কৌতূহল হল—ওরা দেখতে না পায় এমনিভাবে চট করে তুলে নিয়ে সেটা শুঁকে ফেললুম। ইঃ—নির্ঘাত সিঙাড়া! এখনো তার খোস্‌বু বেরুচ্ছে!

কী ছোটলোক! সবগুলো খেয়ে গেছে! এক-আধটা রেখে গেলে কী এমন ক্ষেতিটা ছিল!

—এই প্যালা—মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লি ক্যান র‍্যা?—টেনিদার হাঁক শোনা গেল।

এমনিতেই ক্ষিদে পেয়েছে—ঘ্রাণে অর্ধভোজন হচ্ছিল, সেটা ওদের

সইল না। চটপট ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে আবার আমি ওদের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলুম। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। ঠোঙাটা আরো একটু শোঁকবার একটা গভীর বাসনা আমার ছিল।

বড় রাস্তায় যখন এসে পড়েছি—তখন, ভোঁক—ভোক! একটা লরি।

আমি হাত তুলে বলতে যাচ্ছিলুম—রোখ্‌কে—রোখ্‌কে—কিন্তু ক্যাবলা আমার হাত চেপে ধরলে। বললে, কী যে করিস গাড়োলের মতো তার ঠিক নেই! ওটা তো রামগড় থেকে আসছে!

—ওরা তো উল্টো দিকেও যেতে পারে!

—তুই একটা ছাগল! দেখছিস না কাঁচা রাস্তার ওপরে ওদের মোটরের চাকা কিভাবে বাঁক নিয়েছে! অর্থাৎ ওরা নির্ঘাত রামগড়ের দিকেই গেছে। উল্টো দিকে হাজারিবাগ—সেদিকে যায়নি।

ইস্—ক্যাবলার কী বুদ্ধি! এই বুদ্ধির জন্যেই ও ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়—আর আমার কপালে জোটে লাড্ডু! তাও অঙ্কের খাতায়। আমার মনে হল লাড্ডু কিংবা গোল্লা দেবার ব্যবস্থাটা আরো নগদ করা ভালো। খাতায় পেনসিল দিয়ে গোল্লা বসিয়ে কী লাভ হয়? যে গোল্লা খায়—তাকে একভাঁড় রসগোল্লা দিলেই হয়! কিংবা গোটা-আষ্টেক বড়বাজারের লাড্ডু! কিন্তু তিলের নাড়ু নয় —একবার একটা খেয়ে সাতদিন আমার দাঁত ব্যথা করেছিল।

—ঘর্‌র্—ঘ্যাঁস!

পাশে একটা লরি এসে থামল। কাঠ-বোঝাই। ক্যাবলা হাত তুলে সেটাকে থামিয়েছে। লরি-ড্রাইভার গলা বের করে বললে, কী হয়েছে খোকাবাবু? তুমরা ইখানে কী করছেন?

—আমাদের একটু রামগড়ে পৌঁছে দিতে হবে ড্রাইভার সাহেব!

—পয়সা দিতে হবে যে! চার আনা।

—তাই দেব।

—তবে উঠে পড়। লেকিন কাঠকে উপর বোসতে হোবে।

—ঠিক আছে। কাঠে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

ক্যাবলা আমাদের তাড়া দিয়ে বললে, টেনিদা—ওঠ! হাবলা—আর দেরি করিসনি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন প্যালা? উঠে পড় শিগগির—

ওরা তো উঠল। কিন্তু আমার ওঠা কি অত সহজ? টেনে-হিঁচড়ে কোনমতে যখন লরির ওপরে উঠে কাঠের আসনে গদিয়ান হলুম—তখন আমার পেটের খানিক নুন-ছাল উঠে গেছে। সারা গা চিড়-বিড় করে জ্বলছে।

আর তক্ষুনি—

ভোঁক-ভোঁক করে আরো গোটা-দুই হাঁক ছেড়ে গাড়ি ছুটল রামগড়ের রাস্তায়। এঃ—কী যাচ্ছেতাইভাবে নড়ছে যে কাঠগুলো! কখন ধপাস করে উলটে পড়ে যাই—তার ঠিক নেই! আমি সোজা উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দুহাতে মোটা কাঠের গুঁড়িটা জাপটে ধরলুম।

লরিটা পাঁই-পাঁই করে ছুটতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, পেল্লায় ঝাঁকুনির চোটে আমার পেটের নাড়ি-টাড়িগুলো সব একসঙ্গে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে।

ষোলো

'মোক্ষম লাড্ডু'

কাঠের লরির সে কী দৌড়! একে তো হৈ-হৈ করে ছুটছে, তায় ভেতরের কাঠগুলো যেন হাত-পা তুলে নাচতে শুরু করেছে। যদিও মোটা দড়ি দিয়ে কাঠগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধা, তবু মনে হচ্ছিল কখন যেন আমাদের নিয়ে ওরা চারদিকে ছিটকে পড়ে যাবে।

জাম-ঝাঁকানো দেখেছ কখনো? সেই যে দুটো বাটির মধ্যে পুরে ঝকর-ঝকর করে ঝাঁকায়—আর জামের আঁটি-টাটিগুলো সব

আলাদা হয়ে যায় ? ঠিক তেমনি করে আমার জ্বরের পিলে-টিলে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। আমার সন্দেহ হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ পরে আমি আর পটলডাঙার প্যালারাম থাকব না—একেবারে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকচ্ছপ হয়ে যাব। মানে, সব মিলিয়ে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাব।

এর মধ্যে—ঝড়াৎ - ঝড়াৎ ! নাকের ওপর দিয়ে কে যেন চাবুক হাঁকড়ে দিলে ! একটা গাছের ডাল।

টেনিদা বললে, ইঃ—এই হতভাগা ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়েই আজ মাঠে মারা যাব !

ক্যাবলা ইস্টুপিডটা এর মধ্যেও রসিকতার চেষ্টা করলে : মাঠে নয়—রাস্তায়। রামগড়ের রাস্তায়।

—রাস্তায় ! টেনিদা দাঁত খিচিয়ে বললে, দাঁড়া না একবার, রামগড় পৌঁছে যাই আগে ! তারপর—

তারপর বললে—কোঁৎ !

মানে, ক্যাবলাকে কোঁৎ করে গিলে খাবে তা বললে না। একটা মোক্ষম ঝাঁকুনি খেয়ে ওটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

হাবুল সেন ঘ্যান-ঘ্যান করতে লাগল : ইস্, কর্ম তো সারছে ! প্যাটের মধ্যে গজাদার রসগোল্লা যে ছানা হইয়া গেল !

আমি বললুম, শুধু ছানা ? এর পরে দুধ হয়ে যাবে।

টেনিদা আবার শুরু করলে : দুধ ? দুধেও কুলোবে না। একটু পরে পেট ফুঁড়ে শিং-টিং-শুদ্ধু একটা গোরুও বেরিয়ে আসবে—দেখে নিস !

হাবুল আবার ঘ্যান-ঘ্যান করে বললে, হঃ—সত্য কইছ ! প্যাট ফুইড়্যা গোরুই বাহির হইব অখনে !

ক্যাবলা চেঁচিয়ে গান ধরলে, প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ !

টেনিদা রেগেমেগে কি একটা বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন

সময় আবার সেই পেল্লায় ঝাঁকুনি। টেনিদা সংক্ষেপে বললে, ঘোঁ-ঘোঁ ঘোঁৎ!

কিন্তু সব দুঃখেরই শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত লরি রামগড়ের বাজারে এসে পৌঁছুল।

গাড়িটা এখন একটু আস্তে আস্তে যাচ্ছে—আমরা চারজন কোন মতে কাঠের ওপর উঠে বসেছি। হঠাৎ—

—আরে ভগলু, দেখ্ ভাইয়া! লরিকা উপর চার লেড়কা বান্দরকা মাফিক বৈঠল বা!

তিনটে কালো-কালো ছোকরা। আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসছে।

আমি ভীষণ রেগে বললুম, তুম্‌লোগ্ বান্দর হো! তুম্‌লোগ্ বুদ্ধু হো!

শুনে একজন অমনি বোঁ করে একটা ঢিল চালিয়ে দিলে—একটুর জন্যে আমার কানে লাগল না। আমাদের লরির ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল, মারকে টিক্কি উখাড় দেব—হুঁ!

ছোকরাগুলোর অবশ্য টিকি ছিল না, তবু দাঁত বের করে ভেংচি কাটতে কাটতে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লরিটা আর-একটু এগোতেই ক্যাবলা বললে,—টেনিদা, কুইক! ওই যে নীল মোটর!

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো! আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল রঙের মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার বুকের ভেতর ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। আবার সেই গজেশ্বর! সেই ষণ্ডা জোয়ান ভয়ঙ্কর লোকটা! এর চাইতে লরির ওপরে কচ্ছপরাম হয়ে থাকলেই ভালো হত—অনেক বেশি আরাম পাওয়া যেত!

কিন্তু ক্যাবলা ছাড়বার পাত্র নয়। টেনে নামাল শেষ পর্যন্ত।

—শোন প্যালা। তুই আর হাবলা এই পিপুল গাছটার তলায় বসে থাক। বসে-বসে ওই নীল মোটরটাকে ওয়াচ কর। আমরা ততক্ষণে একটা কাজ সেরে আসি।

লরিটা ভাড়া বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাছে থাকলে আমি আবার তড়াক করে ওটার ওপরে উঠে বসতুম—তারপর যেদিকে হোক সরে পড়তুম। কিন্তু এ কী গেরো রে বাপু! এই পিপুল গাছতলায় বসে ওয়াচ করতে থাকি, আর এর মধ্যে গজেশ্বর এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড় চেপে ধরুক!

আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাই না? হাবুল এখানে একাই সব ম্যানেজ করতে পারবে।

ক্যাবলা বললে, বেশি ওস্তাদি করিসনি! যা বললুম তাই কর —বসে থাক ওখানে। গাড়িটার ওপরে বেশ করে লক্ষ্য রাখিস। আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব। এস টেনিদা—

এই বলে, পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ওরা টুক করে যেন কোন দিকে চলে গেল।

আমি বললুম, হাবলা!

—উঁ?

—দেখলি কাণ্ডটা?

হাবলা তখন পিপুল গাছের গোড়ায় বসে পড়েছে। মস্ত একটা হাই তুলে বললে, হঃ—সইত্য কইছ!

—এভাবে বোকার মতো এখানে বসে থাকবার কোনো মানে হয়?

হাবুল আর-একটা হাই তুলে বললে, নাঃ! তার চাইতে ঘুমানো ভালো। আমার কাঁচা ঘুমটা তোরা মাটি কইর‍্যা দিছস—তার উপর লরির ঝাঁকানি!—ইস্—শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করতে আছে!

এই বলেই হাবুল পিপুল গাছটায় ঠেসান দিলে। আর তখুনি চোখ বুজোলো। বললে বিশ্বাস করবে না—আরো একটু পরে 'ফর্‌র্‌ ফোঁ-ফোঁ' করে হাবুলের নাক ডাকতে লাগল।

কাণ্ডটা ভাখ একবার!

আমি ডাকলুম, হাবলা - হাবলা—

নাকের ডাক থামিয়ে হাবুল বললে, উঁ?

—এই দিন-দুপুরে গাছতলায় বসে ঘুমুচ্ছিস কী বলে?

হাবুল ব্যাজার হয়ে বললে, বেশি চিল্লাচিল্লি করবি না প্যালা—কইয়া দিলাম। শান্তিতে একটু ঘুমাইতে দে।—সঙ্গে-সঙ্গেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর নাকের ভেতর থেকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শব্দ হতে লাগল—যেন ঝাঁক বেঁধে চড়ুই উড়ে যাচ্ছে।

কী ছোটলোক—কী ভীষণ ছোটলোক! এখন আমি একা বসে ঠায় পাহারা দিই! কী যে রাগ হল বলবার নয়! ইচ্ছে করতে লাগল ওর কানে কটাং করে একটা চিমটি দিই। কিন্তু তক্ষুনি দেখলুম, তার চাইতেও ভালো জিনিস আছে। বেশ মোটা-মোটা একদল লাল পিঁপড়ে যাচ্ছে মার্চ করে। ওদের গোটাকয়েক ধরে ক্যাবলার নাকের ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে লাল পিঁপড়ে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

—আরে খোঁকা—তুমি এহিখানে?

তাকিয়ে দেখি, শেঠ ঢুণ্ডুরাম!

ভয়ে আমার পেটের মধ্যে এক ডজন পটোল আর দু-ডজন শিঙি মাছ একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। আমি একটা মস্ত হাঁ করলুম, শুধু বললুম, আ—আ—আ—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম হাসলেন: রামগড়ে বেড়াইতে এসেছো? তা বেশ, বেশ। কিন্তু এহিখানে গাছের তলায় বসিয়ে কেনো? লেকিন মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বহুৎ খিদে পেয়েছে।

খিদে ? বলে কী ! সেই শালপাতার ঠোঙাটা শোঁকার পর থেকে আমার সমস্ত মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে আকাশ খাই, পাতাল খাই ! এমন অবস্থা হয়েছে যে শেঠ ঢুণ্ডুরামের ভুঁড়িটাতেই হয়ত কটাৎ করে কামড় বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সে কথা কি আর বলা যায় ?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে খিদে পেয়েছে—তাতে লজ্জা কী ? আইসো হামার সঙ্গে। ঐ দোকানে বহুৎ আচ্ছা লাড্ডু মিলে—গরমাগরম সিঙাড়া ভি আছে। খাবে ? হামি খিলাবো—তোমাকে পয়সা দিতে হোবে না।

এই পটলডাঙার প্যালারামকে বাঘ-ভালুক কায়দা করতে পারে না—টেনিদার গাঁট্টা দেখেও সে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে, অঙ্কে গোল্লা খেলেও তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায় না। কিন্তু খাবারের নাম করেছ কি, এমন দুর্ধর্ষ প্যালারাম একেবারে বিধ্বস্ত !

আমি আমতা আমতা করে বললুম,—লেকিন শেঠজী, গজেশ্বর—

ঢুণ্ডুরাম চোখ কপালে তুলে বললেন, গজেশ্বর ? কৌন্ গজেশ্বর ?

আমি বললুম, সেই যে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান—হাতির মতো চেহারা—আপনার গাড়িতে এসেছে—

ঢুণ্ডুরাম বললে, রাম—রাম—সীতারাম ! হামি কোনো গজেশ্বরকে জানে না। হামার গাড়িতে হামি ছাড়া কেউ আসেনি।

—তবে যে স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি—

—ঘুটঘুটানন্দ ? ঢুণ্ডুরাম ভেবে-চিন্তে বললেন, হাঁ—হাঁ—একঠো বুড্ঢা রাস্তায় হামার গাড়িতে উঠেছিল বটে। হামাকে বললে শেঠজী রামগড় বাজারে আমি নামবে। হামি তাকে নামাইয়ে দিলম। সে ইস্টেশনের দিকে চলিয়ে গেল।

এর পরে আর অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে ?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আইসো খোকা—আইসো! ভালো লাড্ডু আছে—গরম সিঙাড়া ভি আছে—

আর থাকা গেল না। পটলডাঙার প্যালারাম কাত হয়ে গেল। হাবলা তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর ওর নাকের ভেতর থেকে সমানে চড়ুই পাখি উড়ছে। একবার মনে হল ওকে জাগাই—

তারপরেই ভাবলুম: না—থাক পড়ে। আমি একাই গুটি-গুটি ঢুণ্ডুরামের সঙ্গে গেলাম।

মস্ত খাবারের দোকান। থরে-থরে লাড্ডু আর মোতিচুর সাজানো। প্রকাণ্ড কড়াইয়ে গরম সিঙাড়া ভাজা হচ্ছে। গন্ধেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়!

শেঠজী বললেন, আইসো খোকা—ভিতরে আইসো!

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, গজেশ্বর কিম্বা ঘুটঘুটানন্দের টিকির ডগাটিও কোথাও নেই।

ঢুকে তো পড়ি!

দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট খাবারের ঘর। বসেই শেঠজী ফরমাস করলেন, স্পেশাল এক ডজন লাড্ডু আউর ছ-ঠো সিঙাড়া—

আমি বিনয় করে বললুম, আবার অত কেন শেঠজী?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে বাচ্চা—খাও না! বহুৎ বঢ়িয়া চীজ আছে!

শালপাতায় করে বঢ়িয়া চীজ এল। একটা লাড্ডু খেয়ে দেখি—যেন অমৃত! সিঙাড়া তো নয়—যেন কচি পটোল দিয়ে সিঙি মাছের ঝোল! আর বলতে হল না, আমি কাজে লেগে গেলুম।

গোটাচারেক লাড্ডু আর গোটাদুই সিঙাড়া খেয়েছি—এমন সময় হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। তারপরে চোখে অন্ধকার দেখলুম। তারপর—

স্পষ্ট শুনলুম—গজেশ্বরের অট্টহাসি!

—পেয়েছি এটাকে! এক নম্বরের বিচ্ছু! আজই এটাকে আমি আলু-কাবলি বানিয়ে খাব!

ব্যস—দুনিয়া একেবারে অথই অন্ধকার! আমি চেয়ার-টেয়ার শুদ্ধ হুড়মুড় করে মাটিতে উলটে পড়ে গেলুম।

সতেরো

'খেলা খতম!'

চটকা ভাঙতেই মনে হল, এ কোথায় এলুম?

কোথায় ঝন্টিপাহাড়ের বাংলো—কোথায় রামগড়—কোথায় কী! চারিদিকে তাকিয়ে নিজের চোখকেই ভালো করে বিশ্বাস হল না।

দেখলুম মস্ত একটা পাহাড়েয় চুড়োয় বসে আছি। ঠিক চুড়োয় নয়, তা থেকে একটু নিচে। আর চুড়োর মুখে একটা উনুনের মতো—তা থেকে লক-লক করে আগুন বেরুচ্ছে।

ভূগোলের বইয়ে পড়েছি…সিনেমার ছবিতেও দেখেছি। ঠিক চিনতে পারলুম আমি। বলে ফেললুম, এটা নিশ্চয় আগ্নেয়গিরি!

যেই বলা, সঙ্গে-সঙ্গে কারা যেন হা-হা করে হেসে উঠল। সে কী হাসি! তার শব্দে পাহাড়টা থর-থর করে কেঁপে উঠল—আর আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের শিখা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে।

চেয়ে দেখি—একটু দূরে বসে তিনটে লোক হেসে কুটোপাটি। একজন শেঠ ঢুণ্ডুরাম—হাসির তালে-তালে শেঠজীর ভুঁড়িটা ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে উঠছে। তাঁর পাশেই বসে আছেন স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—হাসতে হাসতে নিজের দাড়ি ধরেই টানাটানি করছেন। আর পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতো গজেশ্বর আকাশ-জোড়া হাঁ মেলে অট্টহাসি হাসছে।

ওদের তিনজনকে দেখেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! পেটের পিলেতে একেবার ভূমিকম্প জেগে উঠল।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, এত হাসছ কেন তোমরা? হাসির কী হয়েছে?

শুনে আবার একপ্রস্থ হাসি। আর গজেশ্বর পেটে হাত দিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল।

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হোঃ—হোঃ! আগ্নেয়গিরিই হচ্ছেন বটে! এইটা কোন্ আগ্নেয়গিরি জানো খোঁকা?

—কী করে জানব? এর আগে তো কখনো দেখিনি!

—এইটা হচ্ছেন ভিসুভিয়াস।

—ভিসুভিয়াস?—শুনে আমার চোখ কপালে উঠল। ছিলুম রামগড়ে, সেখান থেকে ভিসুভিয়াস যে এত কাছে এ খবর তো আমার জানা ছিল না!

আমি বললুম, ভিসুভিয়াস তো জার্মানিতে! না কি, আফ্রিকায়?

শুনেই গজেশ্বর চোখ পাকিয়ে এক বিকট ভেংচি কাটল।

—ফুঃ, বিদ্যের নমুনাটা দ্যাখো একবার! এই বুদ্ধি নিয়েই উনি স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করবেন! ভিসুভিয়াস জার্মানিতে—ভিসুভিয়াস আফ্রিকায়! ছোঃ ছোঃ!

আমি নাক চুলকে বললুম, তাহলে বোধহয় আমেরিকায়?

শুনে গজেশ্বর বললে, এঃ, এর মগজে গোবরও নেই—একদম খটখটে ঘুঁটে! সাধে কি পরীক্ষায় গোল্লা খায়! ভিসুভিয়াস তো ইটালিতে।

—ওহো—তাও হতে পারে। তা, ইটালি আর আমেরিকা একই কথা।

—একই কথা?—গজেশ্বর বললে, তোমার মুখ আর ঠ্যাং একই কথা? পাঁঠার কালিয়া আর পলতার বড়া একই কথা?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, ওর কথা ছেড়ে দাও। ওর পা-ও যা মুণ্ডুও তাই। সে মুণ্ডুতে কিছু নেই—স্রেফ কচি পটোল আর শিঙি মাছের ঝোল!

শিঙি মাছ আর পটোলের বদনাম করলে আমার ভীষণ রাগ হয়।

আমি চটে বললুম, থাকুক গে, তাতে তোমাদের কী? কিন্তু কথা হচ্ছে—রামগড় থেকে আমি ইটালিতে চলে এলুম কী করে? কখনই বা এলুম? টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা এরাই বা সব গেল কোথায়? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না!

—পাবেও না—গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল : তারা সব হজম।

—হজম! তার মানে?

—মানে? পেটের মধ্যে, খেয়ে ফেলেছি।

—খেয়ে ফেলেছ!—আমার পেটের পিলেটা একেবারে গলা-বরাবর হাইজাম্প মারল : সে কী কথা!

আবার তিনজনে মিলে বিকট অট্টহাসি। সে হাসির শব্দে ভিসুভিয়াসের চুড়োর ওপর লকলকে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। আমি দুহাতে কান চেপে ধরলুম।

হাসি থামলে স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, বাপু হে, আমাদের সঙ্গে চালাকি! পুঁটিমাছ হয়ে লড়াই করতে এসেছ হুলো বেড়ালের সঙ্গে! পাঁটা হয়ে ল্যাং মারতে গেছ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে! যোগবলে তোমাদের চারটেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছি! আর তারপরে—

শেঠজী বললেন, হাবুলকে রোস্ট পাকিয়েছি—

গজেশ্বর বললে, তোমাদের লীডার টেনিকে কাটলেট বানিয়েছি—

স্বামীজী বললেন, ঐ ফরফরে ছোকরা ক্যাবলাকে ফ্রাই করেছি—

শেঠজী বললেন, তারপর খেয়ে লিয়েছি!

আমার ঝাঁটার মতো চুল ব্রহ্মতালুর ওপরে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল। বারকয়েক খাবি খেয়ে বললুম, অ্যাঁ!

স্বামীজী বললেন, এবার তোমার পালা।

—অ্যাঁঃ!

—আর অ্যাঁ অ্যাঁ করতে হবে না, টের পাবে এখুনি।—স্বামীজী ডাকলেন, গজেশ্বর!

গজেশ্বর হাতজোড় করে বললে, জী মহারাজ!

—কড়াই চাপাও!

বলতে বলতে দেখি কোত্থেকে একটা কড়াই তুলে ধরেছে গজেশ্বর। সে কী কড়াই! একটা নৌকোর মত দেখতে! তার ভেতরে শুধু আমি কেন, আমাদের চার মূর্তিকেই একসঙ্গে ঘন্ট বানিয়ে ফেলা যায়।

—উনুনে কড়াই বসাও!—ঘুটঘুটানন্দ আবার হুকুম করলেন। গজেশ্বর তক্ষুনি সোজা গিয়ে উঠল ভিসুভিয়াসের চুড়োয়। তারপরে ঠিক উনুনে যেমনি করে বসায়, তেমনি করে কড়াইটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর চাপিয়ে দিলে।

স্বামীজী বললেন, তেল আছে তো?

গজেশ্বর বললে, জী মহারাজ।

—খাঁটি তেল?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হামার নিজের ঘানির তেল আছে মহারাজ! একদম খাঁটি! থোরাসে ভি ভেজাল নেহি!

স্বামি ঘুটঘুটানন্দ দাড়ি চুমরে বললেন, তবে ঠিক আছে। ভেজাল তেল খেয়ে ঠিক জুত হয় না—কেমন যেন অম্বল হয়ে যায়!

আমি আর থাকতে পারলুম না। হাঁউমাউ করে বললুম, খাঁটি তেল দিয়ে কী হবে?

—তোমাকে ভাজব!—গজেশ্বর গাড়ুয়ের জবাব এল।

স্বামীজী বললেন, তারপর গরম গরম মুড়ি দিয়ে—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, কুড়মুড় করে খাইয়ে লিবো।

পটলডাঙার প্যালারাম তাহলে গেল! চিরকালের মতোই বারোটা বেজে গেল তার! শেয়ালদার বাজারে আর কেউ তার জন্যে কচি পটোল কিনবে না—সিঙি মাছও না। এই তিন-তিনটে রাক্ষসের পেটে গিয়ে সে বিলকুল বেমালুম হজম হয়ে যাবে!

তখন হঠাৎ আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। কেমন স্বর্গীয় স্বর্গীয় মনের ভাব এসে দেখা দিলে। ব্যাপারটা কী রকম জান? মনে কর, তুমি অঙ্কের পরীক্ষা দিতে বসেছ। দেখলে, একটা অঙ্কও তোমার দ্বারা হবে না—মানে তোমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। তখন প্রথমটায় খানিক দরদরিয়ে ঘাম বেরুল, মাথাটা গরম হয়ে গেল, কানের ভেতর ঝিঁঝি পোকা ডাকতে লাগল আর নাকের ওপরে যেন ফড়িং এসে ফড়াং ফড়াং করে উড়তে লাগল। তারপর আস্তে-আস্তে প্রাণে একটা গভীর শান্তির ভাব এসে গেল। বেশ মন দিয়ে তুমি খাতায় একটা নারকোল গাছ আঁকতে শুরু করে দিলে। তার পেছনে পাহাড়—তার ওপর চাঁদ—অনেকগুলো পাখি উড়ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে সব আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি তখন আর্টিস্ট হয়ে উঠলে।

এখানেও যখন দেখছি প্রাণের আশা আর নেই—তখন আমার ভারি গান পেল। মনে হল, আশ মিটিয়ে একবার গান গেয়ে নিই। বাড়িতে কখনো গাইতে পাইনে—মেজদা তার মোটা-মোটা ডাক্তারি বই নিয়ে তাড়া করে আসে। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে দু-চারদিন গাইতে চেয়েছি—টেনিদা আমার চাঁদিতে চাঁটি বসিয়ে তক্ষুনি থামিয়ে দিয়েছে। এখানে একবার শেষ গান গেয়ে নেব। এর আগে কখনো গাইতে পাইনি—এর পরেও তো আর কখনো সুযোগ পাব না!

বললুম, প্রভু, স্বামীজী!

স্বামীজী বললেন, কী চাই বলো? কী হলে তুমি খুশি হও? তোমায় বেসম দিয়ে ভাজব—না এমনি নুন-হলুদ মাখিয়ে?

আমি বললুম, যেভাবে খুশি ভাজুন—আমার কোনো আপত্তি নেই। কেবল একটা নিবেদন আছে। একটুখানি গান গাইতে চাই। মরবার আগে শেষ গান।

আর সেইসঙ্গে আবার সেই নাচ। সে কী নাচ! মনে হল, গোটা ভিসুভিয়াস পাহাড়টাই গজেশ্বরের সঙ্গে ধেই-ধেই করে নাচছে! স্বামীজী তালে তালে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন, শেঠজী বললেন, উ-হু-হু! কেইসা বঢ়িয়া নাচ! দিল্ একেবারে তর্ হোয়ে গেলো!

ওদের তো দিল্ তর্ হচ্ছে—নাচে গানে একেবারে মশগুল! ঠিক সেই সময় আমার পালা-জ্বরের পিলের ভেতর থেকে কে যেন বললে, পটলডাঙার প্যালারাম, এই তোমার সুযোগ! লাস্ট চান্স! যদি পালাতে চাও, তাহলে—!

ঠিক!

এসপার কি ওসপার! শেষ চেষ্টাই করি একবার!

আমি উঠে পড়লুম। তারপরেই ছুট লাগালুম প্রাণপণে।

কিন্তু ভিসুভিয়াস পাহাড়ের ওপর থেকে দৌড়ে পালানো কি এতই সোজা কাজ! তিন পা এগিয়ে যেতে-না-যেতেই পাথরের নুড়িতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়লুম ধপাস করে।

আর তক্ষুনি—

তক্ষুনি নাচ থেমে গেল গজেশ্বরের। আর পাহাড়ের মাথা থেকে হাত-কুড়ির মতো লম্বা হয়ে এগিয়ে এল গজেশ্বরের হাতটা। বললে, চালাকি! আমি নাচছি আর সেই ফাঁকে সরে পড়বার বুদ্ধি! বোঝ এইবার—বলেই, মস্ত একটা হাতির শুঁড়ের মতো হাত আমার গলাটাকে পাকড়ে ধরল, আর শূন্যে ঝুলোতে ঝুলোতে—

—জয় গুরু ঘুটঘুটানন্দ! বলে আকাশ-ফাটানো একটা হুঙ্কার ছাড়ল। তারপরেই ছ্যাক—ঝপাস!—সেই প্রকাণ্ড কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মধ্যে—

তেলের মধ্যে নয়—একরাশ ঠাণ্ডা জলের ভেতর। আমি

আঁকুপাঁকু করে উঠে বসলাম। তখনো ভাল করে কিছু বুঝতে পারছি না। চোখের সামনে ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে ভাসছে তিস্তুতিয়াস, গজেশ্বরের ঘাগরা পরে সেই উদ্দাম নৃত্য, সেই বিরাট কড়াই—সেই ফুটন্ত তেলের রাশ!

—সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়েছিল—ভরাট গম্ভীর গলায় কে বলল।

তাকিয়ে দেখি, একজন পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে। সঙ্গে পাঁচ-সাত জন পুলিশ, আর কোমরে দড়ি বাঁধা

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ, শেঠ ঢুণ্ডুরাম আর **মহাপ্রভু গজেশ্বর!**

টেনিদা আমার মাথায় জল ঢালছে, হাবুল হাওয়া করছে। আর ক্যাবলা বলছে, উঠে পড় প্যালা, উঠে পড়! থানায় গিয়ে খবর দিয়েছিলুম, পুলিশ এসে ওদের দলবল-শুদ্ধু পাকড়াও করেছে। ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোর নিচে বসে এরা নোট জাল করত! স্বামীজী এদের লীডার। শেঠজী নোটগুলো পাচার করত। সব ধরা পড়েছে এদের। জাল নোট—ছাপার কল—সব। এদের মোটরের মধ্যেই সমস্ত কিছু পাওয়া গেছে। বুঝলি রে বোকারাম, ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোয় আর ভূতের ভয় রইল না এরপর থেকে!

দারোগা হেসে বললেন, সাবাস ছোকরার দল—তোমরা বাহাদুর বটে! খুব ভালো কাজ করেছ! এই দলটাকে আমরা অনেকদিন ধরেই পাকড়াবার চেষ্টা করছিলুম, কিছুতেই হদিশ মিলছিল না। তোমাদের জন্যেই আজ এরা ধরা পড়ল। সরকার থেকে এজন্যে মোটা টাকা পুরস্কার পাবে তোমরা।

এর পরে আর কি বসে থাকা চলে? বসে থাকা চলে এক মুহূর্তও? আমি পটলডাঙার প্যালারাম তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলুম। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললুম: পটলডাঙা—

টেনিদা, হাবুল সেন আর ক্যাবলা সমস্বরে সাড়া দিলে: জিন্দাবাদ!

এই লেখকের

চার মূর্তির অভিযান	১'৫০
কম্বল নিরুদ্দেশ	২'৫০
রাঘবের জয়যাত্রা	২'৫০
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	২'০০
কিশোর সঞ্চয়ন	৪'০০
টেনিদার গল্প	৫'০০